বাংলা জাতীয় মাসিক

পরওয়ানা

www.parwana.net

এপ্রিল ◆ ২০২১

আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)'র

আত্‌তানভীর

[তাফসীরুল কুরআন]

রামাদান সংখ্যা

এ সংখ্যায় রয়েছে...

- পবিত্র মাহে রামাদান ও করণীয় কিছু আমল
- তারাবীহ নামাযের রাকাআত সংখ্যা নিয়ে বিভ্রান্তি ও জবাব
- রামাদান মাসের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য
- দারুল কিরাত ও আল্লামা ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী
- পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের ফযীলত
- ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শন ও যাকাত ব্যবস্থা
- দেশে দেশে রামাদান সংস্কৃতি
- সালফে সালেহীনের রামাদান
- আধুনিক যুগের তাফসীর শাস্ত্রের দিকপাল আল্লামা সাবুনী
- ইয়ামানে মানবিক সংকট যুদ্ধ বন্ধের ডাক

নিয়মিত

- জীবন জিজ্ঞাসা
- জানার আছে অনেক কিছু
- একনজরে গত মাস • বিজ্ঞান
- ক্যারিয়ার • আবাবীল ফৌজ
- কবিতা • চিঠিপত্র

বাংলা জাতীয় মাসিক
পরওয়ানা
২৮তম বর্ষ ■ ৪র্থ সংখ্যা
এপ্রিল ২০২১ ♦ চৈত্র-বৈশাখ ১৪২৭-২৮ ♦ শাবান-রামাদান ১৪৪২

পৃষ্ঠপোষক
মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
আহমদ হাসান চৌধুরী

সম্পাদক
রেদওয়ান আহমদ চৌধুরী

সহকারী সম্পাদক
আখতার হোসাইন জাহেদ

নিয়মিত লেখক
আবু নছর মোহাম্মদ কুতুবুজ্জামান
রহমান মোখলেস
মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান
মারজান আহমদ চৌধুরী

সহ-সম্পাদক
মুহাম্মদ উসমান গণি
মোহাম্মদ কামরুজ্জামান

সার্কুলেশন ম্যানেজার
এস এম মনোয়ার হোসেন

কম্পোজ ও প্রচ্ছদ ডিজাইন
পরওয়ানা গ্রাফিক্স

যোগাযোগ
সম্পাদক, মাসিক পরওয়ানা
বি.এন টাওয়ার (৯ম তলা)
২৮/১ বি, দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল
ঢাকা-১০০০
মোবাইল: ০১৭৯৩ ৮৭৭৭৮৮

সিলেট অফিস
পরওয়ানা ভবন
৭৪ শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ
সোবহানীঘাট, সিলেট-৩১০০
মোবাইল: ০১৭৯৯ ৬২৯০৯০

parwanabd@gmail.com
www.parwana.net

মূল্য: ২৫ টাকা

সূচিপত্র

তাফসীরুল কুরআন
আত-তানভীর/আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ্ (র.)
অনুবাদ: মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী ০৩

শারহুল হাদীস
মানুষের কষ্ট লাঘব, দোষত্রুটি গোপন এবং সম্মিলিতভাবে কুরআন তিলাওয়াত
ও যিকরের ফযীলত/মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান ০৬

সাহাবা
আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা.)/মাওলানা মো. নজমুদ্দীন চৌধুরী ০৮

প্রবন্ধ
পবিত্র মাহে রামাদান ও করণীয় কিছু আমল/মোস্তফা মনজুর ০৯
তারাবীহ নামাযের রাকাআত সংখ্যা নিয়ে বিভ্রান্তি ও জবাব/নজমুল হুদা খান ১১
রামাদান মাসের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য/মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান ১৫
দারুল কিরাত ও আল্লামা ছাহেব কিবলাহ্ ফুলতলী/মোহাম্মদ খায়রুল হুদা খান ১৭
পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের ফযীলত/মাওলানা বদরুজ্জামান রিয়াদ ১৯
সালফে সালেহীনের রামাদান/মুহাম্মদ মাহমুদুল হাসান ২১

ফিকহ
রোযার মাসাইল ২৪
নাবালকের রোযা রাখা এবং রোযা ফরয হওয়ার বয়স/ইমাদ উদ্দীন ২৮

ইসলামী অর্থনীতি
ইসলামে যাকাতের গুরুত্ব ও সংশ্লিষ্ট মাসাইল/মো. কুতবুল আলম ৩০
ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শন ও যাকাত ব্যবস্থা/মারজান আহমদ চৌধুরী ৩৭

আন্তর্জাতিক
ইয়ামানে মানবিক সংকট যুদ্ধ বন্ধের ডাক/রহমান মোখলেস ৪০
পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনে ঝুলন্ত বিধানসভার আশঙ্কা ৪২

সফরনামা
উজবেকিস্তানে ওলী-আউলিয়ার পাশে/মারজান আহমদ চৌধুরী ৪৩

গ্রন্থ পরিচিতি
আল কাউলুছ ছাদীদ/ফরিদ উদ্দিন ৪৫

স্মরণ
আধুনিক যুগের তাফসীর শাস্ত্রের দিকপাল আল্লামা সাবুনী/মিফতাহুল ইসলাম তালহা ৪৬

সংস্কৃতি
দেশে দেশে রামাদান সংস্কৃতি/আখতার হোসাইন জাহেদ ৪৭

খাতুন
রোযায় গৃহিণীর রোজনামচা/তাওহিদা ফেরদৌস তান্নি ৫০

নিয়মিত
জীবন জিজ্ঞাসা ৫১
এক নজরে গত মাস ৫৫
জানার আছে অনেক কিছু ৫৭
বিজ্ঞান ৫৮
ক্যারিয়ার ৫৯
কবিতা ৬০
আবাবীল ফৌজ ৬১
সম্পাদকীয় ০২

সম্পাদক কর্তৃক বি.এন টাওয়ার (৯ম তলা), ২৮/১ বি, দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল ঢাকা-১০০০ হতে প্রকাশিত এবং সানজানা প্রিন্টার্স, ৮১/১, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০ হতে মুদ্রিত।

সম্পাদকীয়

نحمده ونصلى على رسوله الكريم– اما بعد

রাহমাত, মাগফিরাত ও নাজাতের মাস রামাদান আসন্ন। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'রোযা আমার জন্য, এর প্রতিদান আমি নিজেই দিবো' অথবা আমি নিজেই এর প্রতিদান। আরবী রামাদান শব্দটি রামাদুন শব্দমূল থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ জ্বালিয়ে দেওয়া। যেহেতু রামাদান মুমিনের গুনাহগুলো জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেয় তাই এ মাসকে রামাদান নামকরণ করা হয়েছে। রামাদান আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের মাস, গুনাহ থেকে বিরত থেকে অধিক ইবাদতে মশগুল হওয়ার মাস, সর্বোপরি সংযমের মাস। এ মাসের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে বিশ্ব মুসলিম।

কাঙ্ক্ষিত মাস মাহে রামাদানের পবিত্রতা ও মর্যাদা রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। এ দায়িত্ব আমরা পালন করতে পারি আত্ম-সংযম, কৃচ্ছতা ও মানবিক মূল্যবোধ প্রদর্শনের মাধ্যমে। এ সকল গুণাবলিকে স্থায়িত্বদানের মাধ্যমে আমাদের জীবন গঠন করতে পারলেই মাহে রামাদানের প্রকৃত সার্থকতা আমরা অর্জন করতে পারবো।

...

কুরআন নাযিলেরও মাস রামাদান। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'রামাদান মাস, যাতে কুরআন নাযিল হয়েছে'। কুরআন নাযিলের এ মাসে মুমিনগণ সর্বদাই কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি অতি গুরুত্ব দিয়ে আসছেন। বিগত শতাব্দির মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশে সাধারণ মানুষের কাছে কুরআনের বিশুদ্ধ তিলাওয়াত ছিল না বললেই চলে। সে সময়ে মুজাদ্দিদে জামান, রঈসুল কুররা শামসুল উলামা হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) স্বীয় উস্তাদদের থেকে সহীহ তিলাওয়াতের শিক্ষাগ্রহণ করে স্বপ্নযোগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আদিষ্ট হয়ে কুরআনের সহীহ পঠন শিক্ষাদানের যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তা সময়ের ব্যবধানে উপমহাদেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে ইউরোপ-আমেরিকা পর্যন্ত সফলতার সাথে পৌঁছেছে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্টের মাধ্যমে লাখো মানুষ কুরআন কারীমের সহীহ তিলাওয়াত রপ্ত করেছেন, এখনও করছেন। দারুল কিরাত কুরআন কারীমের এমন এক বিস্ময়কর প্রতিষ্ঠান যা বয়স, পূর্বের শিক্ষা কিংবা শ্রেণি-পেশার ভিন্নতা ভেদে সকলের জন্য সমান উপযোগী। প্রায় সত্তর বছর থেকে চলে আসা রামাদান মাস কেন্দ্রিক এ খিদমাতের ধারাবাহিকতা বৈশ্বিক মহামারির কারণে গতবছর স্থগিত ছিল, যা কোটি-কোটি কুরআন প্রেমিকের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ঘটিয়েছিলো। এ বছর দারুল কিরাতের সকল প্রস্তুতিমূলক আনুষ্ঠানিকতা ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। আল্লাহ পাক যেন তাঁর কালামের এ বাগানকে যথাযথভাবে সাজিয়ে দেন। আমীন।

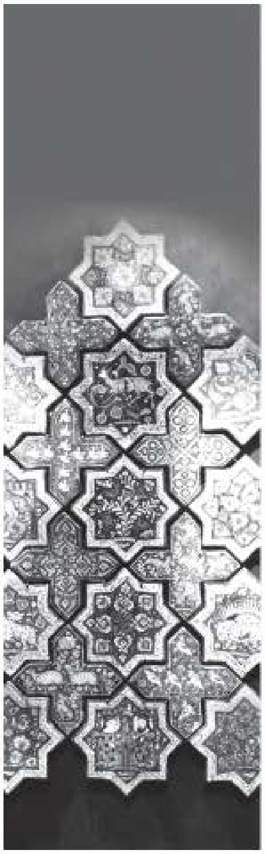

আত্-তানভীর

আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)

অনুবাদঃ মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ– صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ– غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ– وَلَاالضَّالِّيْنَ–

আমাদেরকে সরল পথ দেখাও। সে সকল লোকের পথ, যাদেরকে আপনি নিআমত দান করেছেন। তাদের পথ নয় যাদের প্রতি আপনার গযব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

তাফসীরঃ প্রশ্ন হচ্ছে মুমিন তো হিদায়াত প্রাপ্তই হয়। সুতরাং পুনরায় হিদায়াত চাইলে তো একটা জিনিস আছে, তা পুনরায় চাওয়ার মতো হয়।

এর জবাবে বলা যায়, صراط المستقيم এর মর্মার্থ হচ্ছে صراط الاولين বা পূর্ববর্তীগণের রাস্তা, যা افراط ও تفريط থেকে মুক্ত। আনুগত্যের দিক থেকে ইহা পূর্ববর্তী নবীগণের মতো। যেমন, আল্লাহর নির্দেশে হযরত ইবরাহীম (আ.) নিজের ছেলেকে কুরবানী দিয়েছিলেন। হযরত ইসমাইল (আ.) এতে রাজী হয়ে আনন্দে গর্দান পেশ করে দিয়েছিলেন। হযরত ইউনুস (আ.) নিজেকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করার জন্য রাজী হয়েছিলেন। পক্ষান্তরে কেউ কেউ صراط শব্দ দ্বারা কুরআন এবং 'ইসলাম' অর্থ নিয়ে থাকেন। কিন্তু صراط المتقدمين বলার পর কুরআন অর্থ নেওয়া কিভাবে ঠিক হতে পারে? কারণ সে সময় তো কুরআন ছিল না। কাজেই অবশ্যই এর অর্থ নেওয়া হবে শরীআতের নিয়মনীতি এবং আইনসমূহ। যেমন আল্লাহ বলেন, فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ -অতএব আপনিও তাদের পথ অনুসরণ করুন। যেমন, হযরত আলী (রা.) বলেন, اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ এর মর্মকথা হচ্ছে, ثبتنا علي الهداية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا "আল্লাহ! আমাদেরকে হিদায়াতের উপর দৃঢ় রাখুন। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের অন্তরকে হিদায়াত দান করার পর তা থেকে সরিয়ে দেবেন না।" কারণ অনেক আলিমের পা-ও পিছলে যায়, অনেক হিদায়াতপ্রাপ্ত লোকও গোমরাহ হয়ে যায়। (তাফসীরে বাগাভী, সূরা ফাতিহা)

আয়াতে صراط শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, سبيل এবং طريق শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। কারণ صراط শব্দ উল্লেখ করে জাহান্নামের রাস্তাসমূহকে বন্ধ করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেন আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জাহান্নামের রাস্তা অতিক্রম করে জান্নাতে প্রবেশের পথ সহজ করে দেন। اهدنا শব্দের সর্বনাম (ضمير) বহুবচন এজন্য নেওয়া হয়েছে, যেন দুআ করার সময় সমস্ত মুসলমানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কারণ মুসলমানদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও আছেন, যাদের দুআ কবূল করা হয়। আর আল্লাহ তাআলা কিছু লোকের দুআ কবূল করবেন আর কিছু লোকের দুআ ফিরিয়ে দেবেন তা তাঁর শানের খেলাফ। তিনি একজনের ওসীলায় সকলের দুআ কবূল করে নিতে পারেন।

এর উপর ভিত্তি করেই দুআর আগে পিছে দুরূদ পাঠ করার জন্য বলা হয়। কারণ দুরূদ কবূল হওয়া সম্পর্কে কারো মতানৈক্য নেই। যদি দুআর শুরুতে দুরূদ পাঠ করা হয় এবং দুআর শেষে দুরূদ পাঠ করা হয়, তাহলে প্রবল আশা রাখা যায় যে, শেষ আর শুরুর অংশ আল্লাহ কবূল করে নিলে মধ্যের অংশও কবূল করে নিবেন। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা এমন জিহ্বা দিয়ে দুআ করবে, যা দিয়ে গোনাহের কথা বের হয়নি। সাহাবায়ে কিরাম (রা.) আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ ধরনের লোক আমাদের মধ্যে কে আছে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা একে অপরের জন্য দুআ কর। কারণ তুমি ওই লোকের মুখ দিয়ে গুনাহ করনি আর সে তোমার মুখ দিয়ে গোনাহ করেনি।

কাজেই اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বলার দ্বারা প্রশংসা আদায় করা হয় সকল প্রশংসাকারীর পক্ষ থেকেই। আর اِيَّاكَ نَعْبُدُ এর মধ্যে ইবাদত সকলের পক্ষ থেকেই। اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ দ্বারা সকলের পক্ষ থেকে সাহায্য তলব করা হয়, হিদায়াত সকলের জন্য তলব করা হয়। আর এভাবে নেককারদের পথে চলার দুআ করা হয়। غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ দ্বারা সব ধরনের গোমরাহী ও ক্রোধ থেকে রক্ষা করা বুঝায়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا

-আর যে কেউ আল্লাহর হুকুম এবং তাঁর রাসূলের হুকুম মান্য করবে, তাহলে যাদের প্রতি আল্লাহ নিআমত দান করেছেন, সে তাঁদের সঙ্গী হবে। তাঁরা হলেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর তাদের সান্নিধ্যই হলো উত্তম। (সূরা নিসা, আয়াত-৬৯)

যারা আল্লাহ আর রাসূলের অনুসরণ করবেন, তাঁরা ঐ সমস্ত লোকের সঙ্গী হবেন, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা নিআমত প্রদান করেছেন। এরা হলেন, নবীগণ, সিদ্দীকীন, শহীদগণ ও সালেহীন। উল্লেখ্য যে, হিদায়াত যখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হয়, তখন ايصال الى المطلوب হয়। অর্থাৎ হিদায়াতের কর্তা যদি আল্লাহ হন, তখন মাধ্যম ছাড়াই হিদায়াত বুঝায়, কোনো মাধ্যম ছাড়াই অভিষ্ট লক্ষ্যে আল্লাহ তাআলা পৌছিয়ে দেন, কারণ আল্লাহ তাআলা কারো মুখাপেক্ষী নন।

আর اَلصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ এর উদ্দেশ্য হলো, মধ্যম পন্থা, যা চরমপন্থা থেকে মুক্ত।

নিআমত দুভাগে বিভক্ত- এক প্রকার হলো এমন নিআমত যাতে মুমিন নর-নারীর সাথে কাফিররাও অন্তর্ভুক্ত। ইহাকে জাগতিক নিআমত বলা হয়। যেমন, জীবন। এটি এমন একটি নিআমত যার উপর অন্যান্য সকল নিআমত নির্ভরশীল। কারণ যখন জীবনের সমাপ্তি ঘটে, তখন পার্থিব নিআমতেরও অবসান ঘটে। এ নিআমতে কাফিররা শামিল থাকলেও; এতে তাদের জন্য গৌরবের বা কল্যাণের কিছুই নয়। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ ۚ اِنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ لِيَزْدَادُوْٓا اِثْمًا

-কাফিররা যেন মনে না করে আমি যে অবকাশ দান করি, তা তাদের পক্ষে কল্যাণকর। আমি তো তাদেরকে অবকাশ দেই যাতে করে তারা পাপে উন্নতি লাভ করতে পারে। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১৭৮)

অন্যত্র বলা হয়েছে, قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ -যারা কাফির তাদের এ নিআমত শুধু কয়েকদিনের জন্য, তারপর আমি তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করব। (সূরা বাকারা, আয়াত-১২৬) আসলে এ পৃথিবীর যত ধরনের নিআমত আছে, সব ধরনের নিআমতে কাফিররাও শরীক। কিন্তু তা তাদের জন্য ক্ষতির কারণ। যেমন কোনো লোককে ভালো মিষ্টি খাওয়ানো হলো, কিন্তু তার পেটে অসুখ থাকলে তা যতোই ভালো হোক না কেন, তাতে তার পেট পীড়া হবেই। ডিম, দুধ, মধু ও সূর্যের আলো অনেকের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় যদিওবা এসব জিনিস খুবই ভালো ও পুষ্টিকর।

কাজেই কাফিরদের নিআমত তাদের জন্য ক্ষতির কারণ হয়। সম্পদ আল্লাহর নিআমত। কিন্তু কাফিররা সেটার যথাযথ ব্যবহার না জানার কারণে, তাদের ঈমানহীনতার কারণে তা তাদের ক্ষতির কারণ। এজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, نعم المال الصالح للرجل الصالح 'নেককার লোকের ভালো সম্পদই হলো সর্বোত্তম সম্পদ।' (আল আদাবুল মুফরাদ, বাবুল মালিস সালিহি লিল মারইস সালিহ)

আল্লাহর দ্বিতীয় নিআমত হলো দ্বীনী, আর তা হলো ঈমান। দৈহিক পূর্ণতা যেমন আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে হয়, তেমনি আত্মিক পূর্ণতা আসে ঈমানের মাধ্যমে। দৈহিক পূর্ণতা যেমন আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে হয়, তেমনি ঈমানও আল্লাহ্ প্রদত্ত তাওফীক এর মাধ্যমে হয়। তখন আয়াতের ভাবার্থ হবে,

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ يَعْنِيْ يَهُوْد وَلَا الضَّالِّيْنَ يَعْنِيْ النَّصَارِىْ–

-আমাদেরকে নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালিহীনদের পথে পরিচালিত করে তাদেরকে যে পুরস্কারে পুরস্কৃত করেছেন, সেই ধরনের পুরস্কারে আমাদেরকেও পুরস্কৃত করুন। আপনার অভিশপ্ত ইয়াহুদীদের পথে বা পথভ্রষ্ট নাসারাদের পথে পরিচালিত করবেন না। ইয়াহুদী সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা কুরআনের অন্যত্র বলেন, وَبَاؤُا بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ -তারা আল্লাহ্ তাআলার ক্রোধে পতিত হয়েছে। আর নাসারা সম্পর্কে বলেন, وَضَلُّوْا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ -তারা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

সূরা ফাতিহার মাহাত্ম্য

সূরা ফাতিহা যখন নামাযে পাঠ করা হয় তখন তার বিকশিত আলো যমীন হতে আকাশ তথা লাওহে মাহফূয এর দিকে উঠে যায়। যেমনিভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যামানায় তা আসমান হতে যমীনে অবতরণ করত। এজন্য বর্ণিত আছে যে, اَلصَّلٰوةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ -নামায হচ্ছে মুমিনদের মিরাজ।

তিনটি দিক থেকে শয়তান মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ওই তিনটি হলো, ১. কাম ২. ক্রোধ ৩. লোভ। কাম হচ্ছে পশুত্ব, ক্রোধ হচ্ছে আরো মারাত্মক আর লোভ হচ্ছে শয়তানী। এজন্য বলা হয়, কাম হলো বিপদ, কিন্তু ক্রোধ তার চেয়েও ভয়ংকর, আর গজব বা ক্রোধের চেয়ে বড় হলো হাওয়া অর্থাৎ লোভ। আল্লাহ তাআলা বলেন, إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ والمنكر -নামায ফাহিশা ও অপছন্দনীয় কাজ থেকে দূরে রাখে। (সূরা আনকাবুত, আয়াত-৪৫) এখানে ফাহিশা দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে কুপ্রবৃত্তি, আর منكر দ্বারা ক্রোধ।

এ কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যুলম তিন প্রকারের। এক প্রকারের যুলম যা ক্ষমা করা হয় না। আর এক প্রকার যুলম যা ছাড় দেওয়া হয় না। আর আরেক প্রকার যুলম সম্পর্কে আশা করা যায়, আল্লাহ তা মাফ করে দেবেন। যে যুলম ক্ষমা করা হয় না তা হলো শিরক। আল্লাহ তাআলার সাথে শরীক করা। আর যে যুলম ছাড় দেওয়া হয় না তা হলো আল্লাহর বান্দাহর উপর অপর বান্দাহর যুলম। আরেক ধরনের যুলম, যা আশা করা যায়, আল্লাহ্ মাফ করতে পারেন, তা হলো মানুষ নিজে নিজের উপর যে যুলম করে। (মুসনাদ; আবি দাউদ আত তায়ালিসী, হাদীস নং ২২২৩) শাহওত বা কামের ফল হলো, লোভ করা ও কার্পণ্য করা। ক্রোধের ফল হলো, নিজের কাজকে ভালো মনে করা আর অহংকার করা। কুপ্রবৃত্তির ফল হলো, কুফর ও বিদআত করা। আদম সন্তানের মাঝে এ ছয়টি স্বভাবের ফলে আরও একটি স্বভাব সৃষ্টি হয়, তা হলো حسد বা হিংসা। হিংসা হচ্ছে সব থেকে নিকৃষ্ট স্বভাব। যেমনিভাবে শয়তান হচ্ছে প্রাণিজগতের মধ্যে নিকৃষ্টতম। এজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন, الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ- مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ 'যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে, জিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে।' আল্লাহ তাআলা বলেন, وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ 'এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে, যখন সে হিংসা করে।' বর্ণিত আছে, ইবলিস ফিরআউনের দরজায় এসে আওয়াজ দিল। ফিরআউন বলল কে? ইবলিস বলল, তুমি যদি মাবুদ হতে, তাহলে চিনতে পারতে। শয়তান ঘরে প্রবেশ করলে ফিরআউন বলল, তুমি এ দুনিয়াতে আমার ও তোমার চেয়ে বেশি খারাপ কিছু আছে বলে জান? শয়তান উত্তর দিল হ্যাঁ জানি, হিংসুক। এ দুনিয়াতে মন্দ যা কিছু ঘটেছে হিংসার দ্বারাই হয়েছে।" (আত তাফসীরুল কাবীর, সূরা ফাতিহা) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম এর মধ্যে আল্লাহর তিনটি নাম রয়েছে। তা দ্বারা মানব চরিত্রের এ দোষ দূর হয়ে যায়।

সূরা ফাতিহায় সাতটি আয়াত রয়েছে। এ সাতটি আয়াত দ্বারা মানুষের যে সাত ধরনের খারাপ স্বভাব রয়েছে, তা দূর হয়ে যায়।

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

-আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার খেয়াল-খুশিকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছে? আল্লাহ্ জেনে শুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তার কান ও অন্তরে মোহর এঁটে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর রেখেছেন পর্দা। অতএব, আল্লাহর পর কে তাকে পথপ্রদর্শন করবে? তোমরা কি চিন্তাভাবনা কর না? (সূরা জাসিয়াহ, আয়াত-২৩)

কাজেই যে আল্লাহকে চিনতে পারে তার থেকে কামনার দ্বারা সৃষ্ট শয়তানী ভাব দূর হয়ে যায়। যে ব্যক্তি জানবে যে আল্লাহ্ হচ্ছেন রাহমান, তার মাঝে ক্রোধ থাকবে না। কারণ ক্রোধের জন্য অভিভাবক হওয়া শর্ত। আর অভিভাবকত্ব কেবল আল্লাহর, যেমন তিনি বলেন, اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ 'সে দিনের প্রকৃত রাজত্ব হবে দয়াময় আল্লাহর।' (সূরা আল ফুরকান, আয়াত-২৬) আর যে রাহীমকে চিনতে পেরেছে, সে নিজের উপর যুলম করবে না এবং নিজের কাজ নিয়ে গৌরব বোধ করবে না।

মোটকথা, বান্দাহ আলহামদুলিল্লাহ্ পাঠ করার পর যা পায়, তাতে সন্তুষ্ট হয়ে যায়। এতে তার কুপ্রবৃত্তির চাহিদা দূর হয়ে যায়। আর যে জানতে পারল তিনিই رَبِّ الْعَالَمِيْنَ সে যা পেল তাতে কৃপণতা করবে না, আর যা পেল না তার প্রতি লোভ করবে না। আর যে জানল তিনিই مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ এবং তিনিই اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ সে ক্রোধ দেখাবে না। আর যখন বলবে, اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ তখন তার গৌরব ও অহংকার চলে যাবে, নিজের কাজকে নিজে পছন্দ করা এবং নিজের প্রশংসা নিজে করার অভ্যাস চলে যাবে। আর যখন বলবে, اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ তখন হাওয়া নামক শয়তান দূর হয়ে যায়। আর যখন বলা হবে صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ সে সময় কুফর দূর হয়ে যাবে। আর যখন বলা হয় غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ তখন তার থেকে যে বিদআত আবিষ্কার হয়

তা দূর হয়ে যায়। আর যখন এ ছয় ধরনের খারাপ স্বভাব দূর হয়ে যায়, তখন এমনিতেই হিংসাও দূর হয়ে যায়।

সূরা ফাতিহা যেমনটি উল্লিখিত সাতটি মন্দ স্বভাবের প্রতিষেধক তেমনটি এ কথা মেনে নিতে হয় যে, কুরআন মানুষের জন্য সকল রোগের চিকিৎসা। এখানে একটি সূক্ষ্ম বিষয় পরিলক্ষিত হয়, যা رب، ملك، الله এ তিন শব্দের সাথে সম্পৃক্ত। رب–ملك ও الله এ তিনটি শব্দের উপরই কুরআন শেষ হয়েছে (কেননা কুরআনুল কারীমের শেষ সূরা নাস এর মধ্যে এ তিনটি শব্দ রয়েছে)। যেন বলা হয়েছে, যদি শাহাওয়াতের মাধ্যমে শয়তানের ওয়াসওয়াসা আসে তাহলে বল قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ যদি রাগের মাধ্যমে আসে তাহলে বল مَلِكِ النَّاسِ যদি কুপ্রবৃত্তির মধ্য দিয়ে আসে তাহলে বল إِلٰهِ النَّاسِ। (প্রাগুক্ত) যত জিনিসের প্রতি মানুষ মুখাপেক্ষী সূরা ফাতিহা তার সবকিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে। الحمد لله এ কথার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে যে, তিনিই হচ্ছেন সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা যার জন্য তিনিই সমস্ত প্রশংসা, সানা ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। رب العالمين দ্বারা ইশারা করে মাবুদের একত্বের উপর। অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের মালিক ও রাজত্ব একমাত্র আল্লাহ তাআলার। বিশ্ব জগতে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ থেকে এ সত্য প্রতিভাত হয় যে, মৃত্যুর আগে-পরে এবং মৃত্যুকালে শুধু তারই ইহসান বিদ্যমান।

رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ইশারা করে এ সত্যের প্রতি যে, এ দিনের অবসান হওয়ার পর আর একটি দিন আছে, যেদিন নেককার বদকার থেকে, জালিম মজলুম থেকে পৃথক হয়ে যাবে। সেই দিনই সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর রুবুবিয়াত উপলব্ধি করা যাবে।

আর إِيَّاكَ نَعْبُدُ আয়াত থেকে আল্লাহ তাআলার ইবাদত এবং আল্লাহ তাআলার সাহায্য ছাড়া বান্দাহর যে কিছুই করার শক্তি নেই, তা উপলব্ধি করা যায়। এ কারণেই إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ বলতে হয়। তাছাড়া সকল কাজেরই একটি প্রভাব থাকে, তদানুযায়ী মানুষের উপর إِيَّاكَ نَعْبُدُ এর প্রভাব পড়ে বলেই মানুষ হিদায়াত প্রাপ্ত হয়। এজন্য বলা হয়েছে اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ আয়াত এ কথার প্রমাণ করে যে, যিনি পূর্ণ মালিক, তার নূরে আলোকিত হতে হলে তার সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে। আর যারা (হিদায়াতপ্রাপ্ত) তারা এমন এক সম্প্রদায় যাদের সাথে উপবিষ্ট কেউ হতভাগ্য হয় না। আর غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ ইশারা করে যে, বিদআতী লোক এবং যারা কুপ্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে চলে, তাদের থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। যেমন কবির কবিতা-

عن المرء لا تسئل وسل عن قرينه + فكل قرين بالمقارن يقتدي

“ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর না বরং তার বন্ধু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। কেননা প্রত্যেক বন্ধু তার বন্ধুর অনুসরণ করে।” (আদ দিওয়ান, উমর আল ইয়াফী)

সূরা ফাতিহার মধ্যে সাতটি আয়াত। আর নামাযে এমন সাতটি কাজ রয়েছে যা অনুভব করা যায়। যেমন- ১. কিয়াম অর্থাৎ দাঁড়ানো ২. রুকু ৩. রুকুর পর সোজা হয়ে দাঁড়ানো ৪.প্রথম সিজদা ৫. প্রথম সিজদার পর বসা ৬. দ্বিতীয় সিজদা ৭. শেষ বৈঠক। এসকল কাজকে ধরে নেওয়া যায় একজন ব্যক্তির মতো, যার রূহ হলো সূরা ফাতিহা।

তাছাড়া সূরা ফাতিহার إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ এর মধ্যে শুধু শাব্দিক সম্বোধন নয়; বরং রূহানী দিক থেকে আল্লাহ তাআলার সামনাসামনি হওয়া যায়। হাদীস শরীফে আছে, যদি কোনো মুসল্লীর থুথু ফেলার প্রয়োজন হয় সে যেন সামনে অথবা ডান দিকে না ফেলে। কারণ নামাযের মধ্যে বান্দাহ আল্লাহ তাআলার কাছে তার মনের গোপন কথা ব্যক্ত করে। (সহীহ বুখারী, কিতাবুস সালাত, আবওয়াবু ইসতিকবালিল কিবলাহ, বাবু দাফনিন নুখামাতি ফিল মাসজিদ)

বাংলা জাতীয় মাসিক
পরওয়ানা

- ধর্ম-দর্শন, মাসআলা-মাসাইল, ফাদ্বাইল ও আমালিয়াত বিষয়ে লিখুন
- ইতিহাস-ঐতিহ্য, সমাজ-সংস্কৃতি, সমসাময়িক, দেশজ ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে তথ্য সমৃদ্ধ লেখা পাঠান
- মুসলিম মনীষী, আউলিয়াদের জীবন ও গৌরবময় অতীতের আলোকোজ্জ্বল কাহিনী তুলে আনুন আপনার লেখায়

প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে পরবর্তী সংখ্যার জন্য নিম্নোক্ত ই-মেইলে লেখা পাঠাতে হবে
E-mail: parwanabd@gmail.com

পরওয়ানা-এর
গ্রাহক হওয়ার জন্য
ভাবছেন?

পরওয়ানার অনুকূলে আপনার নাম ও পূর্ণ ঠিকানা লিখে পাঠান

বার্ষিক চাঁদার হার

বাংলাদেশ	ঃ ৩০০ টাকা
ভারত	ঃ ১৫০০ টাকা
মধ্যপ্রাচ্যের সকল দেশ	ঃ ২০০০ টাকা
যুক্তরাজ্য ও ইউরোপের সকল দেশ	ঃ ৪০ পাউন্ড/ইউরো
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা	ঃ ৫০ মার্কিন ডলার

এজেন্সির নিয়মাবলি

- ফোন/ই-মেইল/হোয়াটসঅ্যাপ ও অফিসে যোগাযোগ করে চাহিদা জানালে এজেন্সি দেওয়া হয়
- ১০ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া হয় না
- প্রত্যেক ৫ কপিতে ১টি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়
- সরাসরি এজেন্টের কাছে পত্রিকা পৌছানো হবে
- আশেপাশের এজেন্টের ক্ষতি হবে না, এমন নিশ্চয়তা থাকতে হবে।
- যেকোনো সময় কর্তৃপক্ষ যে কারো এজেন্টশিপ বাতিল/পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে। সেক্ষেত্রে গ্রাহকদের বিকল্প মাধ্যমে পত্রিকা পৌছিয়ে দেওয়া হবে

যোগাযোগ
সার্কুলেশন ম্যানেজার
মাসিক পরওয়ানা
বি.এন টাওয়ার, ২৮/১ বি, দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
সিলেট অফিস: পরওয়ানা ভবন ৭৪, শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ সোবহানীঘাট, সিলেট-৩১০০
মোবাইল: ০১৭৯৯৬২৯০৯০ (বিকাশ)

মানুষের কষ্ট লাঘব ও দোষত্রুটি গোপন সম্মিলিতভাবে কুরআন তিলাওয়াত ও যিকরের ফযীলত

মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান

হাদীসের মূল ভাষ্য

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ؛ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ". رواه مسلم بهذا اللفظ.

অনুবাদঃ হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মুমিনের দুনিয়ার কষ্টসমূহের মধ্য থেকে কোনো কষ্ট দূর করে দেবে আল্লাহ তার কিয়ামত দিবসের কষ্টসমূহের মধ্য থেকে একটি কষ্ট দূর করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির অভাব (সাহায্যের দ্বারা) সহজ করে দিবে আল্লাহ তার দুনিয়া ও আখিরাতের বিষয়কে সহজ করে দিবেন। এমনিভাবে যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষত্রুটি গোপন রাখবে আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। আল্লাহ তাআলা ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর বান্দার সহযোগিতায় থাকেন যতক্ষণ বান্দা তার অপর ভাইয়ের সহযোগিতায় থাকে। যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের উদ্দেশ্যে কোনো পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে তার জন্য বেহেশতের পথ সহজ করে দেন। যখন কোনো দল আল্লাহর ঘরসমূহের মধ্যে কোনো একটি ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহর কিতাব (কুরআন শরীফ) তিলাওয়াত করে এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে তা আলোচনা করে তখন তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়, রহমত তাদের ঢেকে ফেলে, ফেরেশতাগণ তাদের পরিবেষ্টন করে রাখেন এবং আল্লাহ তাআলা তার নিকটস্থ ফেরেশতাদের কাছে তাদের কথা উল্লেখ করেন। আর যার আমল তাকে পিছিয়ে দেয়, তার বংশ মর্যাদা তাকে এগিয়ে দিতে পারে না। (মুসলিম)

হাদীসের আলোচ্য বিষয়

এ হাদীসে আমাদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে।

১. মানুষের কষ্ট লাঘব করা।
২. অভাবীদের অভাব মোচন করা।
৩. মানুষের দোষত্রুটি গোপন রাখা।
৪. সদা-সর্বদা অপর ভাইয়ের সহযোগিতায় থাকা।
৫. জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব ও ফযীলত।
৬. মসজিদে সমবেত হয়ে কুরআন তিলাওয়াত ও এর দারস-তাদরীসের গুরুত্ব।
৭. আমলের আবশ্যকতা ও বংশ মর্যাদার গুরুত্বহীনতা।

মুমিনের দুঃখ-কষ্ট লাঘব ও তাদের সাহায্য-সহযোগিতা

মুমিনের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করা ও তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করা নেক ও উত্তম কাজ। সাধারণত কোনো নেক কাজ করলে এর বিনিময়ে দশগুণ সাওয়াব পাওয়া যায়। পবিত্র কুরআন মাজীদে এসেছে- مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا -কেউ কোনো নেক কাজ করলে সে এর দশগুণ পাবে (সূরা আনআম, আয়াত ১৬০)। কিন্তু এ হাদীসে এসেছে কোনো মুমিন অপর মুমিনের দুনিয়ার একটি কষ্ট দূর করলে আল্লাহ তার কিয়ামত দিবসের একটি কষ্ট দূর করে দিবেন। অথচ আয়াত অনুযায়ী দশগুণ প্রতিফল হওয়া উচিত ছিল। এর জবাব হলো, আখিরাতের একটি কষ্ট দূর হওয়া দুনিয়ার দশগুণ বা ততোধিক প্রতিফল লাভের চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কেননা একজন মুমিনের জন্য আখিরাতের জীবনের কল্যাণ অধিক কাঙ্ক্ষিত ও অধিক উপকারী বিষয়। সুতরাং কিয়ামতের দিনের একটি কষ্ট দূর হলে তা দশগুণ প্রতিফলের সমান হয়ে যায়। অবশ্য অন্য আয়াতে আছে, مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا -কেউ কোনো নেক কাজ করলে সে এর চেয়ে উৎকৃষ্ট ফল পাবে (সূরা কাসাস, আয়াত ৮৪)। এ হিসেবে দুনিয়ার একটি কষ্ট দূর করার বিনিময়ে আখিরাতের একটি কষ্ট দূর হলে নিঃসন্দেহে তা প্রতিফল হিসেবে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট।

হাদীসে আরো বলা হয়েছে, যে কোনো অভাবগ্রস্থ ব্যক্তির অভাব (সাহায্যের দ্বারা) সহজ করে দিবে আল্লাহ তার দুনিয়া ও আখিরাতের বিষয়কে সহজ করে দিবেন। পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা মুতাবেক এখানে ব্যক্তি বহুগুণ প্রতিফল লাভ করছে, যেহেতু অন্যের অভাব মোচনের দ্বারা একই সাথে তার দুনিয়া ও আখিরাতের বিষয় সহজ হয়ে যাচ্ছে। এমনিভাবে কোনো মুসলমানের দোষত্রুটি গোপন রাখার মাধ্যমেও ইহ-পরকালীন কল্যাণ লাভ হয়। কোনো মুমিন অপর মুমিনের দোষ গোপন করলে আল্লাহ তার দোষ দুনিয়াতেও গোপন রাখেন, আখিরাতেও গোপন রাখেন। আর যদি আল্লাহর দয়ায় আখিরাতে দোষ গোপন হয়ে যায় তাহলে এটিই তো বড় সফলতা।

একজন মুসলমানকে সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় সহযোগিতা করা অপর মুসলমানের অন্যতম দায়িত্ব। মুসলিম বান্দা যতক্ষণ এ দায়িত্বে নিজেকে নিয়োজিত রাখে আল্লাহ ততক্ষণ তাকে সহযোগিতা করতে থাকেন। তাই আল্লাহর সাহায্য-সহযোগিতা পেতে হলে খিদমতে খালকে যথাসাধ্য নিয়োজিত থাকা প্রয়োজন।

জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব ও ফযীলত

ইসলাম জ্ঞানার্জনের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছে। পবিত্র কুরআনের প্রথম বাণীই হলো, ইকরা- পড়। পবিত্র কুরআন মাজীদে এসেছে- قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ -আপনি বলুন, যারা জানে এবং যারা জানেনা তারা কি সমান? (সূরা যুমার, আয়াত ০৯) অর্থাৎ তারা সমান নয়। বরং প্রকৃত কথা হলো, يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ -তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান

এনেছে এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদের মর্যাদায় উন্নত করবেন। (সূরা মুজাদালাহ, আয়াত ১১)।

প্রিয়নবী ﷺ জ্ঞান অর্জনের প্রতি সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। এ হাদীসে তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের উদ্দেশ্যে কোনো পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে তার জন্য বেহেশতের পথ সহজ করে দেন। এখানে বিশেষভাবে জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে বের হওয়া বা সফরের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে বের হলে আল্লাহ এর ওসীলায় জান্নাতের পথকে সহজ করে দেন। আমাদের পূর্বসূরি সালফে সালিহীন জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায়, এক দেশ থেকে অন্য দেশে সফর করতেন। ইলম অর্জনে দূর-দূরান্তের পথ পাড়ি দিতেও তাঁরা কুণ্ঠাবোধ করতেন না।

কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত ও এর দারস-তাদরীসের গুরুত্ব

পবিত্র কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত একটি উত্তম আমল। হাদীস শরীফে একে 'সর্বোত্তম যিকর' বলা হয়েছে। কুরআন মাজীদের একটি হরফ তিলাওয়াত করলে দশটি নেকী হয়। তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে অর্থ বুঝা আবশ্যক নয়। অর্থ না বুঝে তিলাওয়াত করলেও দশ নেকী হবে। তিলাওয়াত একাকী যেমন করা যায় তেমনি সম্মিলিতভাবেও করা যায়। এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ মূলত সম্মিলিতভাবে কুরআন তিলাওয়াত এবং কুরআনের দারস-তাদরীস তথা শিক্ষাদান ও আলোচনা পর্যালোচনার বিশেষ ফযীলতের প্রতি আলোকপাত করেছেন। যেমন হাদীসটিতে এসেছে, যখন কোনো দল আল্লাহর ঘরসমূহের মধ্যে কোনো একটি ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহর কিতাব (কুরআন মাজীদ) তিলাওয়াত করে এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে তা আলোচনা করে তখন তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়, রহমত তাদের ঢেকে ফেলে, ফেরেশতাগণ তাদের পরিবেষ্টন করে রাখেন এবং আল্লাহ তাআলা তার নিকটস্থ ফেরেশতাদের কাছে তাদের কথা উল্লেখ করেন। এ হাদীস থেকে উলামায়ে কিরাম সম্মিলিত যিকরের দলীল গ্রহণ করে থাকেন। ইমাম মুসলিম (র.)ও এ হাদীসের বাবের শিরোনামে 'যিকর'কে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি এ বাবের নাম দিয়েছেন باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر। অর্থাৎ কুরআন তিলাওয়াত ও যিকরের উদ্দেশ্যে একত্রিত হবার ফযীলত।

আমলের আবশ্যকতা ও বংশ মর্যাদার গুরুত্বহীনতা

এ হাদীসটি সর্বশেষ আমলের আবশ্যকতা ও বংশ মর্যাদার গুরুত্বহীনতার প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যার আমল তাকে পিছিয়ে দেয়, তার বংশ মর্যাদা তাকে এগিয়ে দিতে পারে না।' আল্লাহর দরবারে মানুষের অগ্রগামিতা বা নৈকট্যের মূল হাতিয়ার হলো তার নেক আমল। বিশেষত ফরয আমল বা বিধান প্রতিপালনের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর অধিক নৈকট্য অর্জন করে। পাশাপাশি নফল আমলের মাধ্যমেও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সহযোগিতা করে।

আল্লাহ আমাদের নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহর কুরবত তথা নৈকট্য অর্জনের তাওফীক দান করুন। আমীন।

LATIFI HANDS
CHARITY WITH CLARITY

LATIFI HANDS
FULTALI SAHEB BARI, ZAKIGANJ, SYLHET, BANGLADESH

OUR PROJECTS

EDUCATION
ORPHANS
HOUSING PROJECTS
MASJID PROJECTS
INFRASTRUCTURE
SUSTAINABLE LIVELIHOODS
AGRICULTURE SUPPORT
WEEDING SUPPORT
SADAQAH PROJECT

HEALTH CARE
EYE CARE
GIFT
QURBANI PROJECT
EMERGENCY AND DISASTER RELIEF
BLIND AND DISABLED PROJECT
WATER PROJECT
WIDOW SUPPORT

www.youtube.com/latifihands
www.facebook.com/latifihands
www.latifihands.org.uk

আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা.)

মাওলানা মো. নজমুদ্দীন চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশের পর)

হযরত আলীর ভাই বোনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

তালিব বিন আবি তালিব

তালিব হারিয়ে গিয়েছিলেন তার খোঁজ পাওয়া যায়নি। তিনি রাসূল ﷺ কে ভালোবাসতেন। রাসূল ﷺ এর প্রশংসাসূচক কবিতাও বলেছেন। বদর যুদ্ধের সময় কুরাইশদের সাথে অনিচ্ছায় বের হয়েছিলেন। কুরাইশরা বলল হে বনী হাসিম! আমরা জানি যদিও তোমরা আমাদের সাথে বের হয়েছ কিন্তু তোমাদের অন্তর মুহাম্মদের ﷺ সাথে। একথা শুনে তালিব মক্কার দিকে ফিরে গেলেন এবং রাসূল ﷺ এর প্রশংসায় কিছু কবিতা বলে গেলেন। তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

আকিল বিন আবি তালিব

তাঁর কুনিয়াত আবূ ইয়াযিম। তাঁর ইসলাম গ্রহণ ফতহে মক্কার বিজয়ের বছর। কেউ কেউ বলেছেন হুদায়বিয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং ৮ম হিজরীর প্রারম্ভে হিজরত করেছেন। বদর যুদ্ধে তিনি মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন। তখন হযরত আব্বাস (রা.) মুক্তিপণ দিয়ে তাকে মুক্ত করেছেন। তিনি মুতার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন তবে মক্কা বিজয়ে ও হুনায়নের যুদ্ধে অংশগ্রহণের কথা জানা যায়নি। কারণ তিনি তখন অসুস্থ ছিলেন।

আমীর মুআবিয়ার সময়ে তিনি ইন্তিকাল করেছেন। অন্য বর্ণনায়, ইয়াযিদের রাজত্বকালে হাররার ঘটনার পূর্বে ছিয়ানব্বই বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। (ইসাবা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৯৪)

জা'ফর বিন আবি তালিব

ইসলামের প্রাথমিক সময়ে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে হযরত জা'ফর একজন। তিনি মিসকিনদের খুবই ভালোবাসতেন। তিনি তাদের খিদমত করতেন এবং তাদের সাথে উঠাবসা করতেন। নাজ্জাশী ও তাঁর অনুসারীগণ হযরত জা'ফর (রা.) এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি মুতার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং শাহাদাত বরণ করেন।

উম্মে হানি বিনতে আবি তালিব

উম্মে হানির নাম ফাখতা। তবে কেউ ফাতিম, কেউ হিন্দ বলেছেন। ফাখতা নামটিই প্রসিদ্ধ। তাঁর স্বামী হুবায়রা বিন আমর। মক্কা বিজয়ের সময় উম্মে হানী বনী মাখজুম গোত্রের দুজন লোককে নিরাপত্তা দিয়েছিলেন। রাসূল ﷺ বলেছেন, উম্মে হানী যাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন আমিও তাকে নিরাপত্তা দিলাম। উম্মে হানী রাসূল ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত আলীর পরেও তিনি জীবিত ছিলেন।

জুমানা বিনতে আবি তালিব

তিনি আবদুল্লাহ বিন আবি সুফিয়ানের মাতা। আবূ সুফিয়ানের এক পুত্রের নাম জা'ফর।

খায়বার বিজয়ে হযরত আলী (রা.)

সফরের এমন একটি স্থলে যেখানে ইয়াহুদীর অনেকগুলি দুর্গ ছিল। এখানে বিস্তর কৃষি ভূমি ও বাগান ছিল। খায়বারের ইয়াহুদীগণ বড়ই ধনী ছিল। তারা ব্যবসা বাণিজ্য করত, কৃষি কাজও করত। ইসলামের বড় বড় শত্রুরা এখানে জামায়েত হয়েছিল। ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের এক কেন্দ্র হিসেবে খায়বারকে গণ্য করা হত। এখানে আটটি দুর্গ ছিল। ১. নাতাত ২. শক ৩. নাঈম ৪. কুতাইবা ৫. আলওয়াতিহ ৬. সুলালিম ৭. কামুছ ৮. সা'ব। এসকল দুর্গের মধ্যে কামুছ দুর্গ ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও দুর্ভেদ্য। এ দুর্গ বিজয়ের মাধ্যমে আসলে সমগ্র খায়বার বিজয় হয়েছিল। কারণ কামুছ দুর্গের পতনের পর খায়বারের ইয়াহুদীগণ আর জামায়েত হয়ে কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সমর্থ হয়নি। এ দুর্গটি হযরত আলী জয় করেছিলেন। তাই হযরত আলীকে (রা.) খায়বার বিজয়ী বলা হয়।

খায়বার যুদ্ধের সময় হযরত আলীর ঢাল পড়ে গিয়েছিল। এক ইয়াহুদী ঢাল নিয়ে পলায়ন করল। এমন সময় হযরত আলী দুর্গের একখানা দরজা উপরে তুললেন এবং ইহাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করলেন। যুদ্ধ শেষে হযরত আলী ইহা ফেলে দিলেন। তখন ৮জন শক্তিশালী মানুষের পক্ষে ইহার পার্শ্ব পরিবর্তন সম্ভব হয়নি। (বেদায়া ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২৫)

কামুছ দুর্গ অবরোধের সময় রাসূল ﷺ এর মাথায় ব্যথা হওয়ার কারণে নিজে যুদ্ধের মাঠে যেতে পারেন নি। তাই কোনো আনসার অথবা মুহাজিরকে সেনাপতি হিসেবে পাঠাতেন। এ দুর্গটি সবচেয়ে বেশি দুর্ভেদ্য ছিল বিধায় অবরোধও দীর্ঘ হয়েছিল এবং বিজয় হচ্ছিল না। একদিন হযরত আবূ বকর (রা.) গেলেন, অনেক চেষ্টার পরও বিজয় হয়নি। দ্বিতীয় দিন হযরত উমর চেষ্টা করলেন, বিজয় হলো না। অনেক চেষ্টার পরও যখন বিজয় হয় নি। তখন একদিন রাসূল ﷺ বললেন, আগামীকাল আমি এমন একজন ব্যক্তিকে ঝান্ডা দান করব যাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালোবাসেন এবং তিনি নিজেও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসেন। আল্লাহ পাক তাঁর হাতে বিজয় করিয়ে দেবেন। প্রতিজন মুসলিম আশা করতে থাকলেন তিনি যেন সে ব্যক্তি হন। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি কোনোদিন কোনো নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা করিনি তবে ঐদিন আশা করেছিলাম। এটা এজন্য যে, আমি যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত হই, যাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালোবাসেন।

প্রভাতে সকলে অপেক্ষা করতে লাগলেন যে রাসূল ﷺ কার নাম ঘোষণা করবেন ঝান্ডা দান করার জন্য। রাসূল ﷺ বললেন আলী কোথায়? হযরত আলী হাযির হলেন। তখন রাসূল ﷺ আলীর হাতে ঝান্ডা দিয়ে বললেন, তুমি যাও, যাতে আল্লাহ তোমাকে বিজয় দান করেন। এভাবে হযরত আলীর হাতে খায়বার বিজিত হয়।

বর্ণিত আছে একদিন হযরত আলীর চোখ রোগাক্রান্ত ছিল। রাসূল ﷺ নিজের থুথু মুবারক হযরত আলীর চোখে লাগিয়ে দিলে আলীর চোখের অসুখ সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যায়। (বেদায়া ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২৫)

তাবুক যুদ্ধের সময় হযরত আলীকে রাসূল ﷺ আহলে বায়তের দেখাশুনার জন্য রেখে যান। রাসূল ﷺ রওয়ানা হওয়ার পর মুনাফিকরা আলোচনা করতে লাগল যে, আলীর উপর রাসূল ﷺ অসন্তুষ্ট তাই রেখে গেছেন। একথা শুনে হযরত আলী

হাতিয়ারপত্র সাথে নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন। রাসূল ﷺ তখন জুরফ নামক স্থানে অবস্থান করেছেন। রাসূল ﷺ এর সাথে সাক্ষাত করে হযরত আলী আল্লাহর নবী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুনাফিকরা এভাবে বলছে। আপনি কি আমাকে মদীনায় এজন্য ছেড়ে এসেছেন? আল্লাহর নবী ﷺ বললেন, মুনাফিকরা মিথ্যা বলেছে। আমি তোমাকে এজন্য রেখে এসেছি যাতে আমি যাদেরকে ছেড়ে এসেছি তাদের দেখাশুনা করবে। তুমি যাও আমার আহল ও তোমার আহলে আমার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে থাক। হে আলী! তুমি কি রাজী নও যে তুমি আমার জন্য এমন হবে যেমন মূসার জন্য হারুন ছিলেন? (তবে) নিশ্চয় আমার পরে কোনো নবী নেই।

মোটকথা হযরত আলী তখন মদীনায় ফিরে গেলেন। (আসহুস সিয়ার, পৃষ্ঠা ৩২২)

বিদায় হজ্জের সময় হযরত আলী (রা.)

বিদায় হজ্জের সময় রাসূল ﷺ নিজে তেষট্টিটি উট কুরবানী করলেন। তারপর আলীকে (রা.) আদেশ দিলেন একশত পূর্ণ হতে বাকি যেগুলো আছে কুরবানী করার জন্য। হযরত আলী বাকিগুলো কুরবানী করলেন। আল্লাহর নবী ﷺ হযরত আলীকে আরো নির্দেশ দিলেন গোশত, চামড়া এবং পশুর প্রাসঙ্গিক বস্তুসমূহ সদকা করে দাও এবং গোশত কাটার এবং চামড়া ছিলানো কোনো মজুরী কুরবানীর পশু থেকে দেওয়া যাবে না। অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূল ﷺ একাকি সাতটি কুরবানী করেছেন তারপর বাকিগুলো তেষট্টি পূর্ণ করার সময় হযরত আলী নবী ﷺ কে সহযোগিতা করেছেন। তারপর একশত পূর্ণ হতে বাকি যা ছিল হযরত আলী একাকি কুরবানী করেছেন। বিদায় হজ্জের সময় রাসূল ﷺ যে নির্দেশ দিতেন আলী (রা.) তা মানুষকে ঘোষণা করে শুনাতেন। আমর বিন সালিম তাঁর মাতা থেকে বর্ণনা করেছেন, এ মহিলা বলেন, আমরা মিনায় ছিলাম তখন আলী (রা.) ঘোষণা করলেন যে আল্লাহর নবী বলেছেন, এই দিনগুলো পানাহারের দিন সুতরাং এদিনে কেউ রোযা রাখবে না। *[চলবে]*

আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) লিখিত
তাফসীর গ্রন্থ
আত্‌তানভীর থেকে
সুরা ফাতিহার তাফসীর শীঘ্রই প্রকাশ হচ্ছে

পবিত্র মাহে রামাদান ও করণীয় কিছু আমল

মোস্তফা মনজুর

আমাদের সামনে পবিত্র মাহে রামাদান। মুসলিম মাত্রই এ মাসের প্রতীক্ষায় থাকেন। রামাদান আমলের মাস। যত বেশি আমল করা যায় ততই উত্তম। তবে আমাদের কৃত আমল যেন বরবাদ না হয়। আমল যা-ই করব, কম হোক বেশি হোক, তা যেন কবুল হয় সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। এজন্য প্রথমে কিছু সাধারণ মূলনীতি উল্লেখ করে কিছু আমলের বিষয়ে আলোচনা করব।

ক. প্রথমেই ইখলাস: আমরা যা কিছুই করব সবই আল্লাহর জন্য। ছোট থেকে ছোট কাজও যেন আল্লাহর জন্য হয়, তাঁর সন্তুষ্টির জন্য হয়। মনে করেন, ইফতার রান্না করবেন বা প্রস্তুত করবেন, নিয়ত যেন থাকে এতে আমাদের রব খুশি হবেন। কাউকে সাহায্য করা, কারো সাথে হাসিমুখে কথা বলা সবই আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আর এসব যদি আল্লাহর বিধান জেনে খুশি মনে পালন করেন তবে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভ করাটাই স্বাভাবিক। আমলের ক্ষেত্রে তা আরো বেশি জরুরি। অন্য কাউকে খুশি করার জন্য নয়, বাবা-মায়ের আদেশের কারণে নয় বরং এসব আমলে আমার-আপনার রব খুশি হবেন এ নিয়ত রাখবেন। হ্যাঁ, এমন নিয়ত একদিনেই হয়তো আসবে না, কিন্তু যখনই মনে হবে নিজের নিয়তকে ঠিক করে নিন। ইন শা আল্লাহ কিছুদিন পরই আপনার কাজে ইখলাসের দেখা মিলবে। আর ইখলাসের ফলাফল হলো, আপনি ইবাদাত ও আমল করে স্বাদ পাবেন, করতে ভালো লাগবে। এজন্যই তো আমাদের সালাফদের রাতভর আমল আমাদের কাছে রূপকথা মনে হয়। অথচ সাত ঘন্টার ক্রিকেট খেলা দেখা আমাদের নিকট বাস্তব লাগে।

খ. দ্বিতীয়ত সুন্নাহর অনুসরণ: সব কাজ আল্লাহর রাসূল (সা.) এর সুন্নাহর অনুসরণে হওয়া চাই। আল্লাহর রাসূল (সা.) যেভাবে করেছেন, আমাদের দ্বারা তো সেভাবে করা সম্ভব নয়, তবে আমলের কাঠামো তো আমরা চেষ্টা করে সেরূপ করতে পারি। তা-ই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টার খবর আমাদের চাইতে আল্লাহই ভালো জানেন। হ্যাঁ, যেসব কাজে ইমামগণ ইখতিলাফ করেছেন তাতে আমাদের ইখতিয়ার আছে। আমরা যার যার মাযহাব মেনেই আমল করব। কারণ সুন্নাহর অনুসরণের ক্ষেত্রে আমাদের ইলম আর তাকওয়ার চাইতে ইমামগণের ইলম আর তাকওয়ার উপর নির্ভর করাই মঙ্গলজনক।

গ. লোক দেখানো বা লোক শোনানোর প্রবণতা বাদ দেওয়া: ইখলাসের কথা বলার পর আবার এ কথা বলা জরুরি মনে করছি। কারণ বর্তমানে আমাদের সমাজে এসবের প্রবণতা খুব ব্যাপক। অনেকে ইখলাসের সাথেই কোনো আমল করে, কিন্তু পরে মানুষকে জানানোর লোভ সামলাতে না পেরে আমলটাকে বরবাদ করে দেয়। আপনি হয়ত তাহাজ্জুদ পড়ছেন, দান করছেন, কিন্তু সেসব ফেসবুকে বা সোশ্যাল মিডিয়ায় বলে বেড়ানোর বিষয় নয়। সেটা থাকুক না আপনার আর আপনার রবের কাছেই।

ঘ. নিষ্ঠার সাথে, যথাসম্ভব সুন্দর করে আমল করা: আমলের ক্ষেত্রে পরিমাণের চিন্তা না করে গুণগত মানের চিন্তা করা। অর্থাৎ আমি কত রাকাআত নামায পড়লাম সেটা যেন আমার প্রধান চিন্তা না হয়। বরং আমার নামায কতটুকু সুন্দর হলো, আমার নামায কতটুকু আল্লাহর রাসূল (সা.) এর নামাযের সদৃশ হলো এই চিন্তা করা উচিত।

নফল নামায

মাহে রামাদানের বিশেষ ফযীলত হচ্ছে এ মাসে একটি নফল অন্য মাসের একটি ফরযের সমতুল্য সাওয়াব নিয়ে আসে। সুতরাং এ মাসই হচ্ছে নফল নামাযের সর্বোত্তম সময়। এছাড়াও রামাদানে আমরা দুইটি বিষয় খুব গুরুত্ব সহকারে আদায় করব।

এক. প্রতি ওয়াক্তের নামাযের সুন্নাত নামায। আমাদের অনেকে বর্তমান সময়ে সুন্নাত নামাযের গুরুত্ব দিতে চান না। এসব সুন্নাত নামায হচ্ছে প্রতি ওয়াক্তের অলংকার। সুন্নাত ছাড়া শুধু ফরয নামায যেন তেল-নুনবিহীন তরকারী। আমরা অন্তত এ মাসে চেষ্টা করব এসব সুন্নাত নামায যেন না ছুটে যায়।

দুই. তারাবীহ নামায। এক্ষেত্রেও অনেকে অলসতা করেন। আবার কেউ ৮ রাকাআত পড়ার পক্ষপাতী। এটা না করে আমরা তারাবীহ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আদায় করব। তারাবীহ না পড়লে রোযার হয়তো কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু রামাদান মাসের পূর্ণ ফযীলত পেতে হলে তারাবীহ না পড়লে হবে না। তারাবীহ তো শুধু এ মাসেরই আমল। রোযা আপনি অন্য মাসেও রাখতে পারেন, কিন্তু তারাবীহ? রামাদান ছাড়া তারাবীহ নেই। অতএব রামাদানের পূর্ণ বরকত হাসিল করতে চাইলে তারাবীহ আমরা পূর্ণরূপেই পড়ব ইন শা আল্লাহ।

আমি আট বা বিশ এ তর্কে যাচ্ছি না। তবে একথা বলতে চাই, আমরা চেষ্টা করব বিশ রাকাআতই পড়তে। কেননা তাতে নামায বেশি পড়ার সাওয়াব তো আমরা পাচ্ছিই। হ্যাঁ, যদি শারঈ ওজর (সফর, অসুস্থতা) থাকে তাহলে সুবিধামতো যতটুকু পারেন ততটুকুই পড়বেন, তা চার হোক বা আট বা ষোল। একটা কথা মনে রাখবেন, কতটুকু নামায পড়ছেন এবং কেন পড়ছেন তার খবর আপনি যেমন জানেন। তার চাইতে বেশি জানেন আপনার মালিক। যদি অলসতার কারণে বা প্রবৃত্তির অনুসরণে আপনি আট রাকাআতের সমর্থক হয়ে যান, তাহলে জেনে রাখবেন আপনার আট রাকাআতও কবূল হওয়ার সম্ভাবনা কম। কেননা আপনার নিয়ত প্রবৃত্তির কাছেই বাঁধা।

আর যারা নিয়মিত বিভিন্ন সময়ের নামায (ইশরাক, চাশত, আওয়াবীন) আদায় করেন সেগুলোও আদায় অব্যাহত রাখা উচিত। আমরা যারা এসবে নিয়মিত নই, তারাও চেষ্টা করতে পারি এগুলো আদায়ের। তবে কিছু আমল আমরা করতেই পারি। যেমন- ক. তাহাজ্জুদ পড়া। সাহরী খাওয়ার সময় দুই রাকাআত, চার রাকাআত বা আট রাকাআত

যতটুকু সম্ভব পড়ে নেওয়া। ঘুম থেকে উঠেই যদি মুখ ধোয়ার সময় উযূ করে ফেলি তো দু'চার রাকাআত নামায পড়তে অসুবিধা হওয়ার কথা না। নফল সালাতের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে তাহাজ্জুদ। আর রাত্রির এ সময় আল্লাহ তাআলা এমনিতেই বান্দাহ'র জন্য তাঁর রহমতের দ্বার খুলে দেন। রামাদান মাসে আমরা এমনিতেই এ সময় উঠি। এমতাবস্থায় যদি রহমত না নিতে পারি তাহলে দুর্ভাগ্যের দায় আর কে নেবে। এটা তো এমন যে, ঘরে ঘরে এসে কেউ গিফট দিয়ে যাচ্ছে আর আমরা ঘরের দরজাই খুলছি না।

দান সাদকাহ

রামাদান, সহমর্মিতা ও সহযোগিতারও মাস। পারস্পরিক সৌহার্দ্য এ মাসে বৃদ্ধি পায়। ছোটবেলায় দেখতাম প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোন প্রতিবেশির ঘর থেকে ইফতার আসত। আমরাও অন্যের ঘরে নিয়ে যেতাম। নিজের ঘরে ভালো ইফতার থাকার পরও অন্যের ইফতারের প্রতি যে অন্যরকম এক আকর্ষণ ছিল, তা আজও যায়নি। আমাদের সে সংস্কৃতি আজ নেই বললেই চলে। অথচ রামাদানের একটি শিক্ষা এমনই।

প্রিয় পাঠক, এবারের রামাদান যেন হয় আমাদের সত্যিকারের সংযমের রামাদান। যথাসম্ভব দান ও সাদাকার হাত আমরা বাড়িয়ে দেব, লোকদের ইফতার ও সাহরী করানোর চেষ্টা করব। বিশেষ করে আমাদের অধীন যারা আছেন, যেমন বাড়ির দারোয়ান-কেয়ারটেকার তাঁদের খেয়াল রাখব। আমরা অনেকে রামাদান মাসে যাকাত দিয়ে থাকি। আর যারা অন্য সময় দিয়ে থাকি, তারাও এবারের দুর্যোগের কথা মাথায় রেখে রামাদানেই তা আদায় করতে পারি। পাশাপাশি উশর বা ফসলের যাকাতও আদায় করে দিলে ভালো হয়।

রামাদানের মূল শিক্ষা তাকওয়া হাসিলের কথা আমরা সকলেই জানি। তাকওয়া হচ্ছে আল্লাহর ভয়। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস আপনার যত মজবুত আপনার তাকওয়া ততই বেশি হবে। জেনে রাখবেন, অন্যান্য ইবাদতের তুলনায় যাকাত ও দান-সাদকায় ঈমানের প্রকাশ সবচেয়ে বেশি হয়। কেননা নামায-রোযায় শারীরিক পরিশ্রম হয়। আরেকটি কারণেও দান সাদকার পরিমাণ এ মাসে বাড়িয়ে দেওয়া উচিত। দান-সাদকা বালা-মুসীবত দূর করে। বর্তমানের চেয়ে বিপদগ্রস্ত মানুষ আগে কখনোও ছিল না, অন্তত আমাদের সময়ে। হয়তো আমাদের দান সাদকার কারণে আল্লাহ তাআলা এ মুসীবত আমাদের থেকে দূর করে দেবেন। যদি সামগ্রিকভাবে এ বিপদ দূর নাও হয়, দানকারীকে হয়ত আল্লাহ তাআলা রক্ষা করবেন।

দান-সাদকার ক্ষেত্রে সালাফদের একটি আমল আমরা ভুলেই গেছি। তাঁরা পকেটে যা থাকত সবই দিয়ে দিতেন, বা দানের সময় গণনা করতেন না। আমরাও এমন করার চেষ্টা করতে পারি। প্রথমে না হয়, পকেটে গণনা না করে অল্প কিছুই রাখি, যাতে দেওয়ার সময় সব দিয়ে দেওয়া যায়। এভাবে একসময় হয়তো সালাফদের মতো আমাদের দানের হাতও লম্বা হবে। দানের ক্ষেত্রে পরিমাণ বা কত দিলাম তা ধর্তব্য নয়। কেননা সকলের সামর্থ্য সমান নয়। ১০০ টাকা থেকে ২ টাকা দেওয়া ব্যক্তির সাওয়াব তাঁর চাইতে বেশি হতে পারে যে ১০০ টাকা দান করেছে তার এক লক্ষ টাকা থেকে। এখানে অনুপাত নয়, বরং নিজের ত্যাগের দিকটাই প্রাধান্য পাবে। আমি বলছি না, আজ থেকেই আমরা সালাফদের মত নিজেরা না খেয়ে অন্যদের দিতে থাকব। আমরা শুরু করি, অল্প অল্প দান করে অভ্যস্ত হই। হয়তো একসময় আল্লাহ আমাদের এসব দানে খুশি হয়ে উত্তম দান করার জন্য আমাদের কবূল করবেন।

ইস্তিগফার ও তাওবা

মাহে রামাদান এই উম্মতের জন্য একটি বিশেষ নিআমত। বিশেষ করে নিজের গুনাহ মাফের সবচেয়ে উত্তম সময়। রামাদান পাওয়ার পরও যদি আমরা গুনাহগার হিসেবেই ঈদের মাঠে উপস্থিত হই তাহলে আমাদের চাইতে বড় দুর্ভাগা আর কেউ নেই। এমনিতেই আল্লাহ তাআলা ওসীলাহ খুঁজেন বান্দাকে মাফ করে দেওয়ার জন্য। তার উপর রামাদানের অবারিত রহমত ও মাগফিরাতের সুযোগ বিরাট গাধা ছাড়া আর কেউ অবহেলা করার কথা না। রোযাদারদের ক্ষমা প্রার্থনা আল্লাহ কবূল করেন। আমাদের মালিক শুধু অপেক্ষায় আছেন কখন আমরা তাঁর দিকে ফিরে যাব, তাঁর কাছে কৃত পাপের ক্ষমা চাইব। বিশ্বাস করুন, আপনার ক্ষমা চাইতে সময় লাগতে পারে, কিন্তু আল্লাহ তাআলার ক্ষমার ঘোষণা আসতে দেরি হয় না, যদি আন্তরিকভাবে ক্ষমা চান।

রামাদানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও আমল হচ্ছে তাওবা ও ইস্তিগফার। নিজের প্রতিটি পাপের কথা স্মরণ করে ক্ষমা চান, শেষ রাতে জায়নামাযে কান্নাকাটি করুন, দেখবেন স্বর্গীয় অনুভূতি কাকে বলে। অনেক জায়গাতেই তো স্বর্গীয় অনুভূতির কথা শুনেছেন, পড়েছেন; কিন্তু অনুভব করা আমাদের অনেকেরই হয়নি। খালিস তাওবা ও ইস্তিগফার করার পর আপনি সে অনুভূতি লাভ করবেন। রামাদানে শুধু আনুষ্ঠানিকভাবে নয়, বরং সদাসর্বদাই ইস্তিগফারের আমল করা উচিত। উঠতে, বসতে, দাঁড়ানো শোয়া সব অবস্থাতেই ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। কখন আল্লাহ তাআলা কবূল করে নেবেন তা তিনিই ভালো জানেন। তাছাড়া আমাদের দীলের যে অবস্থা, সত্যিকারের তাওবা বা ইস্তিগফার কয়জনের নসীব হয় তা বলা কঠিন। দুনিয়ার মহব্বতে আমাদের অন্তর এতই গাফিল যে, এই দুর্যোগেও আমরা লম্বা জীবনের আশা করি, ভেবে বসে আছি, আরেকটু বয়স হোক তারপর না হয় তাওবা করা যাবে। মনে রাখবেন আমাদের প্রিয়নবী (স) দৈনিক ৭০ বারেরও অধিক ইস্তিগফার করতেন। আর আমরা? একবার বলতেও ভয় পাই। আমাদের তো ৭০ কোটি বার ইস্তিগফার করলেও তা যথেষ্ট হওয়ার কথা না। তাছাড়া এক পাপের জন্য ৭০ বার তাওবা ও ইস্তিগফার করার কথাও এসেছে। সুতরাং আমরা তাওবা ও ইস্তিগফারের সুযোগ কেন ছাড়ব?

আরো একটি কথা, অনেকে ভাবি- তাওবা বা ইস্তিগফার করে কী লাভ? আমার মনে তো আর সে আন্তরিকতা নেই। তবুও করুন। কেননা বছরের পর বছর ধরে যে মন নষ্ট হয়েছে, তা একদিনে ঠিক হবে না। তবে ইস্তিগফারের ব্যাপার ভিন্ন। আপনি যতই করবেন ততই আপনার লাভ, তাতে আপনি একনিষ্ঠ হতে পারুন আর না-ই পারুন। মেহেরবানী করে আল্লাহ তাআলা যদি আপনার কোন একটি ইস্তিগফারও কবূল করে নেন, তাহলে সম্ভবত এই রামাদানে আপনি সৌভাগ্যবানদের দলেই যোগ দিলেন।

সুতরাং রামাদানের রহমত, বরকত, মাগফিরাত ও নাজাত লাভের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা উচিত। ভালো আমল হচ্ছে সে প্রস্তুতি। অতএব, আন্তরিকতা ও এখলাছের মাধ্যমে রামাদানে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। শুধু মনে রাখবেন এই রামাদান যেন আমাদেরকে গুনাহ থেকে মুক্ত না করে চলে না যায়। এবার কীভাবে নিজেকে আল্লাহর দরবারে মাফ করাবেন তা আপনি আমার চাইতে ভালোই জানেন।

তারাবীহ নামাযের রাকাআত সংখ্যা নিয়ে বিভ্রান্তি ও জবাব

নজমুল হুদা খান

সালাতুত তারাবীহ অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ একটি নামায। রামাদান মাসে ইশার নামাযের পর জামাআতে এ নামায আদায় করা হয়। এটি সুন্নতে মুআক্কাদাহ। তারাবীহ (تراويح) শব্দটি তারবীহাতুন (ترويحة) শব্দের বহুবচন। ترويحة শব্দের অর্থ হলো একবার বিশ্রাম নেয়া। তারাবীহ একটি বিশেষ নামায, যা মাহে রামাদ্বানের মুবারক রজনীতে জামা'আতের সাথে আদায় করা হয়। সাহাবায়ে কিরাম (রা.) যখন সম্মিলিতভাবে এ নামায পড়তে শুরু করেন তখন থেকেই তাঁরা প্রতি দুই সালাম অর্থাৎ চার রাকাআতের পর একবার বিশ্রাম নিতেন। এ জন্য এ নামাযকে সালাতুত তারাবীহ বলা হয়।

রাসূলে পাক ﷺ সিয়াম তথা রোযা ও তারাবীহকে গুনাহ মাফের মাধ্যম বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِرَمَضَانَ مَنْ قَامَهُ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ .

-আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে মাহে রামাদান সম্পর্কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে, সওয়াবের প্রত্যাশায় এ মাসে রাত্রিজাগরণ করে তার পূর্বেকার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। (বুখারী, بَابُ فَضْلِ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ হাদীস নং-২০০৮)

তারাবীহ নামাযের সূচনা

তারাবীহ নামায রাসূল ﷺ এর যামানাতেই শুরু হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে জামাআতে এ নামায আদায় করেছেন। মুসলিম শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিয়ামে রামাদ্বান তথা তারাবীহ নামাযের প্রতি উৎসাহ প্রদান করতেন, তবে তিনি তা অপরিহার্য করেননি (মুসলিম, বাব- باب الترغيب فى قيام رمضان وهو التراويح হাদীস নং-১৮১৬)

অনুরূপভাবে উম্মতের উপর ফরয হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তা নিয়মিত জামাআতে আদায় করেননি। বুখারী শরীফে আছে, হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ রামাদ্বান মাসের এক রাতে মসজিদে গমন করে নামায (তারাবীহ'র নামায) পড়লেন এবং অনেক সাহাবীও তাঁর সাথে নামাযে শামিল হলেন। সকালে সাহাবায়ে কিরাম এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করলেন। ফলে পরবর্তী রাতে আরো অধিক সংখ্যক সাহাবী জমায়েত হলেন। তখন রাসূলে পাক ﷺ নামায আদায় করলেন, উপস্থিত সাহাবীগণও তাঁর সাথে নামায পড়লেন। এ দিনও সকালে হলে তারা এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করলেন। ফলে তৃতীয় রাতে মুসল্লির সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেল। ঐ রাতে রাসূল ﷺ নামায আদায় করলেন, তার সাথে সাহাবায়ে কিরামও নামায পড়লেন। চতুর্থ রাতে মুসল্লীর সংখ্যা মসজিদের ধারণ ক্ষমতার চেয়ে বেশি হয়ে গেল। কিন্তু রাসূল ﷺ ফজরের নামাযের আগে মসজিদে আসলেন না। ফজরের নামায শেষে তিনি মুসল্লীদের দিকে ফিরলেন, আল্লাহর ওয়াহদানিয়াত ও আপন রিসালতের সাক্ষ্য দিলেন, অতঃপর বললেন, (হে আমার সাহাবীগণ!) তোমাদের অবস্থা আমার নিকট গোপন ছিল না । তবে এ নামায তোমাদের উপর ফরয হয়ে যাবে অতঃপর তোমরা তা আদায় করতে পারবে না এ আশঙ্কায় আমি তোমাদের কাছে আসিনি। (বুখারী, বাব- باب فضل من قام رمضان হাদীস নং ২০১২)

উক্ত হাদীস থেকে জানা গেল যে, রাসূল ﷺ তারাবীহর নামাযকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু উম্মতের উপর ফরয হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় চতুর্থ রাতে তিনি মসজিদে আসেননি। ফলে তৃতীয় রাতের পর উক্ত নামায জামাআত সহকারে আদায় হয়নি। উক্ত হাদীসের শেষে এ বর্ণনাও আছে যে, রাসূল ﷺ এর ইন্তিকাল পর্যন্ত তারাবীহর নামাযের বিষয়টি এমনই ছিল। হাদীসের ভাষ্য হলো- فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَٰلِكَ এর সারকথা হলো, রাসূল ﷺ এর জীবদ্দশায় বর্তমানের মত নিয়মিত জামাআতে বিশ রাকাআত তারাবীহ আদায়ের প্রচলন হয়নি। বরং তখন প্রত্যেকে একাকী এ নামায আদায় করতেন।

অন্য হাদীসে আছে, হযরত আবূ বকর (রা.)-এর পূর্ণ খিলাফতকাল ও ওমর (রা.)-এর খিলাফতের প্রথম দিক পর্যন্ত বিষয়টি এমনই ছিল। অর্থাৎ প্রত্যেকে একাকী তারাবীহ আদায় করতেন। অথবা ছোট ছোট জামাআতে আদায় করতেন। অতঃপর হযরত ওমর ফারুক (রা.) তাঁর খিলাফতকালে একদা মসজিদে গিয়ে দেখতে পান যে, মসজিদের বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট জামাআত হচ্ছে। তখন তিনি মনে করেন সকল মুসল্লিকে এক ইমামের পিছনে একত্রিত করা উচিত। এ বিবেচনা থেকেই তিনি এক ইমামের অধীনে বিশ রাকাআত তারাবীহ জামাআতে আদায়ের ব্যবস্থা করেন। এ সম্পর্কে বুখারী শরীফে আছে, ইবনে শিহাব যুহরী উরওয়া ইবনুয যুবায়র থেকে, তিনি আবদুর রহমান ইবনে আবদুল কারী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা রামাদানের রাতে আমি ওমর (রা.)-এর সাথে মসজিদে গেলাম। তখন মানুষেরা পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত ছিল। কোনো ব্যক্তি নিজে নামায আদায় করছিলেন এবং তার সাথে একটি দল নামায পড়ছিল। তখন ওমর (রা.) বললেন, আমি মনে করি এ সকল লোককে একজন ইমামের অধীনে একত্রিত করতে পারলে ভালো হবে। অতঃপর তিনি এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন এবং তাদেরকে উবাই ইবনে কা'ব (রা.) এর অধীনে (ইমামতিতে) একত্রিত করে দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, অন্য একদিন আমি আবার ওমর (রা.)-এর সাথে বের হলাম। তখন লোকেরা তাদের ইমামের সাথে নামায আদায় করছিলেন। তা দেখে উমর (রা.) বললেন, نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ অর্থাৎ এটা কতই না সুন্দর আবিষ্কার। (বুখারী, বাব- باب فضل من قام رمضان হাদীস নং ২০১০)

এখানে হযরত ওমর (রা.) 'বিদআত' শব্দটি উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, হযরত উমর (রা.) তারাবীহকে যে বিদআত বলে আখ্যায়িত করেছেন তা ছিল নিছক আকৃতিগত উদ্ভাবন। কারণ তারাবীহতে এভাবে একত্রিত হওয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ওফাতের পরে হলেও এর বাস্তবতা ও মূল বিষয়ের প্রমাণ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগেও ছিল। সে হিসাবে একে বিদ'আত বা নতুন উদ্ভাবন বলা যায় না। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ ই সাহাবায়ে কিরামকে তারাবীহ ঘরে পড়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে তাঁদের উপর তা ফরয হয়ে না যায়।

তারাবীহর নামায বিশ রাকাআত

তারাবীহর নামায বিশ রাকাআত ও তা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর যুগ থেকে তারাবীহ'র নামায বিশ রাকাআত হিসেবেই পালিত হয়ে আসছে। তাবিঈন ও তাবে তাবিঈনের যুগ এবং পরবর্তী কোনো যুগে এর ব্যত্যয় ঘটেনি। চার মাযহাবের

প্রত্যেক ইমাম তারাবীহ্র নামায বিশ রাকাআত বলেছেন। বিশ রাকাআতের কম কেউ বলেননি। এমনকি ইমাম মালিক (র.) থেকে এক বর্ণনায় তিন রাকাআত বিতরসহ তারাবীহ্র নামায ৩৯ রাকাআত এবং অন্য বর্ণনায় একচল্লিশ রাকাআত বলে উল্লেখ রয়েছে। ইমাম মালিক (র.)-এর অন্য বর্ণনা জমহুরের অনুরূপ, অর্থাৎ তারাবীহ্র নামায বিশ রাকাআত।

আল্লামা ইবনে কুদামা (র.) বলেন,

والمختار عند أبي عبد الله رحمه الله فيها عشرون ركعة وبهذا قال الثوري و أبو حنيفة و الشافعي وقال مالك : ستة وثلاثون.

ইমাম আবূ আবদিল্লাহ অর্থাৎ ইমাম আহমদ (র.)-এর নিকট গ্রহণযোগ্য অভিমত হলো তারাবীহ'র নামায বিশ রাকাআত। সুফিয়ান সাওরী, ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম শাফিঈও অনুরূপ বলেছেন। আর ইমাম মালিক (র.) বলেছেন, তারাবীহ্র নামায ৩৬ রাকাআত। (আল মুগনী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৮৩৩)

ইমাম নববী (র.) বলেন,

إعلم أن صلاة التراويح سنة باتفاق العلماء ، وهي عشرون ركعة ، يسلم من كل ركعتين ، وصفة نفس الصلاة كصفة باقي الصلوات على ما تقدم بيانه.

-জেনে রাখো, উলামায়ে কিরামের ঐকমত্যে তারাবীহ্র নামায সুন্নত। আর এটি বিশ রাকাআত। প্রত্যেক দুই রাকাআতে সালাম ফিরাবে। আর এ নামাযের পদ্ধতি অন্যান্য নামাযের মতোই, যার বর্ণনা পূর্বে রয়েছে।

প্রকাশ থাকে যে, ইমাম মালিক (র.) থেকে বিশ রাকাতের অধিক যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে অতিরিক্ত রাকাআতসমূহ মূলত তারাবীহ নয়। যেমন ইবনে কুদামা বলেন, কোনো কোনো আলিম বলেছেন, মক্কার অধিবাসীগণ চার রাকাআত তারাবীহ পড়ে সাতবার তাওয়াফ করতেন। এর পরিবর্তে মদীনাবাসীগণ চার রাকাআত করে অতিরিক্ত নামায পড়তেন, যাতে তারা মক্কাবাসীদের মতো অধিক সওয়াব হাসিল করতে পারেন। (আল মুগনী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৮৩৩) ফলে বিতরসহ তাদের নামায ৩৯ রাকাআত হয়ে যেত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশ রাকাআত তারাবীহ আদায় করেছেন

বিভিন্ন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন রাত জামাআতে তারাবীহ আদায় করেছেন। তবে এসব হাদীসে রাকাআত সংখ্যা উল্লেখ নেই। হযরত ইবনে হাজার আসকালানী (র.) 'আত তালখীস' এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর এক বর্ণনায় আছে রাসূলুল্লাহ ﷺ একাকী বিশ রাকাআত তারাবীহ আদায় করতেন। (আল তালখীস আল হাবীর, ২য় খণ্ড, বাব-باب صلاة التطوع)

উক্ত হাদীসের সনদের মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে। সুতরাং নিশ্চিতভাবে এটি বলা যাবে না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশ রাকাআত তারাবীহ আদায় করেছেন। তবে বিশ রাকাআত তারাবীহ'র উপর সাহাবায়ে কিরাম আমল করেছেন এবং মুসলিম উম্মাহও এটি গ্রহণ করেছেন।

তারাবীহ নামাযের রাকাআত নিয়ে বিভ্রান্তি

হযরত উমর ফারুক (রা.)-এর যুগ থেকে মুক্কা মুকাররামা ও মদীনা মুনাওয়ারাসহ দুনিয়ার মুসলমানগণ শত শত বছর ধরে তারাবীহর নামায বিশ রাকাআতই আদায় করে আসছেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে আহলে হাদীস ও সালাফী নামধারী গায়র মুকাল্লিদগণ (লা-মাযহাবীরা) তারাবীহ নামাযের রাকাআত নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। হিজরী তের শতকের শেষদিকে (১২৮৫ হিজরীতে) ভারত উপমহাদেশে মাযহাব অস্বীকারকারী গায়র মুকাল্লিদ আলিম মুফতী মুহাম্মদ হুসাইন বিটালভী এ বিভ্রান্তি শুরু করেন। তিনি ফতওয়া প্রদান করেন যে, আট রাকাআত তারাবীহ পড়া সুন্নাত, বিশ রাকাআত পড়া বিদআত। আরববিশ্বে এ ফিতনা শুরু হয় আরো অনেক পরে। আরববিশ্বে সর্বপ্রথম এ ফিতনাকে দলীল দ্বারা প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ চেষ্টা করেন শায়খ নাসীব রেফাঈ। সমকালীন আলিমগণ তার মতামতকে খণ্ডন করেন। এর পরবর্তীতে ১৩৭৭ হিজরী সনে শায়খ নাসির উদ্দীন আলবানী 'তাসদীদুল ইসাবাহ' নামক একটি বইয়ের মাধ্যমে এ বিষয় প্রমাণ করার চেষ্টা করলেও তিনি তার মতের স্বপক্ষে কোনো সাহাবী, তাবিঈ বা কোনো ফকীহ ইমাম অথবা কোন মুহাদ্দিস ইমামের বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারেননি, যিনি বিশ রাকাআত তারাবীহর ব্যাপারে আপত্তি করেছেন। তবে তিনি এ বিষয়ে মনগড়াভাবে বলে দিয়েছেন যে, ইমাম মালিক (র.) নাকি বিশ রাকাআত তারাবীহ পড়তে নিষেধ করেছেন।

বিভ্রান্তির জবাব

তারাবীহ নামাযের রাকাআত নিয়ে সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈনের বর্ণনা

পূর্বে উল্লিখিত সহীহ বুখারীর বর্ণনা থেকে প্রমাণিত যে, হযরত ওমর (রা.) নিয়মিতভাবে জামাআতে তারাবীহর নামায আদায়ের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু এ হাদীসে রাকাআত সংখ্যার উল্লেখ নেই। তবে সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈনে ইযামের বিভিন্ন বর্ণনায় বিশ রাকাতের কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। যারা তারাবীহ নামাযের রাকাআত সংখ্যা নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ায় তাদের জবাব হিসেবে এসকল বর্ণনাই যথেষ্ট। নিম্নে এ সংক্রান্ত কিছু বর্ণনা উপস্থাপন করা হলো।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي في شهر رمضان في غير جماعة بعشرين ركعة والوتر -নবী করীম ﷺ রামাদ্বান মাসে একাকী বিশ রাকাআত তারাবীহ ও বিতর আদায় করতেন। (মুসান্নাফু ইবনে আবি শায়বাহ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৯৪)

হযরত সাইব ইবনে ইয়াজিদ (রা.) বলেন-

كنا نقوم في زمان عُمَر بن الخطاب رضي الله عنه بعشرين ركعة والوتر

-আমরা ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর সময়ে বিশ রাকাআত তারাবীহ ও বিতর নামায (জামাআতে) আদায় করতাম। (আস সুনানুস সুগরা লিল বায়হাকী; নাসবুর রায়াহ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৭৫)

বিশিষ্ট তাবিঈ হযরত ইয়াযীদ ইবনে রুমান (রা.) বলেন,

كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي رَمَضَانَ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ رَكْعَةً.

-ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর যুগে মানুষেরা রামাদান মাসে ২৩ রাকাআত নামায পড়তেন। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক, আস সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৯৬)

হযরত ইয়াযীদ ইবনে খুসায়ফা (র.) বলেন, সাইব ইবনে ইয়াযীদ (রা.) বলেছেন,

كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعِشْرِينَ رَكْعَةً . قَالَ: وَكَانُوا يَقْرَءُونَ بِالْمِئِينِ ، وَكَانُوا يَتَوَكَّئُونَ عَلَى عُصِيِّهِمْ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ شِدَّةِ الْقِيَامِ.

-তাঁরা (সাহাবা ও তাবিঈন) ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর যামানায় রামাদান মাসে বিশ রাকাআত নামায (তারাবীহ) পড়তেন। তিনি আরো বলেন, তারা নামাযে শতাধিক আয়াতবিশিষ্ট সূরাসমূহ পড়তেন এবং ওসমান ইবনে আফফান (রা.)-এর যুগে দীর্ঘ নামাযের কারণে তারা (কেউ কেউ) তাদের লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়াতেন। (আস সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৯৬)

বিখ্যাত তাবিঈ আবূ আবদুর রহমান আস সুলামী (রা.) বলেন,

أَنَّ عَلِيًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَعَا الْقُرَّاءَ فِي رَمَضَانَ ، فَأَمَرَ مِنْهُمْ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ عِشْرِينَ رَكْعَةً.

قَالَ : وَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُوتِرُ بِهِمْ.

হযরত আলী (রা.) (তাঁর খিলাফতকালে) রামাদানে কারীগণকে ডাকেন এবং তাদের একজনকে আদেশ করেন তিনি যেন লোকদের নিয়ে বিশ রাকাআত নামায পড়েন। আর আলী (রা.) তাদেরকে নিয়ে বিতর পড়তেন। (আস সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৯৬)

এ আলোচনা থেকে প্রমাণ হয় যে, তারাবীহর নামায বিশ রাকাআত। তিন খলীফা হযরত ওমর, ওসমান ও আলী (রা.)-এর যুগে বিশ রাকাআত তারাবীহই পড়া হয়েছে। সুতরাং বিশ রাকাআত তারাবীহ খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাত। আর তাঁদের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরার জন্য স্বয়ং রাসূলে পাক ﷺ নির্দেশ প্রদান করেছেন। যেমন, তিনি ইরশাদ করেন,

من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيرا ، فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ

-তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে বেঁচে থাকবে তোমরা অনেক ইখতেলাফ দেখতে পাবে। তখন তোমরা আমার সুন্নাহ ও হেদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাহ আঁকড়ে ধরবে। তোমরা তা আঁকড়ে ধরবে এবং মাড়ির দাঁত দিয়ে শক্ত করে ধরে রাখবে। (সুনানু আবি দাউদ, বাব بَابٌ فِي لُزُومِ السُّنَّةِ হাদীস নং ৪৬০৯)

বিশ রাকাআত তারাবীহ-এর উপর সাহাবায়ে কিরাম ও সালফে সালিহীনের ইজমা

হযরত ওমর (রা.)-এর সময় থেকে শুরু করে পরবর্তী সময়ে সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন, তাবে তাবিঈন সকলেই তারাবীহর নামায বিশ রাকাআতই আদায় করেছেন। এ বিষয়ে কেউ কোন দ্বিমত পোষণ করেননি। এ বিষয়ে আমলগত দিক থেকে সাহাবায়ে কিরাম ও সালফে সালিহীনের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হযরত মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, أجمع الصحابة على أن التراويح عشرون ركعة

-সাহাবায়ে কিরাম এ বিষয়ে একমত যে, তারাবীহ'র নামায বিশ রাকাআত। (মিরকাতুল মাফাতীহ, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৪৩৯)

ইমাম ইবনে কুদামা তারাবীহ'র নামায বিষয়ে ইমাম আহমদ (র.)-এর মত আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, "আমাদের (হাম্বলীদের) দলীল হলো, হযরত ওমর (রা.) যখন উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর পেছনে সাহাবায়ে কিরামকে একত্র করেছেন তখন তারা বিশ রাকাআত তারাবীহ পড়েছেন। ... ইমাম মালিক (র.) হযরত ইয়াযীদ ইবনে রূমান থেকে বর্ণনা করেন, মুসলমানগণ ওমর (রা.)-এর যুগে (বিতরসহ) ২৩ রাকাআত তারাবীহ পড়তেন। আর হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আলী (রা.) একজনকে নির্দেশ দেন যেন তিনি তাদের নিয়ে রামাদান মাসে বিশ রাকাআত তারাবীহ পড়েন। এটা মূলত, সাহাবায়ে কিরামের ইজমাকেই প্রকাশ করে। ...আর সাহাবায়ে কিরাম যে বিষয়কে অবলম্বন করেছেন তা-ই গ্রহণীয় ও অনুসরণীয়।" (আল মুগনী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৮৩৩)

ইমাম নববী (র.) বলেন, তারাবীহ নামায সুন্নাত হওয়ার বিষয়ে সকল আলিম একমত। এ নামায বিশ রাকাআত, যার প্রতি দুই রাকাআতে সালাম ফিরাতে হয়। (আল আযকার : ৮৩)

ইবনে তাইমিয়া'র দৃষ্টিতে বিশ রাকাআত তারাবীহ সুন্নাহ'র অন্তর্ভুক্ত

লা-মাযহাবীদের মান্যবর শায়খ ইবনে তায়মিয়া লিখেছেন, "যখন উমর (রা.) লোকদেরকে উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর পিছনে একত্রিত করে দিলেন তখন তিনি বিশ রাকাআত তারাবীহ ও বিতর পড়তেন। (আল-ফাতওয়া আল মিসরিয়্যা) তারাবীহ'র বিষয়ে ওমর (রা.)-এর সিদ্ধান্ত অর্থাৎ জামাআতবদ্ধভাবে বিশ রাকাআত তারাবীহ পড়াকে সুন্নত বলেছেন। তিনি লিখেছেন : "হযরত উমর (রা.) সকল সাহাবীকে উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর পিছনে এক জামাতে একত্রিত করেছেন। বলাবাহুল্য, উমর (রা.) খুলাফায়ে রাশিদীনের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ

'আমার সুন্নাহ ও আমার হেদায়াতপ্রাপ্ত খলীফাগণের সুন্নাহকে অবলম্বন করবে এবং মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে রাখবে।' মাড়ির দাঁতের কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ এজন্য বলেছেন যে, এভাবে ধারণ করলে তা মজবুত হয়ে থাকে। তারাবীহ বিষয়ে উমর (রা.)-এর এই কাজ সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত।" (ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া)

ইবনে তায়মিয়া যেখানে ওমর (রা.)-এর কাজকে সুন্নাহ'র অন্তর্ভুক্ত বলছেন সেখানে আধুনিক লা-মাযহাবীরা কিভাবে এটাকে বিদআত বলে?

বিশ রাকাআত তারাবীহ বিদআত নয়

সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন, তাবে তাবিঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীনসহ অন্যান্য উলামায়ে কিরামের বক্তব্য পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, তারা সকলেই তারাবীহর নামাযকে রাসূলে পাক ﷺ এর সুন্নাত হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। আর বিশ রাকাআত তারাবীহ জামাআতে আদায় করা খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাত, ইজমায়ে সাহাবা ও ইজমায়ে উম্মাহ হিসেবে গণ্য করেছেন। যদি তারাবীহর নামায সুন্নাত না হতো কিংবা বিশ রাকাআত আদায় করা বিদআত হতো তা হলে সর্বপ্রথম সাহাবায়ে কিরাম এর উপর আমল করতেন না।

সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিমসহ হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনা ও ইতিহাস থেকে প্রমাণিত হয় যে, মসজিদে নববীতে হিজরী ১৪ সন থেকে হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর ইমামতিতে জামাআতে তারাবীহ পড়া শুরু হয়। এ সময় বিশ রাকাআত তারাবীহ পড়া হতো। ঐ জামাআতের মুক্তাদি ছিলেন রাসূলে পাক ﷺ এর আদর্শে গড়া মুহাজির, আনসার ও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম (রা.)। যারা কোনো দিন কোনো মিথ্যার সাথে আপস করেননি। যদি বিশ রাকাআত তারাবীহ বিদআত হতো তাহলে তারা এর প্রতিবাদ ও বিরোধিতা করতেন। কিন্তু কেউই এ বিষয়ে কোন প্রতিবাদ করেন নি। বরং সকলে অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে এ জামাআতে শামিল হতেন। সুতরাং তারাবীহর নামায আট রাকাআত সুন্নাত বলা এবং বিশ রাকাআতকে বিদআত বলা সুন্নাতে খুলাফা, ইজমায়ে সাহাবা ও ইজমায়ে উম্মাহর বিরোধিতার শামিল। বরং দলীল-প্রমাণের আলোকে বলতে হবে, যারা তারাবীহর নামায আট রাকাআত বলছেন তারা সমাজে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন।

শেষকথা :

তারাবীহর নামায সুন্নাত। এটি যেমন সুন্নাতে রাসূল হিসাবে প্রমাণিত তেমনি খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাত হিসেবেও সুপ্রতিষ্ঠিত। রাসূলে পাক ﷺ নিজে বিশ রাকাআত তারাবীহ আদায় করেছেন। তবে ফরজ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তিনি পুরো রামাদান পুরো নামায মসজিদে জামাআতে আদায় করেননি। রাসূল ﷺ এর ইন্তিকালের পর ফরযিয়্যাতের আশঙ্কা রহিত হয়ে গেলে ওমর (রা.) উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-এর ইমামতিতে মসজিদে নববীতে বিশ রাকাআত তারাবীহ জামাআতে আদায়ের ব্যবস্থা করলে সাহাবায়ে কিরাম (রা.) সকলে এতে শামিল হন। তারা কেউই এর বিরোধিতা করেননি। ওমর (রা.)-এর যুগ থেকে অদ্যাবধি চৌদ্দশ বছরের অধিক সময় ধরে দুনিয়ার সকল প্রান্তের মুসলমানগণ এর উপরই আমল করে আসছেন। অতএব বিশ রাকাআত তারাবীহর উপর উম্মাহর ইজমা প্রতিষ্ঠিত। বিশ রাকাআত তারাবীহকে বিদআত কিংবা নাজায়িয বলা বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু নয়।

রামাদান মাসের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য

মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান

আরবী বর্ষপঞ্জির সবচেয়ে বরকতপূর্ণ মাস হচ্ছে মাহে রামাদান। এ মাস কুরআন নাযিলের মাস। এটি মুসলিম জাতির প্রতি মহান আল্লাহর অপার নিআমত। এ মাস হলো রহমত, মাগফিরাত, জান্নাত হাসিলের এবং জাহান্নামের অগ্নি থেকে আত্মরক্ষার মাস। হাদিসে এ মাসকে বরকতময় মাস বলে অভিহিত করা হয়েছে। এ মাসের রয়েছে বিশাল গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য। এ মাসের আসল মাহাত্ম্য হচ্ছে তাকওয়া অর্জন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

-হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেওয়া হলো, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীদের দেওয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার। (সূরা বাকারা, আয়াত-১৮৩)

তাকওয়া হলো- আল্লাহ যা আদেশ করেছেন তা পালন করা আর যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা। সিয়াম পালন দ্বারা বৈধ পানাহার ও যৌনাচার বর্জন করার পাশাপাশি অবৈধ আচার-আচরণ, কথা ও কাজ এবং ভোগ-বিলাস থেকে বেঁচে থাকতে হয়। সিয়াম পালনের মাধ্যমে বান্দাহ আল্লাহর নির্দেশের সামনে আত্মসমর্পণ করে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির আশায়। আর এভাবেই সে তাকওয়া অর্জনে সচেষ্ট হয়। সিয়াম পালনে শয়তান ও কু-প্রবৃত্তির ক্ষমতা দুর্বল হয়। নবী করীম ﷺ বলেন,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

-হে যুবকেরা! তোমাদের মধ্যে যে সামর্থ্য রাখে সে যেন বিবাহ করে। কেননা বিবাহ দৃষ্টি ও লজ্জাস্থানের সুরক্ষা দেয়। আর যে বিবাহের সামর্থ্য রাখে না সে যেন সিয়াম পালন করে। কারণ এটা তার রক্ষাকবচ।

এ থেকে বুঝা যায় জৈবিক চাহিদা নিয়ন্ত্রণের জন্য সিয়ামের গুরুত্ব অপরিসীম। সিয়ামের মাধ্যমে বান্দাহ আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ ও তার দাসত্বের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে।

মাহে রামাদান সবর তথা ধৈর্যের মাস। সিয়াম মনের চাহিদা পূরণে বাধা প্রদান করে। সিয়াম পালনকারী পার্থিব সকল ভোগ-বিলাস ত্যাগ করে দুনিয়ার প্রতি বিমুখ হয়ে আখিরাতমুখী হওয়ার দীক্ষা নিয়ে থাকে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক সীমারেখা লঙ্ঘন না করে তা মেনে চলার অভ্যাস গড়তে প্রশিক্ষণ নেয়। কখনো তাঁর সীমালঙ্ঘনের কথা চিন্তা করে না। আল্লাহ তাআলা সিয়াম সম্পর্কিত বর্ণনার পরে ঘোষণা করেন, تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا -এগুলো আল্লাহর সীমারেখা। সুতরাং এগুলোর নিকটবর্তী হয়ো না। (সূরা বাকারা, আয়াত-১৮৭)

সিয়াম পালনের মাধ্যমে কুপ্রববৃত্তির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব' এর মাধ্যমেই বান্দা সত্যিকার অর্থে একজন পরিশীলিত মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার সুযোগ পায়।

সিয়াম পালনে যেমন রয়েছে আধ্যাত্মিক গুরুত্ব তেমনি রয়েছে জাগতিক ও বৈষয়িক গুরুত্ব। প্রখ্যাত জার্মান চিকিৎসাবিদ ড. হেলমুট লুটজানার- এর 'The secret of successful fasting' বা 'উপবাসের গোপন রহস্য' বইটিতে মানুষের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন ও কার্যপ্রণালি বিশ্লেষণ করে নিরোগ, দীর্ঘজীবী ও কর্মক্ষম স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে বছরের কতিপয় দিন উপবাসের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

ড. লুটজানারের মতে, "খাবারের উপাদান থেকে সারা বছর ধরে মানুষের শরীরে জমে থাকা কতিপয় বিষাক্ত পদার্থ (টক্সিন), চর্বি ও আবর্জনা থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র সহজ ও স্বাভাবিক উপায় হচ্ছে সাওম বা উপবাস। উপবাসের ফলে শরীরের অভ্যন্তরে দহনের সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে শরীরের অভ্যন্তরে জমে থাকা বিষাক্ত পদার্থসমূহ দগ্ধীভূত হয়ে যায়।"

পোপ এলফ গাল ছিলেন নেদারল্যান্ডের একজন নামকরা পাদ্রী। রোযা সম্পর্কে তিনি তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেন, আমি আমার অনুসারীদের প্রতি মাসে তিনটি করে রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছি। এ কর্মপদ্ধতিতে দৈহিক ও পরিমাপিক সমন্বয় অনুভব করেছি। আমার রোগীরা বারংবার আমাকে জোর দিয়ে বলেছে, আমাকে আরও কিছু পদ্ধতি বলে দিন, কিন্তু আমি নীতি বানিয়ে দিয়েছি যে, দুরারোগ্য রোগীদের প্রতিমাসে তিনদিন নয় বরং পূর্ণ একমাস রোযা রাখার নির্দেশ দিব। আমি ডায়াবেটিস, হৃদরোগ ও পাকস্থলী রোগে আক্রান্ত রোগীদেরকে পূর্ণ একমাস রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছি। এ পদ্ধতি অবলম্বনে ডায়াবেটিস রোগের অবস্থার উন্নতি হয়েছে। তাদের সুগার কন্ট্রোল হয়ে গেছে। হৃদরোগীদের অস্থিরতা ও শ্বাস স্ফীতি হ্রাস পেয়েছে। আর সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছে পাকস্থলীর রোগীরা।" (ডা. মুহাম্মদ তারেক মাহমুদ, সুন্নাতে রাসূল ﷺ ও আধুনিক বিজ্ঞান, পৃ.১৪১)

সিয়াম পালনের ফলে মানুষের শরীরে কোনো ক্ষতি হয় না বরং অনেক কল্যাণ সাধিত হয়, তার বিবরণ কায়রো থেকে প্রকাশিত 'Science for Fasting' গ্রন্থে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্যের প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদগণ একবাক্যে স্বীকার করেছেন- The power and endurance of the body under fasting Conditions are remarkable; After a fast properly taken the body is literally boom afresh' অর্থাৎ রোযা রাখা অবস্থায় শরীরের ক্ষমতা ও সহ্যশক্তি উল্লেখযোগ্য; সঠিকভাবে রোযা পালনের পর শরীর প্রকৃতপক্ষে নতুন সজীবতা লাভ করে।"

প্রফেসর মুর পান্ড দিল অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির পরিচিত নাম। তিনি তার আত্মজীবনীতে লিখেন, "আমি বহু ইসলামী বইপত্র অধ্যয়ন করেছি। যখন রোযার অধ্যায়ে পৌঁছলাম, তখন আমি বিস্মিত হলাম যে, ইসলাম তার অনুসারীদেরকে এক মহৎ ফর্মুলা শিক্ষা দিয়েছে। ইসলাম যদি শুধু রোযার ফর্মুলাই শিক্ষা দিত, তা হলেও এর চেয়ে উত্তম আর কোনো নিআমত তাদের জন্য হতো না।"

মূলত মাহে রামাদান আত্মশুদ্ধি, প্রশিক্ষণ ও আত্মগঠনের মাস। কারণ, এ মাসে সিয়াম ও কিয়ামের মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে সম্পর্ক গভীর হয় এবং নফসের দাসত্বের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা যায়। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির পথ সুগম হয়। হাদীসে এ মাসের প্রথম দশকে রহমত, দ্বিতীয় দশকে মাগফিরাত ও শেষ দশককে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এ মাস পাওয়ার পরও যারা নিজেদেরকে পূত-পবিত্র, অন্যায়-অনাচার, পাপ-পঙ্কিলতা মুক্ত করতে পারল না রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে ধিক্কার দিয়ে ঘোষণা করেন,

رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ

-ঐ ব্যক্তি ধ্বংস হোক, যার কাছে রামাদান মাস আসলো অথচ তার গোনাহগুলো ক্ষমা করিয়ে নিতে পারল না। (তিরমিযী)

রামাদান মাসের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য বর্ণনায় অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হাদীসে কুদসীতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা বলেন, الصوم لي و انا أجزي به -রোযা আমার জন্য আর আমি নিজেই এর পুরস্কার দেব।

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ وَإِنْ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي الصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا

-রোযা (জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচার জন্য) ঢাল স্বরূপ। তোমাদের কেউ রোযা রেখে অশ্লীল কথাবার্তায় ও ঝগড়া বিবাদে যেন লিপ্ত না হয়। কেউ গালমন্দ বা ঝগড়া বিবাদ করলে শুধু বলবে, আমি রোযাদার। সেই মহান সত্তার কসম যার করতলগত মুহাম্মদের জীবন, আল্লাহর নিকট রোযাদারের মুখের গন্ধ কস্তুরীর সুঘ্রাণ হতেও উত্তম। রোযাদারের খুশির বিষয় দুইটি। যখন সে ইফতার করে তখন একবার খুশির কারণ হয় আর একবার যখন সে তার রবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রোযার বিনিময় লাভ করবে তখন খুশির কারণ হবে। (বুখারী)

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, মাহে রামাদান মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এক নযিরবিহীন নিআমত। নিজের আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষুধা-তৃষ্ণার কষ্ট সহ্যের শক্তি সঞ্চারের এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো সিয়াম। আত্মিক ও চারিত্রিক উপকারিতা ছাড়াও সুস্বাস্থ্য ও সুখী জীবনের জন্য রোযার গুরুত্ব অপরিসীম। বিজ্ঞানের এ যুগে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরাও রোযার সীমাহীন উপকারিতার বিষয়ে উপলব্ধি করে এ বিষয়ক নির্দেশনা রোগীদের প্রদান করছেন। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশের নাগরিক। রামাদান মাস আসলেই যেন আমরা অনিয়মে লিপ্ত হওয়া জরুরি মনে করি। যেখানে রামাদানে অপরকে ইফতার করানো, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজে বোঝা হালকা করার কথা ছিল। বিপরীতে আমরা নিত্যপণ্যের দাম বাড়িয়ে দেই, পণ্য মজুদ করি। আমরা অনেকেই সিয়াম পালন করি না। আবার কেউ কেউ সিয়াম পালন করলেও সালাত আদায় করি না। হোটেল রেস্তোরাঁ বন্ধ রাখি না। আবার অনেকে নামদারী মুসলমান হয়েও দিনের বেলা প্রকাশ্যে পানাহার করি। আল্লাহ আমাদেরকে মাহে রামাদানের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য উপলব্ধি করে এ অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দিন। আমীন।

দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্ট ও

আল্লামা ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী

মোহাম্মদ খায়রুল হুদা খান

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানব জাতির হিদায়াতের জন্য শাশ্বত বাণী কুরআন কারীম প্রেরণ করেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত এর হিফাযতের যিম্মাদারি নিজেই গ্রহণ করেছেন। কুরআন কারীমের এই হিফাযত বা সংরক্ষণের অন্যতম একটি দিক হচ্ছে এর সঠিক তিলাওয়াতেরও সংরক্ষণ। যুগ যুগ ধরে বিশ্বব্যপী কুরআন শিক্ষাদানে মুসলিম বিশ্বের মহামনীষীগণ জীবনভর খিদমত ও কার্যক্রম চালিয়ে গেছেন। তবে তাঁদের এই খিদমতগুলো বেশিরভাগই ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং সীমিত। এক্ষেত্রে বর্তমান সময়ে বাংলাদেশ তথা ভারতীয় উপমহাদেশে কুরআন কারীমের সঠিক তিলাওয়াত সংরক্ষণের শ্রেষ্ঠতম দিকপাল হলেন শতাব্দীর মুজাদ্দিদ, রঈসুল কুররা ওয়াল মুফাসসিরীন, শামসুল উলামা হযরত আল্লামা আবদুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)। তাঁর প্রতিষ্ঠিত দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্ট একটি ব্যতিক্রমী কিরাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেটি বিগত প্রায় আট দশক ধরে কিরাত শিক্ষাদানের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ ধারণ করে বাংলাদেশের গণ্ডি পেরিয়ে বহির্বিশ্বেও তার খিদমাত বিস্তারে সক্ষম হয়েছে।

শামসুল উলামা হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) স্বীয় পীর ও মুরশিদ হযরত শাহ ইয়াকুব বদরপুরী (র.)-এর কাছ থেকে সর্বপ্রথম ইলমে কিরাতের সনদ লাভ করেন। পরবর্তীতে পীর ও মুরশিদের নির্দেশে হযরত শাহ আবদুর রউফ করমপুরী (র.)-এর কাছে কুরআন অধ্যয়ন করে সনদ লাভ করেন, যিনি ২৯ বছর মক্কা শরীফে অবস্থান করেছেন এবং সেখানকার প্রখ্যাত কারীদের কাছে কুরআন শিক্ষা লাভের সুযোগ পেয়েছেন। তাঁদের দুজনেরই সনদ শায়খুল ইসলাম যাকারিয়া আল আনসারী (র.) হয়ে ইমাম আবূ আমরিদ্দানী (র.) পর্যন্ত পৌঁছেছে।

কুরআন কারীমের এ আশিক ১৯৪৪ খ্রি. (১৩৬৩ হিজরী) সনে হজ্জ করতে মক্কা শরীফে গেলে হারামাইন শরীফাইনের কারী ও ফকীহগণের প্রধান (শাইখুল কুররা ও রাঈসুল ফুকাহা) শায়খ আহমদ হিজাযী (র.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং ইলমে কিরাতে তাঁর পারদর্শিতা ও খ্যাতির কথা শুনে তাঁর কাছে কুরআন মাজীদ শিক্ষা করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু ছাহেব কিবলাহ (র.) হিন্দ (ভারত) থেকে এসেছেন জানতে পেরে তিনি কিরাত শুনতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। কারণ তৎকালীন সময়ে এতদঞ্চলে বিশুদ্ধ তিলাওয়াত ছিল না বললেই চলে। এমনকি কোনো কোনো এলাকায় কুরআন কারীমের হরফ পর্যন্ত পরিবর্তন করে পড়া হতো। যাই হোক হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) এর অতি আগ্রহ এবং পিড়াপিড়িতে তিনি রাজী হন এবং তাঁর তিলাওয়াত শুনে বিমোহিত হন। দুই সফরে হযরত ছাহেব কিবলাহ (র.) শায়খ আহমদ হিজাযী (র.)-এর কাছে সম্পূর্ণ কুরআন কারীম পাঠ করে শুনান। শায়খ আহমদ হিজাযী (র.) হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)-কে কিরাতের সনদ দান করেন। সনদ প্রদানকালে শায়খ আহমদ হিজাযী (র.) ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, "এ সনদ একটি আমানত, যে আমানত আমার ইলমে কিরাতের উস্তাদ ও বুযুর্গগণ আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। আজ আমি তা তোমার হাতে সোপর্দ করলাম। যদি এ আমানতের হ্রাস-বৃদ্ধিজনিত খেয়ানত করো, তবে এর পরিণাম তুমিই ভোগ করবে। কারণ আজমে (অনারব দেশে) এখন হরফের উচ্চারণ ও পঠন পদ্ধতি বিষয়ে নানারকম মতভেদ দেখা দিয়েছে।"

হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) শায়খ আহমদ হিজাযী (র.) থেকে সনদ লাভ করে দেশে ফেরার পর তৎকালীন আসামের প্রথিতযশা বুযুর্গ শায়খ আবদুন নূর গড়কাপনী (র.) স্বপ্নযোগে রাসূলে পাক ﷺ এর কাছ থেকে ইশারা পেয়ে আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) কে ইলমে কিরাত শিক্ষা দিতে উদ্বুদ্ধ করেন। স্বপ্নযোগে রাসূল ﷺ এর ইশারা পাওয়ার ঘটনাটি এরকম যে, হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) ভারতের উত্তর প্রদেশের ঐতিহ্যবাহী রামপুর আলিয়া মাদরাসা থেকে হাদীস, তাফসীর ও ফিকহ বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করে বর্তমান ভারতের আসাম রাজ্যের করিমগঞ্জ জেলার বদরপুর আলিয়া মাদরাসায় অধ্যাপনায় নিয়োজিত হন। এ সময় স্বীয় পীর ও মুরশিদ হযরত আবূ ইউসুফ শাহ মুহাম্মদ ইয়াকুব বদরপুরী (র.)-এর নির্দেশে মক্কা শরীফ গমন করে হযরত আহমদ হিজাযী মক্কী (র.)-এর নিকট থেকে ইলমে কিরাতের সনদ লাভ করেন। সেখানে থেকে ফিরে তিনি পুনরায় বদরপুর আলিয়া মাদরাসায় অধ্যাপনা শুরু করেন। একদিন হযরত ছাহেব কিবলাহ (র.) ক্লাসে ছাত্রদের দারস দেওয়ার সময় সেখানে হযরত আবদুন নুর গড়কাপনী (র.) তাশরীফ নিলেন। সমকালীন খ্যাতনামা আলিম ও বুযুর্গ ছিলেন তিনি। ছাহেব কিবলাহ (র.) তাঁকে সমাদরে পাশে বসতে অনুরোধ করে পাঠদানে ব্যস্ত হলেন। ক্লাসের সময় শেষ হলে ছাহেব কিবলাহ (র.) তার কুশলাদি ও আসার কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, সর্বসাধারণ তো দূরের কথা এতদঞ্চলের অনেক আলিমেরও কিরাত বিশুদ্ধ নয়। তাই ছাহেব কিবলাহ (র.) দারসে কিরাতের জন্য অন্তত সপ্তাহে এক ঘন্টা সময় যেন আমাদের দেন। ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) জবাবে বললেন, আমার হাতে সময় একেবারে কম, বিশেষ করে ক্লাসে ছাত্রদের পাঠদানের আগে নিজে ভালোভাবে তা দেখে নিতে হয়, তাই সময় দেয়া মোটেই সম্ভব নয়। এ কথার পর আবদুন নুর গড়কাপনী (র.) চলে গেলেন। পরদিন ঠিক একইভাবে উপস্থিত হয়ে একই কথার পুনরাবৃত্তি করলে ছাহেব কিবলাহ (র.) আবারও অপারগতা প্রকাশ করলেন। তখন হযরত আবদুন নুর (র.) বললেন, আমি নিজ থেকে আপনার নিকট আসিনি। বড় জায়গা থেকে নির্দেশ পেয়েই তবে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) তখন স্বীয় মুরশিদ হযরত বদরপুরী (র.)-এর নির্দেশ কিনা জানতে চাইলে হযরত আবদুন নুর (র.) বললেন, না আরও বড় জায়গা থেকে নির্দেশ পেয়েছি। ছাহেব কিবলাহর অনুরোধে তিনি বর্ণনা করলেন, 'আমি স্বপ্নে হুযুর (সা.)-এর দিদার লাভ করি। আমি হুযুর (সা.)-এর কণ্ঠে সুললিত তিলাওয়াতে কালামে পাক শুনতে পাই। আরয করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ ﷺ! এই কিরাত কিভাবে শিখব? তখন নবী পাক ﷺ ডান দিকে যাকে দেখিয়ে ইশারা করলেন, চেয়ে দেখি সেই সৌভাগ্যবান আপনি।' একথা শুনার সাথে সাথে হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) কেঁদে ফেললেন এবং তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন, ঠিক আছে আমি সপ্তাহের প্রতি বৃহস্পতিবার ১২টার পরে নিকটবর্তী হযরত আদম খাকী (র.) (তিনশত ষাট আউলিয়ার অন্যতম)-এর মাজার সংলগ্ন

মসজিদে কিরাতের দারস দেওয়ার ওয়াদা দিলাম। এভাবেই ১৯৪৬ খ্রি. সালে ছাহেব কিবলাহ (র.)-এর ইলমে কিরাতের খিদমতের সূত্রপাত। এভাবেই ১৯৪৬ সালে ভারতের আসামে হযরত আদম খাকী (র.) (হযরত শাহজালাল (র.) এর অন্যতম সঙ্গী) এর মাযার সংলগ্ন মসজিদে প্রতি বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা থেকে কিরাতের দারস দেওয়ার মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী এই দারুল কিরাতের খিদমত আরম্ভ হয়। সমকালীন উলামা-মুদাররিসীন ও শিক্ষার্থীবৃন্দ তার নিকট কিরাত শিক্ষার জন্য জমা হতে থাকেন। এ সময় পায়ে হেঁটে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে, কখনো নৌকা না পেলে সাঁতার কেটে হলেও নদী পেরিয়ে তিনি সেই মসজিদে গিয়ে কিরাত শিক্ষা দিতেন। এরপর থেকে হযরত ছাহেব কিবলাহ (র.) বিভিন্ন অঞ্চলে পায়ে হেঁটে, ঘোড়ায় চড়ে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে অবৈতনিকভাবে ইলমে কিরাতের দারস দিয়েছেন। স্বীয় উস্তাদ শায়খ আহমদ হিজাযী (র.) এর ওসীয়াত অনুযায়ী কুরআন শিক্ষা দানের সে আমানত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) যথাযথভাবে রক্ষা করেছেন এবং বিশুদ্ধ কিরাত শিক্ষাদানের দায়িত্ব আনজাম দিয়ে গেছেন জীবনভর। যার ফলশ্রুতিতে আজ দুনিয়াব্যাপী তাঁর ইলমে কিরাতের খিদমত একটি মকবুল খিদমত হিসেবে সুপরিচিত।

১৯৪৬ খ্রি. সন থেকে দীর্ঘ চার বছর ধরে বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন স্থানে কিরাত শিক্ষা দান করেন হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)। ১৯৫০ খ্রি. সনে তিনি নিজ বাড়িতে কিরাতের দারস প্রথম চালু করেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-শিক্ষক, আলিম-উলামা তথা সর্বসাধারণের সুবিধার্থে ছুটির অবসরকালীন রামাদান মাসকে কিরাত শিক্ষার জন্য বেছে নেওয়া হয়। উপরন্তু কুরআন নাযিলের মাস রামাদানে কুরআনে কারীমের সাথে বিশেষ এই সম্পর্ক শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মনে আলাদা একটি আধ্যাত্মিক প্রভাব ফেলে। প্রতি বছর রামাদানে ছাহেব কিবলাহ (র.) নিজ বাড়িতে শিক্ষার্থীদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা নিজ খরচে করতেন। পঞ্চাশ হতে একশত এভাবে দিন দিন শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সকলকে তা'লীম দিয়ে এবং সমগ্র কুরআন মাজীদ নিজে শুনে প্রয়োজনীয় সংশোধনী করে তবেই তিনি সনদ প্রদান করতেন এবং সনদপ্রাপ্ত কারী ছাহেবদেরকে কিরাত শিক্ষাদানে উদ্বুদ্ধ করতেন। পরবর্তীতে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকায় অন্যান্য স্থানে শাখা কেন্দ্র অনুমোদন ও একটি বোর্ড গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়ায় দারুল কিরাতের জন্য ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়। হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) এর ওয়ালিদ মুহতারাম হযরত মুফতী মাওলানা আবদুল মজিদ চৌধুরী (র.) এর নামানুসারে এই প্রতিষ্ঠানের নাম রাখা হয় 'দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্ট'।

দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ডের অধীনে কেন্দ্রীয় বোর্ড অফিস ফুলতলী ছাহেব বাড়ি থেকেই বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্বে দারুল কিরাতের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) এর কাছ থেকে প্রথম পর্যায়ে কিরাতের সনদ গ্রহণ করে ছাহেব কিবলাহর সহযোগী হিসেবে কিরাত শিক্ষাদান ও বোর্ড পরিচালনায় যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন হযরত মাওলানা শাতির আলী গর্দীশপুরী (র.), মরহুম দেওয়ান আবদুল বাছির (র.), হযরত মাওলানা কারী আবদুল লতিফ খাদিমানী (র.), সাবেক প্রধান বিচারপতি সৈয়দ এবিএম মাহমুদ হোসেন (র.) প্রমুখ। ছাহেব কিবলাহ (র.) শুরুর দিকেই তাঁর ভূ-সম্পত্তির বিশাল অংশ (প্রায় ৩৩ একর) এ ট্রাস্টের নামে ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন।

হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) এর সুযোগ্য উত্তরসূরি ও বড় ছাহেবজাদা হযরত আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী বড় ছাহেব কিবলাহ ফুলতলীর সরাসরি তত্ত্বাবধানে শাখা অনুমোদন, নবায়ন, শিক্ষক নিয়োগ, প্রশ্নপত্র সরবরাহ, পরীক্ষা গ্রহণ, হিসাব নিরীক্ষণ ইত্যাদি সকল কার্যক্রম বোর্ড থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। শায়খ আহমদ হিজাযী (র.) এর আরবী ভাষায় লিখিত তাজবীদের কিতাব এবং অন্যান্য তাজবীদের নিয়মাবলী সম্বলিত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) রচিত 'আল কাউলুছ ছাদীদ' এবং বড় ছাহেবজাদা হযরত আল্লামা ইমাদ উদ্দীন চৌধুরী ফুলতলী রচিত 'প্রাথমিক তাজবীদ শিক্ষা' কিতাব দুটি বোর্ড অনুমোদিত ইলমে তাজবীদের পাঠ্য হিসেবে দারুল কিরাতে পড়ানো হয়। বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন ভাষার শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন পূরণার্থে ইতিমধ্যে বইগুলো বাংলা, উর্দু ও ইংরেজিতে ভাষান্তর করা হয়েছে। এ বোর্ডের অধীনে সর্বমোট ৬টি ক্লাস এর মাধ্যমে সমস্ত কুরআন শরীফ সহীহ শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিটি ক্লাসের সমাপনান্তে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীকে কিরাতের সনদ দেওয়া হয়।

অতি দ্রুততার সাথে সফলতার পথে এগিয়ে চলেছে দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্ট। দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্টের অধীনে বর্তমানে কেবল বাংলাদেশেই দুই হাজার ছয়শত এর উপরে শাখা কেন্দ্র ছড়িয়ে রয়েছে। তাছাড়া ভারত, ইউকেসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, আমেরিকা, সাউথ আফ্রিকাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কয়েক শত শাখা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেগুলোতে বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত ছাড়াও বিভিন্ন জাতি ও ভাষার মুসলিম শিক্ষার্থীগণ বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা গ্রহণ করে সনদপ্রাপ্ত হয়ে ইলমে কিরাতের দীপ্তি ছড়িয়ে দিচ্ছে বিশ্বব্যাপী।

বিশ্বনবী ﷺ কর্তৃক স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে কুরআনে কারীমের এই খিদমতে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)। কেবল শিক্ষাদানের মাধ্যমেই নয়; বরং শিক্ষার্থীদের জন্য রান্না-বান্না করা, নিজ তহবিল থেকে তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা, ব্যক্তিগতভাবে তাদের খোঁজ-খবর নেওয়ার মাধ্যমে কুরআনের নূরে নূরান্বিত একটি কাফেলা প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি। সারাজীবন অবৈতনিকভাবে কিরাতের খিদমত আনজাম দিয়েছেন ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী (র.)। তাঁর নিকট থেকে সনদপ্রাপ্ত তাঁর সাত জন ছাহেবজাদা এবং নাতিগণও অবৈতনিকভাবে এ খিদমত আনজাম দিয়ে যাচ্ছেন।

দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্ট একটি সম্ভাবনাময়ী প্রতিষ্ঠান, যা বাংলাদেশ সহ বহির্বিশ্বে হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) এর হাজার হাজার শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে বিশুদ্ধ কুরআনে কারীমের বাণী পৌঁছে দিচ্ছে মুসলমানদের ঘরে ঘরে। হাজারো মসজিদের ইমাম-মুআযযিন, হাজারো মাদরাসার উস্তাদ-মুহাদ্দিসীন মিম্বার-মিহরাব- খানকাগুলোকে কুরআনের বিশুদ্ধ তিলাওয়াতে মোহিত করে তুলছেন প্রতিনিয়তঃ হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ প্রতিষ্ঠিত এই দারুল কিরাতের কারণে। যে তিলাওয়াত বিশুদ্ধ না হলে নামায শুদ্ধ হয় না, যে তিলাওয়াত বিশুদ্ধ না হলে অন্তর বিশুদ্ধ হয় না, সেই তিলাওয়াতের সঠিক শিক্ষাদান ছাহেব কিবলাহ (র.) প্রদত্ত আমানতের সংরক্ষণ ও যথাযথ বিকাশ সাধনে দারুল কিরাতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান যদি আন্তরিকতা, সতর্কতা ও নিষ্ঠার সাথে এগিয়ে আসেন, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্ট পৌঁছে যাবে তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে- মুসলিম বিশ্বের ঘরে ঘরে।

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের ফযীলত

মাওলানা বদরুজ্জামান রিয়াদ

পবিত্র কুরআন প্রিয় নবী ﷺ এর জীবন্ত মুজিযা। পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের ইন্তিকালের সাথে সাথে তাদের মুজিযা স্থগিত হয়ে গেছে, কিন্তু কুরআনের মুজিযা আজও বিদ্যমান। এ কিতাবের বিশুদ্ধ তিলাওয়াত সর্বশ্রেষ্ঠ আমলই শুধু নয়; বরং দুনিয়া ও আখিরাতের অগণিত কল্যাণের বাহক। আজ আমরা শুধু এ ঐশী গ্রন্থ তিলাওয়াতের বিশেষ কিছু ফযীলত নিয়ে আলোচনা করবো। ইনশাআল্লাহ।

নবী প্রেরণের প্রথম দায়িত্ব তিলাওয়াতে কুরআন

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা নবী করীম ﷺ কে যে ৪টি মৌলিক দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন তার প্রথমটি হলো উম্মাহর কাছে কুরআন তিলাওয়াত করা। ইরশাদ হচ্ছে,

لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

-আল্লাহ ঈমানদারদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে নবী প্রেরণ করেছেন। তিনি তাদের জন্য তাঁর (আল্লাহর) আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন। তাদের অন্তর পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দেন। বস্তুত তারা ছিল পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১৬৪)

কুরআন তিলাওয়াতকারী উভয় জাহানের সর্বোত্তম মানুষ

উসমান ইবনে আফফান (রা.) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

-তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে, যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে ও অপরকে শিক্ষা দেয়। (বুখারী, কিতাবু ফাদাইলিল কুরআন, বাবু খাইরুকুম মান...)

হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الأُتْرُجَّةِ؛ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ, وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ؛ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ, وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ؛ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ, وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ

-কুরআন তিলাওয়াতকারী মুমিনের উদাহরণ হলো কমলালেবুর মতো। এর স্বাদও উৎকৃষ্ট আর ঘ্রাণও উৎকৃষ্ট। আর যে মুমিন কুরআন তিলাওয়াত করে না তার উদাহরণ খেজুরের মতো। এটি খেতে সুস্বাদু, তবে তার কোনো সুঘ্রাণ নেই। কুরআন তিলাওয়াতকারী মুনাফিক ব্যক্তি সুগন্ধি ফুলের মতো। এর সুগন্ধ আছে তবে স্বাদ তিক্ত। আর যে মুনাফিক আবার কুরআন তিলাওয়াতও করে না সে মাকাল ফলের মতো। এর স্বাদও তিক্ত আর কোনো সুঘ্রাণও নেই। (বুখারী, কিতাবুল আতইমাহ, বাবু যিকরিত তাআম)

ঈমান বৃদ্ধির অব্যর্থ আমল কুরআন তিলাওয়াত

যদিও মূল ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি নেই। তবে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত ও তা শ্রবণের মাধ্যমে ঈমানের শক্তি বৃদ্ধি পায়। এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

-নিশ্চয় মুমিনগণ এমন যে, যখন আল্লাহর নাম নেওয়া হয় তখন ভীত হয়ে পড়ে তাদের অন্তর। আর যখন তাদের সামনে কুরআনের আয়াত পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা স্বীয় রবের প্রতি ভরসা পোষণ করে। (সূরা আনফাল, আয়াত-২)

সূরা যুমারের অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ ذَٰلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ

-আল্লাহর উত্তম বাণী (তথা কুরআন) নাযিল করেছেন, যা সামঞ্জস্যপূর্ণ, পুনরায় পঠিত। এতে তাদের পশম কাঁটা দিয়ে উঠে চামড়ার উপর, যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় পায়। এরপর তাদের চামড়া ও অন্তর আল্লাহর স্মরণে বিনম্র হয়। এটাই আল্লাহর পথ নির্দেশ, এর মাধ্যমে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথপ্রদর্শন করেন আর যাকে ইচ্ছা গোমরাহ করেন। তাঁর কোনো পথনির্দেশক নেই। (সূরা যুমার, আয়াত-২৩)

তিলাওয়াতকারীদের জন্য কুরআনের শাফাআত

কুরআনুল কারীমের তিলাওয়াত ও তা অনুযায়ী আমল করতে পারলে কিয়ামতের কঠিন দিনে তা তিলাওয়াতকারীর জন্য জান্নাতের সুপারিশকারী হবে। আবূ উমামাহ (রা.) থেকে বর্ণিত নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন,

اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِصَاحِبِهِ

-তোমরা কুরআন তিলাওয়াত করো। কারণ, কিয়ামতের দিন সে তার তিলাওয়াতকারীর জন্য (জান্নাতের) সুপারিশ করবে। (মুসলিম, বাবু ফাদাইলিল কুরআন...)

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত অন্য হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন,

الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَقُولُ الصِّيَامُ: أَيْ رَبِّ إِنِّي مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ فيشفعان

-কিয়ামত দিবসে সিয়াম ও কুরআন বান্দাহর জন্য সুপারিশ করবে। সিয়াম বলবে, হে রব! আমি তাকে দিনের বেলা খাবার ও জৈবিক চাহিদা থেকে বাধা প্রদান করেছি। আমাকে তার জন্য শাফাআতকারী হিসেবে কবূল করুন। অপরদিকে কুরআন বলবে, হে রব! আমি তাকে রাতের বেলা ঘুম থেকে বাধা প্রদান করেছি আমাকে তার জন্য (জান্নাতী হবার) শাফাআতকারী হিসেবে কবূল করেন। অতঃপর তাদের উভয়ের শাফাআত কবূল করা হবে। (মুস্তাদরাকে হাকেম: ২০৩৬)

অন্য বর্ণনাতে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَنْ تَلَا آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

-যে ব্যক্তি কুরআন মাজীদের একটি আয়াত তিলাওয়াত করবে, তা তার জন্য কিয়ামত দিবসে আলো হয়ে দাঁড়াবে। (শুআবুল ঈমান, বাবু ফি তাযিমিল কুরআন)

লাভজনক ব্যবসা

ব্যবসায় লাভ-ক্ষতি উভয়েরই সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু কুরআন তিলাওয়াতে লাভ ছাড়া ক্ষতির কোনো অংশ নেই। এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

-যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, নামায কায়িম করে, এবং আমি যা দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসা আশা করে, যাতে কখনও লোকসান হয় না। (সূরা ফাতির, আয়াত-২৯)

প্রত্যেক অক্ষরের বিনিময় দশগুণ সাওয়াব অর্জন

কুরআনুল কারীমের তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে উচ্চারিত প্রতিটি অক্ষরের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা দশগুণ সাওয়াব প্রদান করবেন। নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন,

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ

-যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব তথা কুরআনের একটি হরফ পাঠ করে, তাকে একটি নেকী প্রদান করা হয়। প্রতিটি নেকী দশটি নেকীর সমান। আমি বলি না যে, 'আলিফ-লাম-মীম' একটি হরফ; বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ, মীম একটি হরফ। (সুনানে তিরমিযী, কিতাবু ফাদাইলিল কুরআন, বাবু মা জাআ ফি ফাদলি কারীইল কুরআন)

কুরআনের বিশ্বাসীদের প্রমাণ তার যথার্থ তিলাওয়াত

যারা কুরআন কারীমে বিশ্বাস করেন, তারা তার সঠিকভাবে তিলাওয়াত করেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

الَّذِيْنَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُوْنَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولٰئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهِ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ

-যাদেরকে আমি কিতাব দান করেছি, তারা তা যথার্থভাবে তিলাওয়াত করে। তারা তাতে বিশ্বাস করে। আর যারা তা অস্বীকার করবে তারাই হলো ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা বাকারা, আয়াত-১২১)

তিলাওয়াতকারির উপর আল্লাহর পক্ষ হতে প্রশান্তি বিতরণ

যারা কুরআন কারীমে বিশ্বাস করেন, তারা তার সঠিকভাবে তিলাওয়াত করেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ تَعَالَى يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ

-আল্লাহ তাআলার ঘরসমূহের কোনো ঘরে যদি কোনো একদল মানুষ কুরআন তিলাওয়াত করে এবং নিজেদের মধ্যে তার শিক্ষা গ্রহণ করে তবে তাদের উপর (আল্লাহর পক্ষ থেকে) প্রশান্তি নাযিল হয়, তাদেরকে আল্লাহর দয়া-অনুগ্রহ আবিষ্ট করে রাখে, ফিরিশতাগণ তাদেরকে ঘিরে রাখে এবং আল্লাহ তাআলা তাঁর নৈকট্যশীলদের কাছে এসকল মানুষের কথা উল্লেখ করেন। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যিকরি ওয়াদ দুআ..., বাবু ফাদলিল ইজতিমা আলা তিলাওয়াতিল কুরআন...)

জান্নাতের সর্বোচ্চ মাকাম অর্জন

সাহাবী হযরত আমর ইবনে আস (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন,

يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ: اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تقرؤها

-কিয়ামতের দিনে কুরআন তিলাওয়াতকারীকে বলা হবে, কুরআন তিলাওয়াত করতে করতে উপরে উঠতে থাকো। দুনিয়াতে যেভাবে ধীরে ধীরে (তাজবীদ সহকারে) তিলাওয়াত করতে, তেমন করতে থাকো। কেননা, তোমার তিলাওয়াতের শেষ আয়াতেই (জান্নাতে) তোমার বাসস্থান হবে। (আবূ দাউদ, কিতাবুস সালাত, বাবু ইসতিহবাবিত তারতীলি ফিল কিরাআতি)

হযরত আবু উমামা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'কুরআন কারীম মুখস্থ করো। নিশ্চয় যার হৃদয়ে কুরআন কারীম আছে, তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না।' (শারহুস সুন্নাহ লিল বাগাভীঃ ৪/৪৩৭)

ঈর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব

পৃথিবীতে কোনো ব্যক্তিকে হিংসা করা জায়িয নেই; কিন্তু দু'ব্যক্তিকে হিংসা বা ঈর্ষা করা যায়। তার মধ্যে একজন যে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারে ও সে অনুযায়ী আমল করতে পারে। ইবনে উমর (রা.) বলেন, আমি নবী করীম ﷺ কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

لَا حَسَدَ إِلَّا على اثْنَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ

-দুই ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো ব্যাপারে হিংসা করা যায় না। প্রথম ব্যক্তি- যাকে আল্লাহ তাআলা কুরআনের জ্ঞান দিয়েছেন আর সে রাত ও দিনভর তা নিয়ে থাকে। দ্বিতীয় ব্যক্তি- যাকে আল্লাহ তাআলা সম্পদ দিয়েছেন সাথে সাথে তা আল্লাহর পথে ব্যয় করার তাওফীক দিয়েছেন। (বুখারী, কিতাবুল ইলম, বাবুল ইগতিবাতি ফিল ইলমি ওয়াল হিকমাতি)

উত্তম সম্পদ অর্জন

কুরআন তিলাওয়াত বা শিক্ষা দেওয়ার কাজে নিয়োজিত থাকা উত্তম সম্পদ অর্জন করার অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

أَفَلَا يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمُ أَوْ يَقْرَأُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ الله عز وَجل خير لَهُ من نَاقَة أَو نَاقَتَيْنِ وَثَلَاثٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ

-তোমাদের কেউ কেন সকালে মসজিদে গিয়ে আল্লাহর কুরআন হতে দুটি আয়াত পড়ে না বা শিক্ষা দেয় না? তাহলে সেটি তার জন্য দুটি উট লাভ করার থেকেও উত্তম হবে। তিনটি আয়াতের তিলাওয়াত ও শিক্ষা তিনটি উট অপেক্ষা উত্তম। চারটি আয়াত চারটি উট অপেক্ষা উত্তম। অনুরূপ আয়াতের সংখ্যা অনুপাতে উটের সংখ্যা অপেক্ষা তা উত্তম বিবেচিত হবে। (সহীহ মুসলিম, বাবু ফাদাইলিল কুরআনি ওয়ামা ইয়াতাআল্লাকু বিহি)

পিতা-মাতার জান্নাতি নূরের টুপি লাভ

কুরআন তিলাওয়াতকারী শুধু নিজেই উপকৃত হবেন না; বরং তার ওসীলায় তার পিতা-মাতা অসামান্য মর্যাদায় ভূষিত হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ أُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْؤُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي بُيُوتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيكُمْ فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِى عَمِلَ بِهَذَا.

-যে কুরআন তিলাওয়াত করে এবং তা অনুযায়ী আমল করে কিআমত দিবসে তার পিতা-মাতাকে নূরের টুপি পরিধান করানো হবে। এই টুপির আলো সূর্যের আলো অপেক্ষা উজ্জ্বল হবে। ধরে নাও যদি সূর্য তোমাদের ঘরে বিদ্যমান থাকে (তাহলে তার আলো কীরূপ হবে?) তাহলে যে ব্যক্তি কুরআন অনুযায়ী আমল করে তার ব্যাপারটি কেমন হবে, তোমরা ধারণা করে নাও। (আবূ দাউদ, কিতাবুস সালাত, বাবু ফি সাওয়াবি কিরাআতিল কুরআন)

প্রিয় পাঠক! কুরআন নাযিলের মাস রমাদ্বান সমাগত। কুরআনের এ মাসে আমরা যেন এর যথার্থ তিলাওয়াত করতে পারি। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সে তাওফীক দিন। আর যারা কুরআন তিলাওয়াত করতে সক্ষম নন, অন্তত, এ মাসে তাদের জন্য হোক কুরআন শেখার মাস। এটাই হোক আমাদের শপথ। আমীন।

সালফে সালেহীনের রামাদান

মুহাম্মদ মাহমুদুল হাসান

রামাদান হলো সিয়াম সাধনার মাস, ইবাদতের মাস। বলা যায় এটি ইবাদতের বসন্তকাল। কেননা এ মাসের ইবাদত অন্যান্য মাসের ইবাদত থেকে অত্যন্ত মূল্যবান। হাদীস শরীফে এসেছে, এ মাসের একটি নফল ইবাদতের মর্যাদা অন্য মাসের ফরয ইবাদতের সমান। আর এ মাসের একটি ফরয ইবাদত অন্য মাসের ৭০টি ফরয ইবাদতের সমান। (শুআবুল ঈমান; বায়হাকী, ৩/৩০৫)। এ মাসের একটি উমরা হজ্জের সমতুল্য। (তিরমিযী,হা/৯৩৯)

একজন প্রকৃত মুমিনের সারা বছরই ইবাদতের মৌসুম। প্রতিটি মুহূর্তই নেকী অর্জনের সময়। আর আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ মর্যাদাবান রাত-দিন এবং মাসসমূহে একজন নেককার ব্যক্তির আমল বহুগুণ বেড়ে যায়, তার মন আল্লাহমুখী হয়। রামাদান মাসে আল্লাহর নেক বান্দাহগণ মহান মালিক ও মাওলাকে খুশি করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকেন। এ মাসের প্রতিটি মুহূর্তকে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইবাদতের মাধ্যমে অতিবাহিত করার চেষ্টা করেন। কোনো কোনো সালাফ থেকে বর্ণিত আছে, তারা ৬ মাস আল্লাহর কাছে দুআ করতেন যেন আল্লাহ তাদেরকে রামাদান মাস পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেন। রামাদানের পরবর্তী ৫ মাস দুআ করতেন আল্লাহ যেন তাদের রামাদানের আমলকে কবুল করে নেন।

সাহাবায়ে কিরাম থেকে শুরু করে সালফে সালেহীন আইম্মায়ে কিরাম রামাদান মাসে ইবাদতের জন্য রজব মাস থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। হযরত আবূ বাকর আল বলখী র. বলেন, রজব হলো বীজ বপনের মাস, শাবান হলো সেচ প্রদানের মাস আর রামাদান হলো ফসল তোলার মাস। (লাতাইফুল মাআরিফ; ইবনু রজব হাম্বলী) কাজেই যে ব্যক্তি রজব মাসে বীজ বপন করলো না , শাবান মাসে পানি সেচ করলো না সে কিভাবে রামাদান মাসে ফসল তোলার আকাঙ্ক্ষা রাখতে পারে? এই চাহিদার দিক থেকে আমাদের পূর্বসূরিরা রামাদানের অনেক আগে থেকেই নিজেকে পুরোপুরি প্রস্তুত করে নিতেন। এই দুই মাসের প্রস্তুতি নিয়ে সালফে সালেহীন পুরো রামাদান মাস আল্লাহর ইবাদতে কাটাতেন। দিনের বেলা রোযা রাখার পাশাপাশি নামায, দান-সাদকা, কুরআন তিলাওয়াতে নিমগ্ন থাকতেন।

সালফে সালেহীনসহ আমাদের পূর্বসূরি সকলেই পবিত্র রামাদান মাসকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতেন। এ মাসের প্রতিটি মুহূর্তকে আল্লাহর ইবাদতে কাটিয়ে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা করতেন। নেক কাজে একজন আরেকজনের সাথে প্রতিযোগিতা করতেন। তাদের সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তারা রামাদানের আগের ছয় মাস থেকে আল্লাহর কাছে দুআ করতেন, যেন তারা রামাদান মাস লাভ করেন এবং তাতে ইবাদত করতে পারেন। রামাদানের পরবর্তী মাসগুলোতে তারা দুআ করতেন, যেন আল্লাহ তাআলা তাদের রামাদানকে কবূল করে নেন।

রামাদানে কুরআন তিলাওয়াত

রামাদান মাস এবং কুরআন কারীম একটি যেন আরেকটির সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। আল্লাহ তাআলা রামাদান মাসে কুরআন নাযিল করায় এ মাসের সাথে কুরআন তিলাওয়াতের নিবিড় সম্পর্ক হয়ে গেছে। প্রিয়নবী ﷺ নিজেও অন্য মাস থেকে এ মাসে বেশি কুরআন তিলাওয়াত করতেন। হাদীস শরীফে এসেছে, হযরত জিবরীলে আমীন রামাদানের শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক রাতে রাসূল ﷺ এর সাথে সাক্ষাত করতেন। রাসূল ﷺ তাকে কুরআন কারীম শুনাতেন। (সহীহ বুখারী, হা/১৯০২) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. রামাদান শরীফে তিন দিনে এক খতম কুরআন তিলাওয়াত করতেন। রামাদান ছাড়া অন্য সময়ে সপ্তাহে এত খতম তিলাওয়াত করতেন। (আস সুনানুল কুবরা; বায়হাকী, ২/৫৫৫)

ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, সালফে সালিহীন থেকে শুরু করে সকল যুগের নেককার ব্যক্তিগণ রামাদান মাসে কুরআন কারীমকে সব থেকে বেশি গুরুত্ব দিতেন। রামাদানের পুরো মাসকে যেন তারা কুরআন দিয়ে সাজিয়ে রাখতেন। কুরআন তিলাওয়াত করা, বেশি বেশি খতম করা, কুরআন শিক্ষা দেওয়া এমনকি নফল নামায আদায় করলেও তাতে দীর্ঘ সময় নিয়ে কিরাআত পড়তেন। কুরআন নাযিলের এ মাসে তারা অন্যান্য সকল নফল ইবাদত বন্ধ করে কুরআন নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। ইমাম মালিক (র.) সারা বছর মসজিদে নববীতে ইলমে হাদীস ও ইলমে ফিকহের দারস-তাদরীস নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। কিন্তু রামাদান মাস আগমনের সাথে সাথে তিনি সকল দারস-তাদরীস বন্ধ করে দিতেন। যেন তিনি এগুলো থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। পুরো রামাদান মাস তিনি কুরআন তিলাওয়াত নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। (লাতাইফুল মাআরিফ; ইবনু রজব হাম্বলী, পৃ. ১৭১) ইমাম সুফিয়ান সাওরী (র.) রামাদান মাসে শুধু দারস-তাদরীস নয় বরং অন্যান্য সকল নফল ইবাদতই বাদ দিয়ে শুধু কুরআন তিলাওয়াত নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। (প্রাগুক্ত) বরকতময় এ মাসে উম্মতের নেককারগণ বারবার কুরআন কারীম খতম করার চেষ্টা করতেন। মনে হতো যেন কুরআন তিলাওয়াত নিয়ে তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। কে কত বেশি কুরআন তিলাওয়াত করতে পারেন? ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) এর যুহদ, তাকওয়া এবং ইবাদত ইতিহাসে খুবই প্রসিদ্ধ। তিনি চল্লিশ বছর ইশার উযূ দিয়ে ফজরের নামায আদায় করছেন। ইমাম আবূ ইউসুফ র. থেকে তার সম্পর্কে বিশুদ্ধ বর্ণনায় আছে যে, তিনি প্রতিদিন এক খতম কুরআন তিলাওয়াত করতেন। রামাদান আগমনের সাথে সাথে তার কুরআন তিলাওয়াতের পরিমাণ বেড়ে যেত, প্রতি রামাদানে তিনি কুরআন কারীম ৬০ বার খতম করতেন এবং ঈদের দিন আরো ২ খতম করতেন। (আখবারু আবি হানীফাহ, পৃ. ৫৫)

অনুরূপ আমলের বর্ণনা ইমাম শাফেঈ থেকেও রয়েছে। তার প্রসিদ্ধ ছাত্র রাবী বিন সুলাইমান বলেন, ইমাম শাফিঈ (র.) রামাদান মাসে ৬০ বার কুআন কারীম খতম করতেন। প্রত্যেক রাতে দুই খতম করে পুরো মাসে ৬০ খতম তিলাওয়াত করতেন। রামাদান ছাড়া অন্যান্য মাসে তিনি ৩০ খতম কুরআন তিলাওয়াত করতেন। (তারীখে বাগদাদ, ২/৬১, সিফাতুস সাফওয়াহ, ২/২৫৫)

আল্লামা যাহাবী (র.) ইমাম বুখারী র. এর রামাদান মাসের আমল বর্ণনা করে লিখেন, ইমাম বুখারী শেষরাতে কুরআন কারীমের অর্ধেক অংশ বা এক তৃতীয়াংশ তিলাওয়াত করতেন এবং ইফতারের পূর্বেই কুরআন খতম করে নিতেন। অর্থাৎ প্রত্যেক দিনই তিনি এক খতম তিলাওয়াত করতেন। এছাড়াও তিনি তারাবীহ'র নামাযের পর আবার নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং প্রত্যেক তিন দিনের নামাযে এক খতম তিলাওয়াত করতেন। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা; ইমাম যাহাবী, ১২/৪৩৯) হযরত ইবরাহীম নাখঈ বলেন, হযরত আসওয়াদ রামাদানের প্রতি রাতে কুরআন কারীমের এক খতম করতেন। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা; ইমাম যাহাবী, ৪/৫১) ইমাম নববী র. বিশুদ্ধ সনদে প্রখ্যাত তাবেঈ মুফাসসির হযরত মুজাহিদ র. সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, তিনি রামাদান মাসে প্রত্যেক দিন এক খতম কুরআন তিলাওয়াত করতেন। (আত তিবয়ান ফি আদাবি হামালাতিল কুরআন, পৃ. ৭৪)

হাফিয ইবনু আসাকির বলেন, রামাদান মাসে আমার বাবা খুব বেশি কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং প্রতিদিন এক খতম কুরআন তিলওয়াত করতেন। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা; ইমাম যাহাবী, ২০/৫৬২)

হযরত কাতাদাহ (র.) প্রত্যেক সাত রাতে কুরআন কারীম একবার খতম করতেন। কিন্তু রামাদান মাসে প্রত্যেক তিন রাতে এক খতম তিলাওয়াত করতেন। রামাদানের শেষ দশকে প্রতি রাতে এক খতম কুরআন তিলাওয়াত করতেন। (হিলয়াতুল আউলিয়া) ইমাম যাহাবী বলেন, কাতাদাহ রামাদানে মানুষকে কুরআনের দারস দিতেন। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা; ইমাম যাহাবী)

রামাদানে সালাফের নামায

রাতের গভীরে নামায আদায় করা সালফে সালেহীনের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য। রাতের বেলা নিরবে নিভৃতে আল্লাহকে ডাকেননি, আল্লাহর এমন কোনো নেক বান্দাহ খুঁজে পাওয়া বিরল। রাতের গভীরে আল্লাহকে ডাকা, তাহাজ্জুদের নামায আদায় করা নেককারদের অন্যতম অভ্যাস। রামাদানে তাদের এই আমলগুলো আরো বেড়ে যেত। ইমাম যাহাবী আবূ মুহাম্মদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ৪২৭ হিজরীর রামাদান মাসটি তিনি বাগদাদে কাটিয়েছেন। তিনি পুরো রামাদান মাস তারাবীহ'র নামায জামাআতের সাথে আদায় করেছেন। তিনি বলেন, এখানকার মানুষজন তারাবীহ'র নামায শেষে বিরতিহীনভাবে তারা ফজর পর্যন্ত নামায পড়তে থাকেন। ফজরের পর তারা তাদের ছাত্রদেরকে পাঠদান করতে থাকেন। তারা বলতেন, এ মাসের রাতে বা দিনে আমরা ঘুমিয়ে থাকতে পারি না। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা; ইমাম যাহাবী, ১৭/৬৫৩)

সাহাবায়ে কিরাম রামাদান মাসে রাতের বেলা ইশার নামাযের পর থেকে সাহরী পর্যন্ত নামায আদায় করতেন। তাদের সে নামাযের কিরাত হতো অনেক দীর্ঘ, সিজদা ছিল অনেক লম্বা। হযরত আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রা.) রামাদান মাসে তার ঘরে রাত্রিকালীন নামায শুরু করতেন। অন্যান্য লোকেরা যখন নামায শেষ করে মসজিদ থেকে চলে যেত তখন তিনি একটি পানির পাত্র নিয়ে ঘর থেকে চুপি চুপি বের হয়ে মসজিদে নববীতে চলে যেতেন। সারা রাত তিনি মসজিদে কাটিয়ে ফজরের নামাযের পর মসজিদ থেকে বের হতেন। (আস সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, ২/৪৯৪) সাহাবায়ে কিরামের তারাবীহ সম্পর্কে ইমাম বায়হাকী র. বর্ণনা করেন হযরত উমর (রা.), উসমান (রা.) এর যুগে লোকেরা বিশ রাকাআত তারাবীহ'র নামায এত গুরুত্বের সাথে আদায় করতেন যে, দীর্ঘ কিরাত পড়ার কারণে অনেকে তাদের লাঠির উপর ভর করেও নামাযে দাঁড়িয়ে থাকতেন। (আস সুনানুল কুবরা, বায়হাকী)

সাহাবায়ে কিরামের পরবর্তী যুগের নেককার উম্মতগণের জীবনী অধ্যয়ন করলেও পাওয়া যায় তারা রামাদান শরীফে নফল নামাযের প্রতি অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। মুবারক এ মাসের প্রতিটি রাত-ই তারা নামাযের আদায়ের মাধ্যমে অতিবাহিত করতেন। এমনকি তাদের অনেক সম্পর্কে এমন বর্ণনাও আছে যে, দীর্ঘ নামাযের কারণে সাহরী খাওয়ার সময়টাও কমে যেত। ফজর উদিত হওয়ার আশঙ্কায় খুব দ্রুত সাহরী খেয়ে নিতেন। (আল মুআত্তা; ইমাম মালিক, কিতাবুস সালাতি ফি রামাদান) ইমাম ওয়াকী ইবনুল জাররাহ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি রামাদান মাসে যুহরের নামাযের পর থেকে আসর পর্যন্ত পুরোটা সময় নফল নামাযেই কাটাতেন। হযরত আবূ রাজা রামাদান মাসে তার ছাত্রদের নিয়ে রাতের বেলা নামায আদায় করতেন। প্রত্যেক দশ দিনের নামাযে কুরআন খতম করতেন। (কিতাবুয যুহদ, ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল)

এই হলো আমাদের পূর্বসূরিদের রামাদান মাসে নামায আদায়ের কিছু নমুনা। যারা রামাদান মাসকে গণীমত মনে করে এর প্রতিটি মুহূর্তকে আল্লাহর ইবাদতে কাটানোর চেষ্টা করতেন। শুধু ইবাদত করেই শেষ নয়, সারা রাত জেগে আল্লাহর গোলামী করেও ফজরের পর থেকে দুআ করতে থাকতেন 'আল্লাহ রাতের ইবাদত কবূল করো'। রিয়া বা লৌকিকতা থেকে মুক্ত হয়ে ইবাদত করার চেষ্টা করতেন। এজন্য দেখা যায় ইবাদতগুলো গোপন রাখার জন্য তারা বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতেন। হযরত আইয়ুব সাখতিয়ানী সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি সারা রাত আল্লাহর ইবাদতে কাটাতেন। ফজরের সময় ঘরের মধ্যে এমন কিছু শব্দ করতেন যাতে অন্যান্য লোকেরা বুঝে যে, তিনি এই মাত্র ঘুম থেকে উঠেছেন। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৬/১৬) সুবহানাল্লাহ। এই ছিল তাদের তাকওয়া, তাদের ইবাদতের খুলুসিয়াত।

অন্যান্য ইবাদত

রামাদান দান করার ফযীলতে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, সর্বোত্তম সদকাহ হলো যা রামাদানে প্রদান করা হয়। মাহে রামাদানের ফযীলত এবং এতে নেক আমলে বহুগুণ সাওয়াবের প্রত্যাশী হয়ে সালফে সালেহীন এ মাসে তাদের দান-সাদকাহ, মানুষকে খাওয়ানোর মাত্রা বাড়িয়ে নিতেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রা.) কোনো মিসকীনকে সাথে না নিয়ে ইফতার করতেন না। ইমাম যুহরী র. বলতেন, এ মাস হলো কুরআন তিলাওয়াত আর মানুষকে খাওয়ানোর মাস। (লাতাইফুল মাআরিফ, পৃ.১৭১) হাম্মাদ বিন আবি সুলাইম রামাদান মাসে প্রতিদিন ৫০০ মানুষকে ইফতার করাতেন। এমনকি পুরো রামাদান মাস তিনি তাদের সব কিছুর ব্যবস্থাপনা করতেন। ঈদের পর তাদের প্রত্যেককে ১০০ দিরহাম করে দান করতেন। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা; ইমাম যাহাবী, ৫/১৩২) আবুস সাওয়ার আল আদাওয়ী বলেন, বনী আদীর লোকজন রামাদান মাসে কাউকে সাথে না নিয়ে ইফতার করত না। আর কাউকে না পেলে তারা মসজিদে চলে যেত এবং সেখানে মানুষদের সাথে বসে ইফতার করত। (আল কারাম ওয়াল জুদ ওয়া সাখা; আল বুরজানী, পৃ.৫৩)

নামায, রোযা, কুরআন তিলাওয়াতের পাশাপাশি সলফে সালেহীন রামাদান মাসে আল্লাহর দরবারে অনেক বেশি রোনাজারি করতেন। তাদের মধ্যে অনেকে এমন ছিলেন যে, সারা রাত ইবাদত করার পর সকাল থেকে আল্লাহর কাছে দুআ করতেন যেন আল্লাহ তাদের রাত্রিকালীন ইবাদত কবূল করে নেন। সারা রাত এবং সারা দিন ইবাদতের মধ্য দিয়ে রামাদান অতিবাহিত করার পরও তাদের কান্নার পরিমাণ আরো বেশি হয়ে যেত, এই আশঙ্কায় যে, তাদের রামাদান আল্লাহর কাছে কবূল হলো কি না? হযরত উমর ইবনু আব্দিল আযীয (র.) ইদুল ফিতরের খুতবায় মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলেন, হে লোকজন তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিয়াম পালন করেছো এবং রাতের ইবাদত করেছ। আজ তোমরা আল্লাহর কাছে এগুলো কবূল হওয়ার দুআ করবে। জনৈক সালাফকে ঈদুল ফিতরের দিন বলা হলো আজ তো খুশির দিন। তিনি বললেন, হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। কিন্তু আমি ভয়ের মধ্যে আছি। কারণ আমি এমন এক বান্দাহ যাকে তার মালিক নেক আমলের নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু আমি জানি না আমার আমল কবূল হলো কি না? আবদুল আযীয ইবনু আবি রাওয়াদ বলেন, আমি পূর্বসূরি নেককার ব্যক্তিদের দেখেছি তারা নেক আমল করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করতেন। আমল করার পরও তাদের মধ্যে ভীতি কাজ করত। আমলটি আল্লাহর কাছে কবূল হলো কি না?

সালফে সালেহীনের সিয়াম এবং রামাদানের সাথে যদি আমাদের সিয়াম পালন এবং মাহে রামাদান অতিবাহিত করাকে তুলনা করি তাহলে আমরা সহজে অনুধাবন করতে পারব আমরা কতটুকু পিছনে আছি, কেমন গাফলতের সাথে মুবারক মাসটাকে কাটিয়ে দিচ্ছি। আমাদের উচিত হলো, জীবনের প্রতিটি রামাদানকে গণীমত মনে করে গাফলতের নিদ্রা সরিয়ে আল্লাহর ইবাদতে মনোনিবেশ করা। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

রোযার মাসাইল

যে সব কারণে রোযা ভঙ্গ হয় এবং শুধু কাযা ওয়াজিব হয়

রোযাদার ব্যক্তিকে জোরপূর্বক কোনো কিছু আহার করানো হলে, কুলি করা বা নাকে পানি দেওয়ার সময় রোযার কথা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও অসতর্কতাবশত পেটে পানি প্রবেশ করলে, রোযাদারের প্রতি কোনো কিছু নিক্ষেপ করার পর তা তার গলায় প্রবেশ করলে, ডুব দিয়ে গোসল করার সময় হঠাৎ নাক বা মুখ দিয়ে পানি গলার মধ্যে প্রবেশ করলে, রোযার দিনে ঘুমের অবস্থায় কোনো কিছু আহার করলে অথবা রোযা অবস্থায় পাথর, লোহা বা শিশার টুকরা বা এ জাতীয় কোনো কিছু আহার করলে যা সাধারণত খাদ্য হিসেবে খাওয়া হয় না বা ঔষধরূপেও সেবন করা হয় না এসব ক্ষেত্রে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। এ রোযার কাযা ওয়াজিব হবে। কিন্তু কাফফারা ওয়াজিব হবে না। (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)

লোবান, আগর বাতি জালিয়ে ইচ্ছাকৃত এর ধোঁয়া গ্রহণ করলে, কাঁচা লাউ যা রান্না করা হয়নি তা ভক্ষণ করলে, তাজা বা শুকনো আখরোট, শুকনো বাদাম, খোসাসহ ডিম, ছিলকাসহ আনার ও কাঁচা পেস্তা ভক্ষণ করলে রোযা ভঙ্গ হবে এতে কাযা ওয়াজিব হবে, কাফফারা ওয়াজিব হবে না। শুকনো পেস্তা বাদাম চিবিয়ে ভক্ষণ করলে কাযা ও কাফফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে। অবশ্য না চিবিয়ে গিলে ফেললে কাফফারা ওয়াজিব হবে না। খোসা ফাটা থাকলেও অধিকাংশ ফকীহদের মতে এ হুকুমই প্রযোজ্য হবে। (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)

চাউল, বাজরা, মশুরী, মাসকলাই ইত্যাদি ভক্ষণ করলে রোযা ভঙ্গ হবে ও কাযা ওয়াজিব হবে, কাফফারা ওয়াজিব হবে না। দাঁতের ফাঁকে যদি কোনো খাদ্য দ্রব্য আটকিয়ে থাকে আর তা সামান্য পরিমাণ হলে রোযা ভঙ্গ হবে না। পরিমাণে বেশি হলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। ছোলা বুট বা এর চেয়ে বড় কোনো কিছু হলে একে বেশি বলে গণ্য করা হবে। এর চেয়ে ছোট বা কম হলে তা কম বলে ধর্তব্য হবে। এরূপ কোনো বস্তু মুখ থেকে বের করে হাতে নিয়ে পুনরায় তা গলাধঃকরণ করলে রোযা ফাসিদ হয়ে যাবে। (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)

সাহরীর লোকমা মুখে রয়ে গেলে এবং ফজর উদিত হওয়ার পর তা গলাধঃকরণ করলে তার রোযা ভঙ্গ হবে ও কাযা ওয়াজিব হবে। আর যদি মুখ থেকে বের করে পুনরায় খায় তাহলে কাযা ও কাফফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে। অন্যের থুথু গলাধঃকরণ করলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। এতে কাযা ওয়াজিব হবে। কাফফারা ওয়াজিব হবে না। কিন্তু প্রিয় ব্যক্তির থুথু গলাধঃকরণ করলে কাযা ও কাফফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে, নিজের মুখের থুথুতে বেশিই হোক তা গলাধঃকরণ করলে রোযার কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু নিজের থুথু হাতে নিয়ে পুনরায় তা গলাধঃকরণ করলে রোযা ভঙ্গ হবে এবং কাযা ওয়াজিব হবে, কিন্তু কাফফারা ওয়াজিব হবে না। যদি কথা বলার সময় অথবা অন্য কোনো সময় মুখের থুথুতে রোযাদার ব্যক্তির দুই ঠোঁট ভিজে যায় অতঃপর সে যদি তা গিলে ফেলে তাহলে তার রোযা ফাসিদ হবে না। যদি লালা মুখ থেকে থুতনি পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে যায় এবং এর যোগসূত্র মুখের মধ্যে থাকে এমতাবস্থায় উক্ত লালা মুখে টেনে নিয়ে তা গিলে ফেললে রোযা ফাসিদ হবে না। কিন্তু মুখের সাথে যুগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেলে এবং তা গলাধঃকরণ করলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)

রোগের কারণে যদি কারো মুখ থেকে লালা নির্গত হয়ে মুখে পুনপ্রবেশ করে এবং গলায় ঢুকে তবে রোযা ভঙ্গ হবে না। রক্ত পান করলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং কাযা ওয়াজিব হবে, কিন্তু কাফফারা ওয়াজিব হবে না। দাঁত থেকে রক্ত বের হয়ে গলায় ঢুকলে যদি থুথুর পরিমাণ বেশি হয় তাহলে ক্ষতি নেই। আর রক্তের পরিমাণ বেশি হলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। সমান সমান হলেও রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। রেশমের রঙ্গের কাজ করার সময় যদি রেশম মুখের ভেতর ঢুকে এবং মুখের থুথু রঙ্গিন হয়ে যায় তবে এ থুথু গলাধঃকরণ করলে এবং এ সময় রোযার কথা স্মরণ থাকলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে বৃষ্টি বা বরফের পানি গলার ভেতর ঢুকলেও রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)

নিজ স্ত্রীকে স্পর্শ করা, একত্রে মিলিতভাবে শয়ন করা, মুসাফাহা করা এবং মুআনাকা করা বা চুমু দেওয়ার দ্বারা যদি আদ্রতা অনুভব হয়, তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। কাযা আবশ্যক হবে। কাপড়ের উপর দিয়ে স্ত্রীকে স্পর্শ করার পর বীর্য নির্গত হলে এ ক্ষেত্রে স্বামী যদি স্ত্রীর শরীরের উষ্ণতা অনুভব করে তাহলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। অন্যথায় ভঙ্গ হবে না। রোযা অবস্থায় কোনো ব্যক্তি যদি হস্তমৈথুন করে এবং এতে বীর্য নির্গত হয় তবে তার উপর কাযা ওয়াজিব হবে। অনুরূপ স্ত্রীর দ্বারা হস্তমৈথুন করিয়ে বীর্যপাত করানো হলে তাতেও রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)

সাহরী খাওয়ার পর পান মুখে ঘুমিয়ে পড়লে এবং সুবহে সাদিকের পর জাগ্রত হলে এ রোযা সহীহ হবে না। কাযা ওয়াজিব হবে। কিন্তু কাফফারা ওয়াজিব হবে না। (তাতারখানিয়া, ১ম খণ্ড)

যদি কোনো ব্যক্তি রোযা অবস্থায় ভুলে পানাহার বা স্ত্রী সহবাস করার পর রোযা ভেঙ্গে গেছে মনে করে ইচ্ছাকৃতভাবে অব্যাহত রাখলে তার রোযা অবশ্যই ভঙ্গ হয়ে যাবে। এতে কাযা ওয়াজিব হবে কিন্তু কাফফারা ওয়াজিব হবে না।

বমি হওয়ার পর রোযা ভঙ্গ হয়ে গেছে মনে করে পানাহার করলে রোযা অবশ্যই ভঙ্গ হয়ে যাবে। তাতে কাযা ওয়াজিব হবে, কাফফারা ওয়াজিব হবে না। আর এতে রোযা ভঙ্গ হয় না এ কথা জানা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃত রোযা ছেড়ে পানাহার করলে তাতে কাযা ও কাফফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে। স্বপ্নদোষ হওয়ার পর রোযা ভঙ্গ হয়ে গেছে মনে করে পানাহার করলে কাযা ওয়াজিব হবে, কিন্তু কাফফারা ওয়াজিব হবে না। অবশ্য স্বপ্ন দোষের হুকুম জানা সত্ত্বেও এরূপ করলে কাফফারাও ওয়াজিব হবে। (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)

রামাদান মাসে কোনো কারণবশত যদি রোযা ভঙ্গ হয়ে যায় তাহলেও দিনের বেলায় রোযাদারের ন্যায় পানাহার বন্ধ রাখা ওয়াজিব। (হিদায়া, ১ম খণ্ড)

যেসব কারণে রোযা ভঙ্গ হয় এবং কাযা ও কাফফারা উভয়ই ওয়াজিব হয়

রামাদান মাসে নিয়ত করে রোযা রাখার পর ওযর ব্যতীত স্বেচ্ছায় তা ভঙ্গ করলে ঐ রোযার কাযা ও কাফফারা উভয়ই ওয়াজিব হয়। মলদ্বার বা যোনিদ্বার দিয়ে যৌনচারিতায় লিপ্ত হলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। বীর্যপাত হোক বা না হোক কাযা ও কাফফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে। মহিলা যদি স্বেচ্ছায় পুরুষের

সাথে এ কাজে লিপ্ত হয় তবে তাদের উভয়ের ক্ষেত্রেই এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। জোরপূর্বক আরম্ভ করার পরে মহিলা যদি স্বেচ্ছায় এ কাজে রাযী হয়ে যায় তবে সে ক্ষেত্রেও কাযা ও কাফফারা উভয় ওয়াজিব হবে। কোনো মহিলা যদি কোনো বালক বা পাগলকে সুযোগ দেয় এবং তারা যদি তার সাথে যিনা করে তবে উক্ত মহিলার উপর কাযা ও কাফফারা উভয় ওয়াজিব হবে। ইচ্ছাকৃতভাবে খাদ্য বা ঔষধ গ্রহণ করলে কাযা ও কাফফারা ওয়াজিব হবে। রোযাদার ব্যক্তি যদি খাদ্য বা পানীয় জাতীয় কোনো কিছু পানাহার করে তাহলে কাযা ও কাফফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে। যেসব গাছের পাতা সাধারণত ভক্ষণ করা হয় তা ভক্ষণ করলে কাযা ও কাফফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে। শাক-সবজির হুকুমও অনুরূপ। (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)

শুধু লবণ খেলেও কাফফারা ওয়াজিব হবে। রোযা অবস্থায় শিংগা লাগানোর পর রোযা ভঙ্গ হয়ে গেছে মনে করে ইচ্ছাকৃতভাবে আহার করলে কাযা ও কাফফারা উভয় ওয়াজিব হবে।

চোখে সুরমা ব্যবহার করা অথবা শরীরে বা গোঁফে তৈল মাখার পর রোযা ভঙ্গ হয়ে গেছে মনে করে ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করলে কাফফারা ওয়াজিব হবে। মিসওয়াক করার পর রোযা ভঙ্গ হয়ে গেছে মনে করে ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করলে কাযা ও কাফফারা ওয়াজিব হবে।

পরনিন্দা করার কারণে রোযা ভঙ্গ হয়ে গেছে মনে করে ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করলে কাফফারা ওয়াজিব হবে।

কোনো ঘুমন্ত মহিলার সাথে সহবাস করা হলে পুরুষের উপর কাযা ও কাফফারা উভয়ই ওয়াজিব হবে। (শামী)

রামাদান মাসে রোযার নিয়ত করে রোযা আরম্ভ করে ভঙ্গ করলে কাফফারা ওয়াজিব হবে। রামাদান ছাড়া অন্য কোনো রোযা ভঙ্গ করলে কাফফারা ওয়াজিব হবে না। অনুরূপ রামাদানের রোযার নিয়ত করার পূর্বে রোযা ভঙ্গ করলে কাফফারা ওয়াজিব হবে না। (হিদায়া, ১ম খণ্ড)

রোযা অবস্থায় যেসব কাজ মাকরূহ

রোযা অবস্থায় নিম্নোক্ত কাজগুলো মাকরূহ-

১. রোযা অবস্থায় গন্ধ জাতীয় বস্তু চিবানো

২. বিনা ওযরে কোনো কিছু চিবানো বা কোনো কিছুর স্বাদ গ্রহণ করা

৩. কোনো বস্তু খরিদ করার সময় জিহ্বা দ্বারা এর স্বাদ গ্রহণ করা। যেমন- মধু, তৈল ইত্যাদি

৪. শৌচকর্ম সম্পাদনে প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি ব্যবহার করা

৫. কুলি করার সময় গড়গড়া করা এবং নাকে পানি দেওয়ার সময় নাকের ভেতর পানি টেনে নেওয়া

৬. পানিতে নেমে গোসল করার সময় বায়ু নির্গত করা

৭. মুখে থুথু জমিয়ে তা গিলে ফেলা (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)

৮. স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর নফল রোযা রাখা

৯. কামোদ্দীপনা সৃষ্টি হওয়ার ব্যাপারে নিজেকে নিরাপদ মনে না করলে এ অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করা বা তার সাথে কোলাকুলি করা

১০. যে কাজ করলে রোযাদার দুর্বল হয়ে রোযা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় এমন কাজ করা। যেমন- শিংগা লাগানো অথবা অত্যাধিক কষ্টসাধ্য কোনো কাজ করা। (মারকিল ফালাহ ও আলমগীরী, ১ম খণ্ড)

১১. এমন বিলম্বে সাহরী খাওয়া যে সময়ের ব্যাপারে সন্দেহ এসে যায়। (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)

১২. বিনা ওযরে রোযা অবস্থায় শিশু সন্তানের খাওয়ার জন্য কোনো কিছু চিবিয়ে দেওয়া। (মারাকিল ফালাহ)

রোযা অবস্থায় যেসব কাজ মাকরূহ নয়

১. মিসওয়াক করা। রোযা অবস্থায় সকাল-সন্ধ্যা তথা সবসময় মিসওয়াক করা জায়িয। কাঁচা বা শুকনো যেকোনো ধরনের ডাল দ্বারা মিসওয়াক করা যাবে।

২. চোখে সুরমা ব্যবহার করা। যদি সৌন্দর্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্য না থাকে তবে তা ব্যবহার করা জায়িয। আর যদি সৌন্দর্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্য থাকে তবে মাকরূহ।

৩. শিংগা লাগানো। যদি তাতে দুর্বল হয়ে পড়ার আশঙ্কা না থাকে তবে তা মাকরূহ হবে না। আর যদি দুর্বল হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে তবে মাকরূহ হবে। তাই দিনে শিংগা না লাগিয়ে সূর্যাস্তের পর শিংগা লাগানো শ্রেয়।

৪. রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করা বা তার সাথে কোলাকুলি করা, যদি এতে সহবাসে লিপ্ত হওয়া বা বীর্যপাত হওয়া থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করে। (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)

৫. রোযা অবস্থায় কুলি করা বা নাকে পানি দেওয়া

৬. গোসল করা

৭. শরীর ঠাণ্ডা করার জন্য ভিজা কাপড় শরীরে জড়িয়ে রাখা (মারাকিল ফালাহ)

৮. স্বামী বদ মেজাজী হলে জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা খাদ্যের স্বাদ চেয়ে দেখলে রোযা মাকরূহ হবে না।

৯. অনন্যোপায় অবস্থায় রোযাদার মা কোনো কিছু চিবিয়ে শিশুকে আহার করালে রোযা মাকরূহ হবে না। (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)

রোযার কাফফারা সম্পর্কিত মাসাইল

রামাদান মাসে রোযা রাখার পর বিনা ওযরে, ইচ্ছাকৃতভাবে তা ভঙ্গ করলে কাফফারা ওয়াজিব হবে। রোযার কাফফারা যিহারের কাফফারার মতোই। কাফফারা হলো, একজন গোলাম আযাদ করা। সম্ভব না হলে একাধারে ষাট দিন রোযা রাখা। তাও সম্ভব না হলে ষাটজন মিসকীনকে দু'বেলা আহার করানো।

গোলাম আযাদ করতে অক্ষম হলে একাধারে ষাটদিন রোযা রাখতে হবে। ভেঙ্গে ভেঙ্গে কিছু কিছু করে রোযা রাখা জায়িয নেই। যদি ঘটনাক্রমে মাঝে দুই একদিন বাদ পড়ে যায় তবে পুনরায় আরম্ভ করে ষাটটি পূর্ণ করতে হবে। তবে এই ষাট দিনের মধ্যে যদি কোনো মহিলার হায়িয আরম্ভ হয়ে যায় তবে পূর্বের রোযাগুলোও হিসাবে ধরা হবে। (শামী, ২য় খণ্ড)

নিফাসের কারণে যদি রোযা ভঙ্গ করতে হয় তবে পূর্বের রোযাসমূহ ধর্তব্য হবে না। নতুনভাবে পুনরায় ষাটটি রোযা রাখতে হবে। (শামী)

রোগের কারণে যদি কাফফারার রোযা ভঙ্গ করতে হয় সুস্থ হওয়ার পর পুনরায় ষাটটি রোযা রাখতে হবে। যদি মাঝে রামাদান মাস এসে যায় তবে রামাদান মাসের পর কাফফারার রোযা আদায় হবে না। নতুনভাবে আবার ষাটটি রোযা রাখতে হবে। (শামী)

বার্ধক্য বা অসুস্থতার কারণে কেউ যদি কাফফারার রোযা রাখতে সক্ষম না হয় তবে এর পরিবর্তে ষাটজন মিসকীনকে পেট ভরে দুই বেলা আহার করাতে হবে।

এই ষাটজন মিসকীনের প্রত্যেকেই বালিগ হতে হবে। কোনো নাবালিগকে কাফফারার খাদ্য খাওয়ানো হলে তা হিসাবে গণ্য হবে না। এর পরিবর্তে সমসংখ্যক বালিগ মিসকীনকে খাওয়াতে হবে। (শামী)

খাওয়ানোর পরিবর্তে প্রত্যেক মিসকীনকে 'সাদাকাতুল ফিতর' পরিমাণ চাল বা আটা বা এর মূল্য প্রদান করলেও কাফফারা আদায় হয়ে যাবে। (শামী)

যার উপর কাফফারা ওয়াজিব হয়েছে সে যদি অন্য কাউকে তার পক্ষ হতে কাফফারা আদায়

করার জন্য আদেশ করে এবং উক্ত ব্যক্তি তা আদায় করে দেয় তবে কাফফারা আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু যার উপর কাফফারা ওয়াজিব হয়েছে তার বিনা অনুমতিতে অন্য কেউ যদি তার পক্ষ হতে কাফফারা আদায় করে তবে কাফফারা আদায় হবে না। (শামী, ২য় খণ্ড)

একজন মিসকীনকে ষাটদিন পর্যন্ত দু'বেলা আহার করালে অথবা ষাটদিন পর্যন্ত একজন মিসকীনকে ষাটবার সাদকায়ে ফিতরের সমপরিমাণ গম বা এর মূল্য প্রদান করলে এতেও কাফফারা আদায় হয়ে যাবে। (হিদায়া)

একাধারে ষাটদিন আহার না করিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে আহার করালেও কাফফারা আদায় হবে। (মারাকিল ফালাহ)

ষাট দিনে গম বা আটা অথবা এর মূল্য হিসাব করে যদি একই দিনে তা কোনো এক মিসকীনকে প্রদান করা হয় তবে তাতে কেবল একদিনের কাফফারা আদায় হবে বাকী উনষাট দিনের কাফফারা পুনরায় আদায় করতে হবে। (শামী)

কোনো মিসকীনকে সাদাকায়ে ফিতরের পরিমাণ হতে কম প্রদান করলে তাতে কাফফারা আদায় হবে না। (বাহরুর রাইক)

একটি রোযা ভঙ্গ করলে একটি কাফফারা ওয়াজিব হয়। এমনিভাবে একাধিক রোযা ভঙ্গ করলেও একটি কাফফারাই ওয়াজিব হবে। একটি কাফফারার পরিমাণ ষাটজন মিসকীনকে দু'বেলা তৃপ্তি সহকারে আহার করানো। কিন্তু কাযার বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। অর্থাৎ একাধিক রোযা ভঙ্গ করা অবস্থায় প্রত্যেকটি রোযারই কাযা ওয়াজিব হবে। অবশ্য দুই রামাদানের দু'টি রোযা ভঙ্গ করলে দু'টি কাফফারা আদায় করতে হবে। এ ক্ষেত্রে একটি কাফফারা যথেষ্ট হবে না। (শামী)

ফিদইয়ার মাসাইল

অতিশয় বৃদ্ধ ব্যক্তি যে রোযা রাখতে অক্ষম অথবা এমন রুগ্ন ব্যক্তি যার সুস্থতার আশা করা যায় না তাদের ব্যাপারে শরীআতের বিধান হলো, তারা রোযার পরিবর্তে ফিদইয়া দিবে। অর্থাৎ প্রত্যেক দিনের রোযার পরিবর্তে একজন মিসকীনকে দু'বেলা পেট ভরে আহার করাবে অথবা সাদকায়ে ফিতরের সমপরিমাণ গম, যব, খেজুর বা তার বাজার মূল্য কোনো মিসকীনকে প্রদান করবে। (শামী)

একটি পূর্ণ ফিদইয়া একজন মিসকীনকে দেওয়াই উত্তম। কিন্তু যদি একটি ফিদইয়া ভাগ করে একাধিক মিসকীনকে প্রদান করা হয় তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এর মতে তাও জায়িয আছে। (শামী)

বৃদ্ধ যদি পুনরায় কখনো রোযা রাখার শক্তি ফিরে পায় অথবা নিরাশ রুগ্ন ব্যক্তি যদি আরোগ্য লাভ করে এবং রোযা রাখতে সক্ষম হয় তবে যেসব রোযার ফিদইয়া প্রদান করা হয়েছে পুনরায় এগুলোর কাযা করতে হবে। আর সে ফিদইয়াটা সাদাকা হিসেবে গণ্য হবে। (শামী ও আলমগীরী, ১ম খণ্ড)

কারো যিম্মায় কাযা রোযা থাকলে সে যদি তার ওয়ারিসদেরকে ওসীয়াত করে যায় যে আমার এতগুলো রোযার কাযা আছে, তোমরা এ ফিদইয়া আদায় করে দিবে। এরূপ ওসীয়াত করে গেলে তার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি হতে দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করার পর ঋণ পরিশোধ করে যে পরিমাণ সম্পদ থাকবে তার এক তৃতীয়াংশ সম্পদ দ্বারা সম্পূর্ণ ফিদইয়া আদায় করা সম্ভব হলে তা আদায় করা তাদের উপর ওয়াজিব হবে। ফিদইয়ার পরিমাণ যদি তার অবশিষ্ট সম্পদের এক তৃতীয়াংশের চেয়ে বেশি হয় তবে মৃত ব্যক্তির সম্পদ দ্বারা যে পরিমাণ ফিদইয়া আদায় করা যায় ঐ পরিমাণই আদায় করা ওয়াজিব হবে। অতিরিক্ত পরিমাণ ফিদইয়া আদায় করা ওয়ারিসদের উপর ওয়াজিব নয়। বাকী ফিদইয়া আদায় করতে অতিরিক্ত যে সম্পদ লাগবে তার জন্য ওয়ারিসদের অনুমতি জরুরি হবে। (শামী, ২য় খণ্ড ও আলমগীরী, ১ম খণ্ড)

যদি মৃত ব্যক্তি ওসীয়াত না করে যায় এবং এমতাবস্থায় যদি তার ওলী-ওয়ারিসগণ নিজেদের মাল থেকে তার নামায রোযার ফিদইয়া আদায় করে দেয় তবে তা জায়িয হবে। আশা করা যায় যে, আল্লাহ তাআলা হয়তো নিজ গুণে তা কবূল করে নিবেন এবং তার অপরাধ ক্ষমা করে দিবেন। মৃত ব্যক্তির ওসীয়াত না করা অবস্থায় তার পরিত্যক্ত মাল থেকে ফিদইয়া আদায় করা জায়িয নেই। অনুরূপ ফিদইয়ার পরিমাণ যদি তার মালের এক তৃতীয়াংশ অপেক্ষা বেশি হয় তবে ওসীয়াত করা সত্ত্বেও ওয়ারিসদের অনুমতি ছাড়া অতিরিক্ত ফিদইয়া পরিত্যক্ত মাল দ্বারা পরিশোধ করা জায়িয হবে না। অবশ্য যদি ওয়ারিসগণ সকলেই খুশি মনে অনুমতি দেয় তবে পরিত্যক্ত মাল থেকে ও অবশিষ্ট ফিদইয়ার অবশিষ্ট আদায় করা জায়িয হবে। কিন্তু নাবালিগ ওয়ারিসের অনুমতি শরীআতে গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব বালিগ ওয়ারিসগণ যদি নিজেদের অংশ পৃথক করে নিয়ে তার থেকে ফিদইয়ার অতিরিক্ত অংশ আদায় করে তবে জায়িয হবে। (শামী ও আলমগীরী, ১ম খণ্ড)

ওলীর জন্য মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে নামায ও রোযার কাযা আদায় করা গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং কোনো ওয়ারিস যদি মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে রোযা রাখে বা নামায পড়ে এতে তার কাযা আদায় হবে না। (আলমগীরী ও হিদায়া, ১ম খণ্ড)

রোযা পালনে অক্ষম এবং ফিদইয়া আদায়ে অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিরও প্রকাশ্যে মানুষের সামনে পানাহার করা উচিত নয়।

মুসাফিরের রোযা

সফরে থাকাকালীন অবস্থায় মুসাফিরের জন্য রোযা না রাখা জায়িয আছে। অবশ্য পরে এর কাযা করে নিতে হবে।

সফরের অবস্থায় রোযা রাখলে যদি কোনো ক্ষতি না হয় তবে রোযা রাখা উত্তম। যদি ক্ষতি হয় তবে রোযা না রাখাই উত্তম। (শারহুল বিদায়া ও নূরুল ঈযাহ)

রুগ্ন ব্যক্তির রোযা

অসুস্থ ব্যক্তি যদি জীবন বিপন্ন হওয়ার অথবা অঙ্গহানী ঘটার আশঙ্কাবোধ করে তবে তার জন্য রোযা না রাখা জায়িয। অনুরূপ রোগ বেড়ে যাওয়া কিংবা রোগ দীর্ঘায়িত হওয়ার আশঙ্কা থাকলেও রুগ্ন ব্যক্তির জন্য রোযা না রাখা জায়িয। রোগের কারণে রোযা রাখতে সক্ষম না হলে সুস্থ হওয়ার পর তার কাযা করতে হবে। রোগী নিজে রোগের আলামত অথবা নিজের অভিজ্ঞতা কিংবা ধার্মিক বিজ্ঞ মুসলিম চিকিৎসকের পরামর্শের ভিত্তিতে রোগ বৃদ্ধি জীবন বিপন্ন হওয়া বা অঙ্গহানীর প্রবল ধারণা হলেই রোযা না রাখা তার জন্য জায়িয হবে। (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)

রোগ আরোগ্য লাভের পর শরীরে দুর্বলতা থাকা অবস্থায় রোযা রাখলে যদি পুনরায় রোগাক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে তবে এ অবস্থায় রোযা না রাখা জায়িয আছে। (শামী)

কেউ যদি পীড়িত অবস্থায় মারা যায় তবে রোগের কারণে তার যেসব রোযা ছুটে গিয়েছে তার ফিদইয়া আদায় করার জন্য ওসীয়াত করা তার উপর ওয়াজিব নয়। কেননা সে কাযা রোযা রাখার সময় পায়নি। (শামী)

রোগের কারণে কয়েক দিন রোযা রাখতে সক্ষম হয়নি এরূপ কোনো ব্যক্তি যদি আরোগ্য লাভের কয়েকদিন পর মারা যায় তাহলে যে কয়েকদিনের রোযা তার ফাওত হয়েছে এ পরিমাণ সময় সে সুস্থ থাকলে উক্ত দিনগুলোর

ফিদইয়া আদায় করার জন্য ওসীয়াত করে যাওয়া তার উপর ওয়াজিব। আর যে কয়েকদিন সে সুস্থ ছিল এর পরিমাণ যদি ছুটে যাওয়া রোযার অপেক্ষা কম হয় তবে যে কয়দিন সে সুস্থ ছিল সে কয়েকদিনের ফিদইয়া আদায় করার ওসীয়াত করে যাওয়া তার উপর ওয়াজিব। কিন্তু অতিরিক্ত দিনসমূহের ওসীয়াত করা তার উপর ওয়াজিব নয়। (শামী ও আলমগীরী, ১ম খণ্ড)

রোযা অবস্থায় ইনজেকশন ও ড্রুস গ্রহণ

মুখ, নাক, কান, প্রশ্রাব এবং গুহ্যদ্বার ইত্যাদির কোনো একটি দিয়ে মস্তিষ্ক ও পাকস্থলীতে কোনো কিছু প্রবেশ করলে তাতে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। এ সকল অঙ্গ ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে দেহাভ্যন্তরে কোনো কিছু প্রবেশ করানোর দ্বারা রোযা ভঙ্গ হয় না।

মুখ, নাক, কান, প্রশ্রাব ও গুহ্যদ্বার ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প উপায়ে যদি সরাসরি পাকস্থলী অথবা মস্তিষ্কে কোনো কিছু প্রবেশ করানো হয় তাতে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি সরাসরি পাকস্থলী বা মস্তিষ্কে না পৌছে তবে রোযা ভঙ্গ হবে না। অতএব গোশতে অথবা রগে কোনো প্রকারের ইনজেকশনের দ্বারা রোযা ভঙ্গ হবে না। স্যালাইন, গ্লুকোজ ইনজেকশন বা ইনজেকশনের মাধ্যমে শরীরে রক্ত প্রবেশ করানো দ্বারা রোযা ভঙ্গ হবে না। তবে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া রোযা অবস্থায় এ জাতীয় ইনজেকশন না নেওয়া শ্রেয়।

ড্রুস ব্যবহার বা হাঁপানীর প্রকোপ নিরসনের জন্য গ্যাস জাতীয় ঔষধ (ইনহেলার) ব্যবহারের দ্বারা রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। (জাদীদ ফিকহী মাসাইল)

রোযা অবস্থায় রক্তদান অথবা রক্ত গ্রহণ

রোযা অবস্থায় প্রয়োজনবোধে শিংগা লাগানো জায়িয। তবে দুর্বল হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকলে রোযা অবস্থায় শিংগা লাগানো মাকরূহ হবে। এ কারণেই ফকীহগণ বলেন, সন্ধ্যার পর শিংগা লাগানো উত্তম। (আলমগীরী, ১ম খণ্ড)

কাজেই পরীক্ষার উদ্দেশ্যে অথবা রক্তদানের উদ্দেশ্যে কিংবা অন্য কোনো প্রয়োজনে শরীর থেকে রক্ত বের করলে রোযা ভঙ্গ হবে না। কিন্তু এতে শারীরিক দুর্বলতার আশঙ্কা থাকলে মাকরূহ হবে। তাই দিনে রক্ত না দিয়ে রাতে দেওয়াই উত্তম। রোগ ব্যাধির কারণে কারো রক্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে ইনজেকশনের মাধ্যমে রক্ত গ্রহণ করলে রোযা ভঙ্গ হবে না। (জাদীদ ফিকহী মাসাইল)

রোযা অবস্থায় অপারেশন

মুখ গহ্বর, নাক ও কানের অভ্যন্তর ভাগ, প্রশ্রাব ও বাহ্য ইন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরে, মস্তিষ্ক ও পাকস্থলীর যেকোনো স্থানে অপারেশন করে কোনো অংশ কেটে ফেলে দেওয়া হলে তাতে রোযা ভঙ্গ হবে না। কিন্তু এ সকল অঙ্গে অপারেশনের পরে ঔষধ বা অন্য কোনো কিছু প্রবেশ করানো হলে তাতে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। উপরোক্ত ইন্দ্রিয়গুলো ছাড়া শরীরের যেকোনো স্থানে অপারেশন করলে এবং ঔষধ বা অন্য কোনো কিছু প্রবেশ করানো হলে তাতে রোযা ভঙ্গ হবে না।

ক্ষতস্থানে ঔষধ ব্যবহার

দুই প্রকারের ক্ষত আছে, যাতে ঔষধ ব্যবহার করাকে ফকীহগণ রোযা ভঙ্গকারী বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন:

১. আম্মা (آمة) ২. জায়িফা (جائفة)

মাথার উপরিভাগের গভীর ক্ষত যা মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌছে গেছে তাকে 'আম্মা' বলা হয়। এতে ঔষধ ব্যবহার করলে ঔষধ মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌছে যায়। আর জায়িফা (جائفة) পেটের ঐ গভীর ক্ষত যা পাকস্থলীতে পৌছে গেছে। এতে ঔষধ ব্যবহার করলে ঐ পাকস্থলী পর্যন্ত পৌছে যায়। উপরোক্ত জখমদ্বয় দ্বারা ঔষধ যেহেতু সরাসরি পাকস্থলী বা মস্তিষ্কে পৌছে যায় তাই এই দুই ক্ষতস্থানে ঔষধ ব্যবহার করলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। এছাড়া শরীরের অন্য কোনো জখমে ঔষধ ব্যবহার করলে রোযা ভঙ্গ হবে না। (আলমগীরী, শামী)

অর্শ (পাইলস) রোগের বটি সাধারণত গুহ্যদ্বার থেকে কিছু নীচে গজিয়ে থাকে। তাই অর্শের বটিতে বরফ দ্বারা সেক দিলে অথবা এতে জমাট কোনো ঔষধ ব্যবহার করলে রোযা ভঙ্গ হবে না। শিশু অর্শের বটিতে তরল ঔষধ ব্যবহার করলে এর কিছু অংশ যদি ভিতরে চলে যায় তবে তাতে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। (আহসানুল ফাতাওয়া)

চোখের ক্ষতস্থানে ঔষধ ব্যবহার করলে এবং ঔষধের স্বাদ গলায় অনুভূত হলেও রোযা ভঙ্গ হবে না। (শামী, ২য় খণ্ড ও আহসানুল ফাতাওয়া, ৪র্থ খণ্ড)

আধুনিক যুগের কোনো কোনো ফকীহ চোখে তরল ঔষধ ব্যবহারের ফলে রোযা ভঙ্গ হবে বলে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের যুক্তি এই যে, শরীর বিজ্ঞানীদের মতে চোখের ছিদ্রির সাথে গলার সরাসরি সংযোগ রয়েছে। তাই চোখে তরল ঔষধ ব্যবহার করলে তা গলায় পৌছে যেতে পারে। সতর্কতা হিসেবে দিনের বেলা চোখে ঔষধ ব্যবহার না করাই শ্রেয়।

[রোযার মাসাইলগুলো ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত 'ফাতাওয়া ও মাসাইল' থেকে নেওয়া ও ঈষৎ সম্পাদিত]

বাংলা জাতীয় মাসিক
পরওয়ানা
বিজ্ঞাপনের হার

শেষ প্রচ্ছদ (চার রং)
৪০,০০০/-
২য় ও ৩য় প্রচ্ছদ (চার রং)
৩০,০০০/-
ভিতরের পূর্ণ পৃষ্ঠা (সাদা কালো)
১৮,০০০/-
ভিতরের অর্ধ পৃষ্ঠা (সাদা কালো)
১০,০০০/-
ভিতরের সিকি পৃষ্ঠা (সাদা কালো)
৬,০০০/-
ভিতরের পূর্ণ পৃষ্ঠা (চার রং)
২৫,০০০/-
ভিতরের অর্ধ পৃষ্ঠা (চার রং)
১২,০০০/-
ভিতরের এক কলাম ৩" ইঞ্চি (সাদা কালো)
৩,০০০/-

বি. দ্র: একসাথে তিন মাসের জন্য ২৫%, ছয় মাসের জন্য ৩৫% ও এক বছরের জন্য ৫০% ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে।

যোগাযোগ
বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
মাসিক পরওয়ানা
মোবাইল: ০১৭৯৯৬২৯০৯০

ভিজিট করুন
তাসনীম تسنیم
www.tasneembd.org
▼কুরআন ▼হাদীস ▼আকীদা
▼ইবাদত ▼প্রবন্ধ ▼জীবনী
▼জিজ্ঞাসা ▼বই

নাবালকের রোযা রাখা এবং রোযা ফরয হওয়ার বয়স

ইমাদ উদ্দীন

ইসলাম মানবজীবনের সকল বিষয়ে সুন্দর নির্দেশনা প্রদান করে। এই নির্দেশনার পূর্ণ অনুসরণ মানুষকে ক্ষতি থেকে দূরে রাখে এবং কল্যাণের দিকে নিয়ে যায়। এজন্যই ইসলাম ধর্ম হলো পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। ইসলামের সকল বিধান সবার উপর সবসময় আবশ্যক থাকে না। সময় ও পরিস্থিতিভেদে হুকুম ভিন্ন হয়। যেমন, ইসলাম নাবালক এর জন্য তার শারঈ বিধানকে আবশ্যক করেনি। এক্ষেত্রে নির্দেশনা হলো, নাবালক বাচ্চাদের দ্বীনী শিক্ষার উপর বড় করা, যাতে করে সাবালক হলে ইসলামের আদেশ মানা তার জন্য সহজ হয়। রোযার বেলায়ও তাদের ক্ষেত্রে একই হুকুম। আমাদের সমাজে নাবালকের রোযা রাখা এবং তার রোযা ফরয হওয়ার বয়স সম্পর্কে কিছু ভুল ধারণা রয়েছে। এ বিষয়ে সঠিক জ্ঞান রাখা প্রয়োজন।

নাবালকের রোযা রাখা

মুসলমান, প্রাপ্তবয়স্ক, বোধশক্তিসম্পন্ন সকল ব্যক্তি শারঈ ওযর ব্যতীত রামাদানের রোযা রাখা ফরয। ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দিলে কবিরা গুনাহ হবে। এই গোনাহের শাস্তি জগতের সবচেয়ে কঠিন শাস্তির চেয়েও কঠিন এবং আরও বেশি সময়জুড়ে। অন্যদিকে নাবালকরা রোযা রাখার আবশ্যক আদেশের বাইরে। তাদের জন্য সাবালক হওয়ার আগ পর্যন্ত অবকাশ রয়েছে। শুধু রোযার ক্ষেত্রে নয়, বরং ইসলামী শরীআতের সকল আবশ্যক হুকুম থেকে তারা ছাড় পায়। এই সময় তাদেরকে ইসলামী শরীআত মানার জন্য প্রস্তুত করা হয়। তাদেরকে বিভিনœ হুকুম আহকাম সম্পর্কে অবগত করা হয়। এতে করে তারা প্রাপ্তবয়স্ক হলে সহজেই শরীআত অনুযায়ী নিজের জীবন পরিচালনা করতে পারে। আল্লামা ইবনু বাত্তাল আল মালিকি (র.) (৪৪৯ হি.) বলেন,

أجمع العلماء أنه لا تلزم العبادات والفرائض إلا عند البلوغ، إلا أن كثيرًا من العلماء استحبوا أن يدرب الصبيان على الصيام والعبادات رجاء بركتها لهم، وليعتادوها، وتسهل عليهم إذا لزمتهم

-উলামারা ঐকমত্য করেছেন যে, বালেগ না হওয়া পর্যন্ত ফরয ও অন্যান্য হুকুম পালন আবশ্যক নয়। তবে অধিকাংশ আলেমগণ বাচ্চাদের বিভিন্ন আমলে অভ্যস্ত করতে এবং পরিণত বয়সে উপনীত হলে শরীআত মানা সহজ করার মানসে ও শিশুদের জন্য বরকত লাভের আশায় তাদেরকে রোযার পাশাপাশি অন্যান্য আমলের প্রশিক্ষণ দেয়া মুস্তাহাব মনে করতেন। (শারহু সহীহিল বুখারী, ৪/১০৭)

এই আবেদন থেকেই অভিভাবকরা বাচ্চাদের প্রশিক্ষণের জন্য মাঝে মাঝে রোযা রাখার তাগিদ দেন। তাই মুসলিম নাবালকরা নয়-দশ বছর বয়সেই রোযা রাখা শুরু করে। আবার প্রায়ই দেখা যায় এর চেয়ে কম বয়সের শিশুরা নিজ ইচ্ছায় রোযা রাখার চেষ্টা করছে। এটা অবশ্যই প্রশংসনীয়। কারণ ছোটবেলার শিক্ষা হল শেকড়তুল্য। আরবী প্রবাদে আছে- الْعِلْمُ فِي الصِّغَرِ كَالنَّقْشِ علي الْحَجَرِ -ছোটবেলার শিক্ষা পাথরে খোদাই করা নকশার মত দীর্ঘস্থায়ী।" অর্থাৎ, ছোটবেলা যে শিক্ষা লাভ করবে, তা মনে থাকবে চিরকাল। এই শিক্ষা ব্যক্তির চলাফেরা, ব্যবহার এবং অভ্যাসে প্রভাব ফেলবে। তাই সচেতনমহল ছোটবেলার সঠিক শিক্ষা আর সঠিক অভ্যাস গড়ার জন্য খুব গুরুত্ব দেন। মেধাবী সন্তানরাও ছোটবেলা থেকে নিজেকে প্রস্তুত করার সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাহাবীরা তাদের সন্তানদের শিশুকাল থেকেই রোযা রাখায় অভ্যস্ত করে তুলতেন। বুখারী শরীফে রুবাইয়ি বিনতু মুআওয়ীয (রা.) থেকে এ সংক্রান্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ আশুরার দিন সকালে আনসারী সাহাবীদের পল্লীতে নির্দেশ দেন, 'যে ব্যক্তি রোযাহীন অবস্থায় আছে, সে যেন দিনের বাকি সময় না খেয়ে কাটায়। আর যে রোযা অবস্থায় আছে, সে যেন রোযা পূর্ণ করে। শেষে বর্ণনাকারী রুবাইয়ি বলেন, فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ، أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ

-এরপর থেকে আমরা আশুরার দিনে রোযা রাখতাম এবং আমাদের ছোট সন্তানদের রোযা রাখাতাম। আমরা বাচ্চাদের জন্য পশমের খেলনা তৈরি করতাম। কোনো বাচ্চা খাবারের জন্য কাঁদলে তাকে খেলনা দিয়ে ইফতার পর্যন্ত শান্ত রাখতাম। (আল-জামিউস সহীহ, হাদীস নং-১৯৬০)

বুখারী শরীফের উপরিউক্ত অধ্যায়ের আলোচ্য পরিচ্ছেদেই দ্বিতীয় খলিফা উমর (রা.) থেকে একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ আছে-

قَالَ عُمَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِنَشْوَانٍ فِي رَمَضَانَ وَيْلَكَ، وَصِبْيَانُنَا صِيَامٌ فَضَرَبَهُ

-উমর (রা.) রামাদানে দিনের বেলা নেশাগ্রস্ত এক ব্যক্তিকে বলেন, তোমার ধ্বংস হোক! তুমি নেশা করছ অথচ আমাদের বাচ্চারাও রোযা রাখছে! পরবর্তীতে উমর (রা.) তাকে শাস্তি দেন। (প্রাগুক্ত, বুখারী)

এখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে অনুসরণীয় যুগ তথা সাহাবীদের যুগে তারা নাবালক সন্তানকে রোযা রাখাতেন এবং সেই সোনালি যুগে বাচ্চারাও রোযা রাখায় অভ্যস্ত ছিল।

নাবালককে রোযা রাখানোর কিছু পদ্ধতি

বাচ্চাদের রোযা রাখানোর ক্ষেত্রে কিছু পদ্ধতি অবলম্বন সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। নাবালক সন্তান রোযা রাখার ইচ্ছা করলে অনেক পরিবারে তাদেরকে সে সুযোগ দেওয়া হয় না। সাহরীতে উঠতে চাইলেও তাদেরকে জাগানো হয় না। সঠিক ধারণার অভাবে ১০ বছর বয়সেও শারীরিক ক্ষতির আশঙ্কায় অভিভাবকরা এমনটা করেন। কিন্তু এই সময় উচিত রোযার ব্যাপারে তাদেরকে আগ্রহী করে তোলা। এ বয়সে শিশুরা এই কষ্ট সহ্য করতে সক্ষম। এ বয়সে মাঝে মাঝে রোযা রাখা তাদের শারীরিক উপকারে আসে। তাদেরকে ছোটোকাল থেকে সংযমী করে তুলে। মুসলিম পরিবারে শিশুদের রোযার ক্ষেত্রে অভিভাবকদের কিছু বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। অভিভাবকরা বাচ্চাদের রোযার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কিছু পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন-

- ❖ বাচ্চাদেরকে রোযা রাখার গুরুত্ব ও ফাদাইল সম্পর্কে অবগত করা।
- ❖ সাহরী ও ইফতারের সময় সাথে রাখা।
- ❖ রোযা রাখার জন্য উৎসাহ প্রদান করা।
- ❖ সাবালক হওয়ার নিকটবর্তী বয়সে মাঝে

মাঝে রোযা রাখার তাকিদ দেওয়া।

- ❖ রোযা রাখতে চাইলে বাধা না দেওয়া।
- ❖ রোযা রাখলে পূর্ণ করার জন্য খেলনা বা অন্য কিছুর মাধ্যমে মন ভুলিয়ে রাখা।
- ❖ সাহরী ও ইফতারের সাওয়াব বর্ণনার পাশাপাশি রোযা রাখলে তাদের পছন্দনীয় খাবারের আয়োজন করা।
- ❖ যদি রোযা রাখার কারণে তাদের শরীর খারাপ হয় কিংবা খুব দুর্বল হয়ে পড়ে, তাহলে খাবার খেতে দেওয়া।

রোযা ফরয হওয়ার বয়স

ইসলামী জীবনব্যবস্থায় দুইভাবে সাবালক হওয়া চিহ্নিত হয়। প্রথমত, শারীরিক বিশেষ পরিবর্তন ও আলামত প্রকাশের মাধ্যমে, এবং দ্বিতীয়ত নির্দিষ্ট বয়সে পদার্পণ করে। শারীরিক বিবেচনায় সাবালক হওয়ার ব্যাপারে হানাফী ফিকহের আলোকে রচিত বিখ্যাত ইসলামী আইনশাস্ত্রীয় কিতাব 'রাদ্দুল মুহতার', যা আমাদের নিকট 'ফাতওয়ায়ে শামী' নামে পরিচিত, সেখানে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। যেমন- ছেলের ব্যাপারে বলা হয়- بُلُوغُ الْغُلَامِ بِالِاحْتِلَامِ وَالْإِحْبَالِ وَالْإِنْزَالِ "ছেলেরা সাবালক হবে স্বপ্নদোষ হওয়া, গর্ভদান করা এবং বীর্য প্রবাহের সক্ষমতা লাভের মাধ্যমে।" মেয়েদের ক্ষেত্রে বক্তব্য হলো- وَالْجَارِيَةِ بِالِاحْتِلَامِ وَالْحَيْضِ وَالْحَبَلِ -আর মেয়েরা সাবালিকা হবে স্বপ্নদোষ, ঋতুস্রাব হওয়া এবং গর্ভধারণ করার মাধ্যমে। আর যদি উপরিউক্ত আলামত প্রকাশ না হয়, তাহলে বয়স দিয়ে বিবেচনা করা হবে। বয়সের ব্যাপারে বক্তব্য হলো-

فَحَتَّى يَتِمَّ لِكُلٍّ مِنْهُمَا خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً بِهِ يُفْتَى

-(আলামত ব্যতীত) ছেলে ও মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রে পূর্ণ পনেরো বছর হতে হবে। এই মতের উপরই ফাতওয়া। (রাদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার, ৬/১৫৩-১৫৪)

কারণ বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ পনেরো বছর বয়সের সন্তানকে প্রাপ্তবয়স্কদের কাতারে গণ্য করেছেন। ফাতওয়ায়ে শামীতেও সে হাদীস আনা হয়। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

عُرِضْنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي وَعُرِضْنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي

-রাসূল ﷺ এর কাছে আমাকে চৌদ্দ বছর বয়সে উহুদ যুদ্ধে শরীক হওয়ার জন্য হাযির করা হলো। কিন্তু রাসূল ﷺ আমাকে জিহাদে শরীক হওয়ার অনুমতি দেননি। আবার পনেরো বছর বয়সে খন্দক যুদ্ধের সময় হাযির করা হলো। অতঃপর রাসূল ﷺ আমাকে জিহাদে শরীক হওয়ার অনুমতি দিলেন। (সহীহ মুসলিম, প্রাগুক্ত রাদ্দুল মুহতার ৬/১৫৩)

সুতরাং শিশুর ক্ষেত্রে উল্লিখিত শারীরিক কোনো এক বৈশিষ্ট্য দেখা দিলেই সে সাবালক। সাধারণত এই আলামতগুলো বারো বছর বয়সের দিকে প্রকাশ পায়। কিন্তু ভৌগলিক কারণ, বংশীয় বৈশিষ্ট্য বা ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে এ বয়সটা আরো বেশি বা কমও হতে পারে। যেমনই হোক, পনেরো বছরের আগে যে বয়সেই আলামতের কোনো একটি প্রকাশ হবে, সে বয়সে, সে সময় থেকেই সাবালক বলে গণ্য হবে। তখন আর বয়সের বিবেচনায় সাবালক হওয়ার অপেক্ষা করা যাবে না। যদি আলামত প্রকাশ না পায়, তাহলে হিজরী সাল তথা চন্দ্র বছরের গণনায় পনেরো বছর পূর্ণ হলে সাবালক হবে। তখন থেকে সে ব্যক্তির জন্য ইসলামের যাবতীয় হুকুম মেনে চলার সাথে সাথে রোযা রাখাও আবশ্যক হবে। এজন্য বুদ্ধিমান নাবালক সন্তানের কর্তব্য হল, নিজের সাবালক হওয়ার বিশেষ আলামত ও বয়সের ব্যাপারে নিজেই বেশি খেয়ালি হয়ে থাকা।

প্রসঙ্গত, প্রাপ্তবয়স্ক হলেও কিছু পরিস্থিতিতে রোযা ছাড়ার আদেশ এবং না রাখার অবকাশ রয়েছে। পুরুষের ক্ষেত্রে, মুসাফির অবস্থায় তথা নিয়ত করে কমপক্ষে ৪৮ মাইল ভ্রমণের যাত্রা করা; পাগল হয়ে যাওয়া; এমন অসুস্থ বা দুর্বল হওয়া, যার দরুণ রোযা রাখা সম্ভব নয় কিংবা রাখলেও বিরাট ক্ষতির আশংকা থাকে; জিহাদে মুজাহিদের অতি দুর্বল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বা তৃষ্ণা এবং ক্ষুধার জ্বালায় জীবন নাশের শংকা থাকা (তখন প্রয়োজনীয় খাবার ভক্ষণ করে রোযা পূর্ণ করবে); কোনো জালিম কর্তৃক হত্যা বা অঙ্গ হানীর হুমকিতে পড়া–এমন পরিস্থিতির স্বীকার ব্যক্তির জন্য রোযা ছাড়ার অবকাশ আছে। মহিলাদের ক্ষেত্রে এর সঙ্গে আরো কিছু অবস্থা যোগ হবে। মহিলাদের মাসিক ঋতুস্রাব তথা পিরিয়ডের (হায়িয) সময় এবং সন্তান জন্মদানের পরবর্তী নিফাসকালীন (যতদিন পর্যন্ত রক্ত নির্গত হবে, তবে সর্বোচ্চ চল্লিশ দিন) মহিলাদের জন্য নামাজ ও রোযা কোনোটাই আদায় না করার আদেশ রয়েছে। মহিলাদের গর্ভকালীন সময়ও ক্ষতির আশংকা থাকলে ছাড় রয়েছে। যদি দুগ্ধদানকারী মহিলা রোযা রাখার হেতু দুগ্ধপানকারী শিশুর শারীরিক ক্ষতির প্রবল সম্ভাবনা থাকে, তখনও ইসলামে এই পরিস্থিতির শিকার মহিলাদের জন্য রোযা না রাখার সুযোগ আছে। (রাদ্দুল মুহতার, ২/৪২১-২৭)

উল্লিখিত সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে রামাদানের পর স্বাভাবিক হালতে ফিরে আসলে প্রতি রোযার জন্য একটি করে কাযা রোযা আদায় করতে হবে। আর যদি কেউ উল্লিখিত কোনো কারণ ছাড়া ইচ্ছাকৃত খেয়ে বা সহবাসের মাধ্যমে রোযা ভঙ্গ করে, তাহলে আবশ্যক হলো কাফফারা আদায় করা। কাফফারা স্বরূপ প্রতি রামাদানের রোযার জন্য একনাগাড়ে ষাটটি রোযা রাখতে হবে। এমনকি যদি কেউ উনষাটটি রাখার পরও ছেড়ে দেয়, তাহলে নিয়ম হল আবার এক থেকে গণনা শুরু করা। অন্যথা ষাটজন অসহায় মানুষকে দুই বেলা করে পেট ভরে খাবার খাওয়াতে হবে।

সকল মুসলমান অভিভাবকদের উচিত শিশুদের দীনি পরিবেশ ও আদর্শের উপর লালনপালন করা। তবেই সে সাবালক হলে ইসলামী নির্দেশনা গ্রহণ করে সহজেই জীবন সাজাতে পারবে। পাশাপাশি পরিণত হবে একজন আদর্শ মানুষে। নতুবা শরীআত মেনে চলা থেকে দূরে থাকবে বা মানতে চাইলেও কষ্টসাধ্য হবে। আল্লাহ তাআলা যেন আমাদেরকে তাঁর এবং তাঁর রাসূল ﷺ এর ভয় ও মহব্বত ধারণ করে ইসলামের পথে অটুট থাকার তাওফীক দেন। আমীন!

সাইমুন
লাইব্রেরী এন্ড স্টেশনারী
এখানে স্কুল-কলেজ-মাদরাসার যাবতীয় পাঠ্যপুস্তক কোরআন শরীফ, ধর্মীয় বই, স্কুলব্যাগ, স্টেশনারী সহ অন্যান্য গিফট সামগ্রী পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় হয়।

পরিচালক: মাওলানা আতাউর রহমান
মোবাইল: ০১৭১৯ ৪২৮০৬৯
শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ
(হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা সংলগ্ন)
সোবহানীঘাট, সিলেট

ইসলামে যাকাতের গুরুত্ব ও সংশ্লিষ্ট মাসাইল

মো. কুতবুল আলম

যাকাত ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি। ঈমান ও সালাতের পর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য ইবাদত হলো যাকাত। 'যাকাত' আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ পবিত্রতা, বৃদ্ধি পাওয়া, বরকত লাভ হওয়া, প্রশংসা করা ইত্যাদি। কুরআন মাজীদ ও হাদীস শরীফে এসব অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

শরীআতের পরিভাষায় 'যাকাত' বলা হয় নিসাব পরিমান সম্পদের মালিক কর্তৃক বছরান্তে তার সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ (শতকরা ২.৫০ টাকা হারে) যাকাতের হকদার ব্যক্তিকে প্রদান করা। নিসাবের মালিক ব্যক্তির উপর যাকাত প্রদান ফরয হওয়ার বিষয়টি শরীআতের অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। এর ফরযিয়াত অস্বীকার করা কুফরী। ইসলামী শরীআতে যাকাতের ফরযিয়াত অস্বীকারকারীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। নিসাব পরিমান সম্পদ এক বছর অতিবাহিত হলে এর উপর যাকাত আদায় করা ফরয। বিনা কারণে যাকাত প্রদানে বিলম্ব করলে গুনাহগার হবে।

কুরআন মাজীদে বহু স্থানে যাকাতের আদেশ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ مَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

-তোমরা সালাত আদায় কর এবং যাকাত প্রদান কর। তোমরা যে উত্তম কাজ নিজেদের জন্য অগ্রে প্রেরণ করবে তা আল্লাহর নিকটে পাবে। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখছেন। (সূরা বাকারা, আয়াত-১১০)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ -তোমরা সালাত আদায় কর, যাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা অনুগ্রহভাজন হতে পার। (সূরা নূর, আয়াত-৫৬)

আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের জন্য 'আজরুন আযীম' তথা মহাপুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে,

وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا

-এবং যারা সালাত আদায় করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রাখে আমি তাদেরকে মহাপুরস্কার দিব। (সূরা নিসা, আয়াত-১৬২)

যাকাতের গুরুত্বপূর্ণ সুফল বর্ণনা করে আল্লাহ তাআলা বলেন,

'তাদের সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করুন, যার দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র করবেন এবং পরিশোধিত করবেন এবং আপনি তাদের জন্য দুআ করবেন। আপনার দুআ তো তাদের জন্য চিত্ত স্বস্তিকর। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।' (সূরা তাওবা, আয়াত-১০৩)

কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতে, যেখানে খাঁটি মুমিনের গুণ ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখিত হয়েছে সেখানে যাকাতের কথা এসেছে অপরিহার্যভাবে। এছাড়াও প্রকৃত পূণ্যশীলদের পরিচয়ে, সৎকর্মপরায়ণদের বৈশিষ্ট্য ও কর্মের তালিকায়, মসজিদ আবাদকারীদের পরিচয়ে, কুরআন মাজীদ কাদের জন্য হিদায়াত ও শুভসংবাদ দাতা এ সকল বর্ণনায় যাকাতের উল্লেখ এসেছে। মোটকথা, এত অধিক গুরুত্বের সাথে যাকাতের বিষয়টি কুরআন মাজীদে এসেছে যে, এটা ছাড়া দ্বীন ও ঈমানের অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না। ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, 'যাকাতের ফরযিয়াতকে যে অস্বীকার করে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়।' (ফাতহুল বারী)

হাদীস শরীফে এসেছে- 'যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন, কিন্তু সে তার যাকাত দেয়নি কিয়ামতের দিন তা বিষধর স্বর্পরূপে উপস্থিত হবে এবং তা তার গলায় পেঁচিয়ে দেওয়া হবে। সাপটি তার উভয়পাশে দংশন করবে এবং বলবে, আমিই তোমার ঐ ধন, আমিই তোমার পুঞ্জিভূত সম্পদ।' -সহীহ বুখারী

যাকাতের নিসাব

কোন স্বাধীন, জ্ঞানবান, প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমান যদি সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা (প্রায় ৬১৩ গ্রাম) অথবা সাড়ে সাত তোলা সোনা (প্রায় ৮৮ গ্রাম) কিংবা এর যে কোনো একটির সমমূল্যের টাকা বা ব্যবসায়িক মালের মালিক হয় তবে এ মালকে শরীআতের পরিভাষায় 'যাকাতের নিসাব' বলা হয়। উক্ত মাল এক বছরব্যাপী তার মালিকানাধীন থাকলে তার উপর যাকাত আদায় করা আবশ্যক হবে। যে ব্যক্তি উপরে উল্লিখিত পরিমাণ সম্পদের মালিক তাকে 'মালিকে নিসাব' বা সাহিবে নিসাব বলা হয়। অবশ্য এ মাল ঋণমুক্ত এবং তার মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত হতে হবে। উক্ত মালের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ (শতকরা ২.৫০) যাকাত হিসেবে প্রদান করতে হবে। (হিদায়া ও আলমগীরী)

স্বর্ণ-রৌপ্যের যাকাত

নিসাব পরিমাণ স্বর্ণ-রৌপ্য কারো মালিকানায় থাকলে এবং তা এক বছর স্থায়ী হলে তার উপর ঐ স্বর্ণ-রৌপ্যের যাকাত আদায় করা ফরয। এ স্বর্ণ-রৌপ্য যে অবস্থায় থাকুক অলংকার আকারে ব্যবহৃত বা অব্যবহৃত, ব্যাংকে বা কারো নিকট গচ্ছিত অথবা ব্যবসায়ী পণ্য হিসেবে মোটকথা যে অবস্থায়ই থাকুক অবশ্যই তার যাকাত আদায় করতে হবে। স্বর্ণ-রৌপ্য নিসাব পরিমাণ বা তার অধিক যে পরিমানই থাকুক তার চল্লিশ ভাগের এক ভাগ হয় ঐ স্বর্ণ-রৌপ্য দ্বারা অথবা তার বাজার মূল্য দ্বারা যাকাত আদায় করতে হবে। (হিদায়া ও আলমগীরী)

কারো নিকট যদি কিছু পরিমাণ স্বর্ণ ও কিছু পরিমাণ রৌপ্য থাকে এবং এর কোন একটিও নিসাব পরিমাণ হয়না সেক্ষেত্রে উভয়টির সম্মিলিত মূল্য যদি রৌপ্যের অথবা স্বর্ণের কোন একটির নিসাব পরিমাণ হয় তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে। এক্ষেত্রে বর্তমান হিসাবে যেহেতু স্বর্ণের মূল্য থেকে রৌপ্যেও মূল্য অনেক কম সেহেতু রৌপ্যের মূল্যই ধর্তব্য হবে। আর উভয়টির সম্মিলিত মূল্য যদি রৌপ্যের নিসাবের সমপরিমাণ না হয় তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে না। (আলমগীরী)

যদি কারো নিকট কিছু পরিমাণ ব্যবসার মাল এবং কিছু পরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্য থাকে এবং কোনটাই পৃথকভাবে নিসাব পরিমাণ না হয় তবে এগুলোর সম্মিলিত মূল্য যদি রৌপ্যের নিসাবের সমপরিমাণ হয় তবে এতে যাকাত

ওয়াজিব হবে। (আলমগীরী)

কারো মালিকানায় যদি সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের মূল্যের সমপরিমাণ টাকা থাকে এবং তা এক বছর অতিবাহিত হয় তবে এ টাকার যাকাত আদায় করতে হবে। (আলমগীরি)

আসবাবপত্রের যাকাত

স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যতীত অন্য যত আসবাব পত্র আছে যেমন- লোহা, পিতল, কাসা, রাং, কাপড়, জুতা, চিনা বাসন, কাঁচের বরতন, ডেগ-ডেগচী, বসবাসের বাড়ি, জমি-জমা, নিজস্ব চলাচলের গাড়ি ইত্যাদি ব্যবহার করা হোক বা ঘরে রাখা হোক এর উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। তবে যদি এগুলো বাণিজ্যিক পণ্য হয়ে থাকে এবং এর মূল্য নিসাব পরিমাণ হয় তাহলে বছরান্তে এর যাকাত আদায় করতে হবে। উল্লেখ্য যে, ব্যবসায়ী আসবাবপত্রের যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে মূল্যের হিসেব ধর্তব্য হবে। (হিদায়া ও আলমগীরী)

ব্যবসায়ী পণ্যের যাকাত

ব্যবসায়ী পণ্য যে প্রকারেরই হোক যদি এর মূল্য স্বর্ণ বা রৌপ্যের নিসাব পরিমাণ হয় এবং এক বছরকাল স্থায়ী হয় তাহলে পূর্ণ মালের (শতকরা ২.৫০) চল্লিশ ভাগের একভাগ যাকাত হিসেবে আদায় করতে হবে। (হিদায়া) ব্যবসায়ী পণ্য বিভিন্ন প্রকারের হলে সবগুলোর সমন্বিত মূল্য নিসাব পরিমাণ হলে বছরান্তে এর যাকাত আদায় করতে হবে। (আলমগীরী)

বাড়ী ও আসবাবপত্রের যাকাত

বসবাসের বাড়ীর উপর যাকাত ফরয হয় না। ভাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে নির্মিত কিংবা ক্রয়কৃত বাড়ী ও দালান কোঠার মূল্যের উপর যাকাত ফরয হয় না। বরং ভাড়া বাবদ যা আয় হয় তাতে যথানিয়মে যাকাত ফরয হয়। সে সব দালান কোঠা বা জমি ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয়-বিক্রয় হয় (বসবাস বা ভাড়ার উদ্দেশ্যে নয়) এসবের মূল্যের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। অনুরূপ আবাস গৃহের আসবাবপত্র ইত্যাদির উপরও যাকাত ফরয হয় না। যে সমস্ত আসবাবপত্র ভাড়া দেওয়া হয় যেমন- দোকান, গাড়ী, রিক্সা, নৌযান, ডেকোরেশনের আসবাবপত্র ইত্যাদির মূল্যের উপর যাকাত ফরয নয়। কারণ এগুলো বিক্রয়ের জন্য নয় বরং ভাড়া দিয়ে অর্থ উপার্জনের জন্য, তাই এগুলোর আয়ের উপর যাকাত ফরয হবে মূল্যের উপর নয়।

ব্যাংকে গচ্ছিত মালের উপর যাকাত

ব্যাংকে গচ্ছিত ও জমাকৃত মাল মূলতঃ ব্যাংক কর্তৃপক্ষের নিকট আমানত। এই অর্থ সম্পদের মালিকের মালিকানা সর্বাবস্থায় বিদ্যমান থাকে এবং ব্যবহারের অধিকারও থাকে। কাজেই ব্যাংকে গচ্ছিত রক্ষিত ও জমাকৃত অর্থ সম্পদের উপর যাকাত ফরয হবে এবং বছরান্তে আদায় করতে হবে। (জাদীদ ফিকহী মাসাইল)

যে সব সম্পদে যাকাত ফরয হয় না

নিজের চলাচলের বাহন ঘোড়ার উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। অবশ্য ঘোড়া যদি ব্যবসার জন্য হয় তাহলে তার মূল্য নিসাব পরিমাণ হলে বছরান্তে যাকাত ফরয হবে। আর যদি নিসাব পরিমাণ না হয় তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে না। (আলমগীরী)।

গাধা, খচ্চর, সিংহ এবং শিকারী কুকুর যদি ব্যবসার জন্য হয় তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে অন্যথায় যাকাত ওয়াজিব হবে না। (আলমগীরী) শুধু উটের বাচ্চা, গাভীর বাচ্চা, এবং বকরীর বাচ্চার উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। বোঝা বহন বা কৃষি কাজে ব্যবহৃত পশু এবং গৃহপালিত পশুর উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। (আলমগীরী)

ওয়াকফকৃত পশু, অন্ধ পশু এবং পা কাটা পশুর উপর যাকাত ওয়জিব নয়। (শামী) যাকাত প্রদানকারী নিসাবের মালিক হওয়ার পূর্বে যাকাত দিলে জায়িয হবে না। অর্থাৎ নিসাবের মালিক হওয়ার পূর্বে যাকাত আদায় করলে নিসাবের মালিক হওয়ার পর ঐ মালের পুনরায় যাকাত আদায় করতে হবে। পূর্বের আদায়কৃত যাকাত গ্রহণযোগ্য হবে না। (শামী ও আলমগীরী)

যাকাত বন্টনের নির্ধারিত ৮টি খাতের বিবরণ

কুরআন মজীদে সূরা তাওবার ৬০ নং আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা যাকাতের ব্যয়ের আটটি খাত নির্ধারিত করে দিয়েছেন। এ খাতসমূহ ছাড়া অন্য কোথাও যাকাত প্রদান করা জায়িয নয়। উক্ত আটটি খাতের বিবরণ নিম্নরূপ-

১। **ফকীর:** ফকীর হলো সেই ব্যক্তি যার নিসাব পরিমাণ সম্পদ নেই। যে ব্যক্তি রিক্ত হস্ত, অভাব মেটানোর যোগ্য সম্পদ নেই, ভিক্ষুক হোক বা না হোক, এরাই ফকীর। যে সকল স্বল্প সামর্থের দরিদ্র মুসলমান যথাসাধ্য চেষ্ট করা সত্ত্বেও বা দৈহিক অক্ষমতাহেতু প্রাত্যহিক ন্যায়সঙ্গত প্রয়োজনটুকু মেটাতে পারে না, তারাই ফকীর। কারও মতে যার কাছে একবেলা বা একদিনের খাবার আছে সে ফকীর।

২। **মিসকীন:** মিসকীন সেই ব্যক্তি যার কিছুই নেই, যার কাছে একবেলা খাবারও নেই। যে সব লোকের অবস্থা এমন খারাপ যে, পরের নিকট সাওয়াল করতে বাধ্য হয়, নিজের পেটের আহারও যারা যোগাতে পারে না, তারা মিসকীন। মিসকীন হলো যার কিছুই নেই, সুতরাং যার কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিসাব পরিমাণ অর্থ সম্পদ নেই, তাকে যাকাত দেয়া যাবে এবং সেও নিতে পারবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, ফকীর বা মিসকীন যাকেই যাকাত দেয়া হবে, সে যেন মুসলমান হয় এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক না হয়।

৩। **আমিলীন বা যাকাত আদায়ে নিযুক্ত কর্মচারী:** ইসলামী সরকারের পক্ষে লোকদের কাছ থেকে যাকাত, উশর প্রভৃতি আদায় করে বায়তুল মালে জমা প্রদান, সংরক্ষণ ও বন্টনের কার্যে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ। এদের পারিশ্রমিক যাকাতের খাত থেকেই আদায় করা যাবে। কুরআনে বর্ণিত আটটি খাতের মধ্যে এ একটি খাতই এমন, যেখানে সংগৃহীত যাকাতের অর্থ থেকেই পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। এ খাতের বৈশিষ্ট্য হলো এতে ফকীর বা মিসকীন হওয়া শর্ত নয়।

৪। **মুআল্লাফাতুল কুলুব (চিত্ত জয় করার জন্য):** এই খাতটি সাহাবায়ে কিরামের ঐকমত্যের মাধ্যমে রহিত হয়ে গেছে।

৫। **ক্রীতদাস বা বন্দি মুক্তি:** এ খাতে ক্রীতদাস-দাসী বা বন্দি মুক্তির জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে। অন্যায়ভাবে কোন নিঃস্ব ও অসহায় ব্যক্তি বন্দি হলে তাকেও মুক্ত করার জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে।

৬। **ঋণগ্রস্থ:** এ ধরণের ব্যক্তিকে তার ঋণ মুক্তির জন্য যাকাত দেয়ার শর্ত হচ্ছে- সেই ঋণগ্রস্থের কাছে ঋণ পরিশোধ পরিমাণ সম্পদ না থাকা। অথবা যে ব্যক্তি এমন ঋণগ্রস্থ যে, ঋণ পরিশোধ করার পর তার কাছে নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে না তাকে যাকাত দেয়া যাবে। আবার কোন ইমাম এ শর্তারোপও করেছেন যে, সে ঋণ যেন কোন অবৈধ কাজের জন্য- যেমন মদ কিংবা না জায়িয প্রথা অনুষ্ঠান ইত্যাদির জন্য ব্যয় না করে।

৭। **আল্লাহর পথে:** সম্বলহীন মুজাহিদের যুদ্ধাস্ত্র/সরঞ্জাম উপকরণ সংগ্রহ এবং নিঃস্ব ও অসহায় গরীব দ্বীনি শিক্ষারত শিক্ষার্থীকে এ খাত থেকে যাকাত প্রদান করা যাবে। এ ছাড়াও ইসলামের মাহাত্ম ও গৌরব প্রচার ও প্রসারের কাজে নিয়োজিত থাকার কারণে যারা জীবিকা অর্জনের অবসর পান না এবং যে আলিমগণ দ্বীনি শিক্ষাদানের কাজে ব্যাপৃত থাকায় জীবিকা অর্জনের অবসর পান না। তারা অসচ্ছল হলে সর্বসম্মতভাবে তাদেরকেও যাকাত দেয়া যাবে।

৮। অসহায় মুসাফির: যে সমস্ত মুসাফির অর্থ কষ্টে নিপতিত তাদেরকে মৌলিক প্রয়োজন পূরণ হওয়ার মত এবং বাড়ি ফিরে যেতে পারে এমন পরিমাণ অর্থ যাকাত থেকে প্রদান করা যায়। কোনো ব্যক্তি নিজ বাড়িতে নিসাব পরিমাণ সম্পদের অধিকারী, কিন্তু সফরে এসে অভাবে পড়ে গেছে বা মাল-সামান চুরি হয়ে গেছে এমন ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া যাবে। তবে এ ব্যক্তির জন্য শুধু প্রয়োজন পরিমাণ গ্রহণ করাই জায়িয, এর বেশি নয়।

যাকাত আদায়ের প্রক্কালে নিম্নবর্ণিত দিকসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী:

যে ব্যক্তির কাছে যাকাতযোগ্য সম্পদ অর্থাৎ সোনা-রুপা, টাকা-পয়সা, বাণিজ্যদ্রব্য ইত্যাদি নিসাব পরিমাণ আছে সে শরীআতের দৃষ্টিতে ধনী। তাকে যাকাত দেয়া যাবে না।

যাকাতের টাকা যাকাতের হকদারদের নিকট পৌঁছে দিতে হবে। যাকাতের নির্ধারিত খাতে ব্যয় না করে অন্য কোনো জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হলে যাকাত আদায় হবে না। যেমন রাস্তা-ঘাট, পুল নির্মাণ করা, কুপ খনন করা, বিদ্যুত-পানি ইত্যাদির ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

যাকাতের টাকা দ্বারা মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণ করা, ইসলাম প্রচার, ইমাম-মুআযযিনের বেতন-ভাতা দেওয়া, ওয়ায মাহফিল করা, দ্বীনি বই-পুস্তক ছাপানো, ইসলামী মিডিয়া তথা রেডিও, টিভির চ্যানেল করা ইত্যাদিও জায়িয নয়। মোটকথা, যাকাতের টাকা এর হকদারকেই দিতে হবে। অন্য কোনো ভালো খাতে ব্যয় করলেও যাকাত আদায় হবে না।

যাকাত আদায় হওয়ার জন্য শর্ত হলো, উপযুক্ত ব্যক্তিকে মালিক বানিয়ে দেওয়া। যাতে সে নিজের খুশি মতো তার প্রয়োজন পূরণ করতে পারে। এরূপ না করে যদি যাকাতদাতা নিজের খুশি মতো দরিদ্র লোকটির কোনো প্রয়োজনে টাকাটি খরচ করে যেমন, তার ঘর সংস্কার করে দিল, টয়লেট স্থাপন করে দিল কিংবা পানি বা বিদ্যুতের ব্যবস্থা করল তাহলে যাকাত আদায় হবে না। যাকাতের টাকা দরিদ্র ব্যক্তির মালিকানায় দিয়ে দিতে হবে। এরপর যদি সে নিজের খুশি মতো এসব কাজেই ব্যয় করে তাহলে যাকাতদাতার যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

আত্মীয়-স্বজন যদি যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত হয় তাহলে তাদেরকে যাকাত দেয়াই উত্তম। ভাই, বোন, ভাতিজা, ভাগনে, চাচা, মামা, ফুফু, খালা এবং অন্যান্য আত্মীয়দেরকে যাকাত দেওয়া যাবে। প্রদানের সময় যাকাতের উল্লেখ না করে মনে মনে যাকাতের নিয়ত করলেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে। এ ধরনের ক্ষেত্রে এটাই উত্তম।

নিজ পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী, পরদাদা প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ যারা তার জন্মের উৎস তাদেরকে নিজের যাকাত দেয়া জায়িয নয়। এমনিভাবে নিজের ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনী এবং তাদের অধস্তনকে নিজ সম্পদের যাকাত দেয়া জায়িয নয়। স্বামী এবং স্ত্রী একে অপরকে যাকাত দেয়া জায়িয নয়।

বাড়ির কাজের ছেলে বা কাজের মেয়েকে যাকাত দেয়া জায়িয যদি তারা যাকাত গ্রহণের উপযুক্ত হয়। তবে কাজের পারিশ্রমিক হিসেবে যাকাতের অর্থ দিলে যাকাত আদায় হবে না।

কোনো লোককে যাকাতের উপযুক্ত মনে হওয়ায় তাকে যাকাত দেয়া হল, কিন্তু পরবর্তীতে প্রকাশ পেল যে, লোকটির নিসাব পরিমাণ সম্পদ রয়েছে তাহলেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে। পুনরায় যাকাত দিতে হবে না। তবে যাকে যাকাত দেওয়া হয়েছে সে যদি জানতে পারে যে, এটা যাকাতের টাকা ছিল সেক্ষেত্রে তার ওপর তা ফেরৎ দেওয়া ওয়াজিব।

যাকাত দেওয়ার পর যদি জানা যায় যে, যাকাত-গ্রহীতা অমুসলিম ছিল তাহলে যাকাত আদায় হবে না। পুনরায় যাকাত দিতে হবে। অপ্রাপ্তবয়স্ক (বুঝদার) ছেলে-মেয়েকে যাকাত দেওয়া যাবে।

রঙ প্রিন্টার্স
-একটি নতুন সৃষ্টির চিন্তাধারা

আমাদের সেবাসমূহ

ম্যাগাজিন, ভাউচার, আইডি কার্ড, ব্যানার, ক্যালেন্ডার, খাম, প্যাড, ফ্যাস্টুন, পোস্টার, চালান বই, স্টিকার, গেঞ্জি প্রিন্ট, লিফলেট, আমন্ত্রণ কার্ড, চাঁদা রশিদ, মগ প্রিন্ট, ক্যাশ মেমো, ভিজিটিং কার্ড, লেভেল, যাবতীয় ছাপা কাজ।

পিয়ার মাহমুদ, স্বত্বাধিকারী, মোবা: ০১৭১৮ ৩৩৬৮৫৫
আহসান মাহমুদ, পরিচালক, মোবা: ০১৭৪২ ৬২৭৮৭৯
হোসেন মাহমুদ, পরিচালক, মোবা: ০১৭৬৫ ৩৬১৯৬২

৩১৭, রংমহল টাওয়ার (৩য় তলা), বন্দর বাজার, সিলেট।
E-mail: rangprinter@gmail.com

বাংলা জাতীয় মাসিক
পরওয়ানা

“ঈমান, আমাল ও আকীদা বিষয়ক আপনার যেকোনো প্রশ্ন আজই পরওয়ানার অনুকূলে পাঠিয়ে দিন।???

জীবন জিজ্ঞাসা বিভাগে
প্রশ্ন করুন

প্রশ্ন করার নিয়ম
- শুধুমাত্র প্রশ্নের মূল কথাগুলো লিখে পাঠাতে হবে
- ই-মেইল অথবা ডাকযোগে প্রশ্ন পাঠাতে পারবেন

প্রশ্ন পাঠানোর ঠিকানা
অফিস: বি.এন টাওয়ার (৯ম তলা), ২৮/১ বি, দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
সিলেট বিভাগীয় অফিস: পরওয়ানা ভবন-৭৪, শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ, সোবহানীঘাট, সিলেট
E-mail: parwanabd@gmail.com

ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শন ও যাকাত ব্যবস্থা

মারজান আহমদ চৌধুরী

ইসলামের অর্থনৈতিক দর্শন

ইসলামী অর্থনীতি হচ্ছে ইসলামী শরীআহ প্রদত্ত কিছু অর্থনৈতিক নীতিমালা, যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর বান্দাহদের ইহকালীন জীবনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও আখিরাতের সাফল্য লাভের জন্য নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহর কিতাব ও আল্লাহর নবী e এর সুন্নাতে মানবজীবন পরিচালনার যে সামষ্টিক নির্দেশনা রয়েছে, অর্থনৈতিক নীতিমালা তার মধ্যে একটি। যেহেতু অর্থনীতি ইসলামী জীবনব্যবস্থার-ই অংশ, তাই ইসলামী শরীআহর মূল সূত্রসমূহে (কুরআন-হাদীস) আলাদাভাবে অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করা হয়নি। বরং অর্থের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার জন্য কিছু মূলনীতি প্রদান করা হয়েছে।

আদর্শগত দিক থেকে ইসলামী অর্থনীতির দুটি ধারা রয়েছে। একটি Spiritual তথা রূহানী ধারা, যা অনুশীলন করা কারও ওপর আবশ্যক নয়। বরং এটি ইসলামী জীবনযাপনের সর্বোচ্চ শিখর। যাতে একজন মুসলমান সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় আরোহণ করে। আরেকটি ধারা হচ্ছে Legal তথা আইনী ধারা, যা অনুশীলন ও পরিপালন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর আবশ্যক। এটি ইসলামী জীবনযাপনের সর্বনিম্ন শেকড়। যার নিচে নামলেই ব্যক্তি হারামের মধ্যে পতিত হবে। আইনী ধারা সম্পদ অর্জন ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোনোরূপ কড়াকড়ি আরোপ করে না, যদি আয় ও ব্যয় হালাল পন্থায় হয় এবং নির্ধারিত যাকাত ও অন্যান্য আবশ্যিক সাদকাহ প্রদান করা হয়। আইনী ধারাটি পালন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যক। স্বেচ্ছায় পালন না করলে জোরপূর্বক পালন করানোর অধিকার ইসলামী রাষ্ট্রের রয়েছে। অপরদিকে রূহানী ধারা হচ্ছে, নিতান্ত প্রয়োজনের অধিক সম্পদ অর্জন না করা। অথবা প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা থাকে, সবই আল্লাহর সন্তুষ্টি জন্য বিলিয়ে দেওয়া। রূহানী ধারাটি একজন মুসলমান সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় পালন করবে। এখানে আবশ্যকীয়তা কিংবা জোরজবরদস্তি প্রবেশ করলে রূহানিয়্যাতের সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়। উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ

-আর তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে, তারা কী ব্যয় করবে? বলুন, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সবকিছু। (সূরা বাকারা, আয়াত-২১৯)

উক্ত আয়াতে যে ব্যয়ের কথা বলা হয়েছে, সেটি আবশ্যক ব্যয় নয়। বরং স্বেচ্ছায় ব্যয়। এ পদ্ধতি অনুসরণ করাই ইসলামের রূহানী ধারা। অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

-তোমরা নামায কায়িম করো, যাকাত প্রদান করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হতে পারো। (সূরা নূর, আয়াত-৫৬)

এ আয়াতে যে ব্যয়ের (যাকাত) কথা বলা হয়েছে, তা আবশ্যক। এটি স্বেচ্ছায় হোক, জোরপূর্বক হোক পালন করতেই হবে। নির্ধারিত সম্পদের মালিককে বছরান্তে নির্ধারিত পরিমাণ যাকাত প্রদান করতেই হবে। মোটকথা, ইসলামী অর্থনীতির আইনী ধারা হচ্ছে, হালাল পন্থায় সম্পদ অর্জন করা এবং নির্ধারিত আবশ্যিক ব্যয় যথাযথভাবে আদায় করা। নির্ধারিত ব্যয় নির্বাহ করার পর বাকি সম্পদ মালিকের কর্তৃত্বে থাকবে, চাই তা পাহাড়সম হোক না কেন। অপরদিকে রূহানী ধারা হচ্ছে, এত সম্পদ সঞ্চয় না করা, যাতে যাকাত প্রদান করা আবশ্যক হয়ে যায়। বরং প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা কিছু থাকবে, সবই অন্যের প্রাপ্য। প্রসঙ্গত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এ রূহানী পরিসরেই তাঁর পুরো জীবন কাটিয়েছেন। আল্লাহর নবী ﷺ কখনও যাকাত প্রদান করেননি। কারণ যাকাত প্রদান করার জন্য নির্ধারিত সম্পদ কখনও তাঁর কাছে জমা হয়নি। উপরন্তু আল্লাহর নবী ﷺ এর জীবনে এমন দিনও অতিবাহিত হয়েছে, যখন তাঁর ও তাঁর পরিবারের নিতান্ত প্রয়োজনই পূরণ হয়নি।

প্রখ্যাত আলিমে দ্বীন ও দার্শনিক ড. ইসরার আহমদ (১৯৩২-২০১০) ইসলামী অর্থনীতির এ দুটি ধারাকে বর্তমান যুগে প্রচলিত দুটি অর্থনৈতিক ধারা, তথা পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংজ্ঞায়ন করেছেন। তিনি বলেছেন, ইসলামী অর্থনীতির রূহানী ধারা Spiritual Socialism বা আধ্যাত্মিক সমাজতন্ত্রের এক উচ্চমার্গীয় রূপ। অপরদিকে ইসলামী অর্থনীতির আইনী ধারা হচ্ছে Controlled and Managed Capitalism তথা পুঁজিবাদের একটি নিয়ন্ত্রিত ও ব্যবস্থাপিত রূপ। এ সংজ্ঞায়ন এজন্য করা হয়েছে যে, নিকট অতীতে পুঁজিবাদ ও সমাজবাদ নিজ নিজ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। কোনটি সফল আর কোনটি বিফল, সেদিকে আমরা যাচ্ছি না। তবে এ দুটি ধারার সাথে সামঞ্জস্যতা রেখে সংজ্ঞায়ন করলে বুঝতে সুবিধা হবে, তাই এ প্রচেষ্টা।

মৌলিক দর্শনের বিচারে ইসলামী অর্থনীতি পুঁজিবাদ (Capitalism) ও সমাজবাদ (Socialism) থেকে অনেকটাই ভিন্ন; যদিও ব্যবহারিক দিক থেকে উভয়ের সাথে এর অনেকটা মিলও রয়েছে। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সাথে ইসলামী অর্থনীতির সামঞ্জস্য এই যে, ইসলাম ও সমাজবাদ উভয়েই রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে জনসাধারণের মৌলিক প্রয়োজনীয়তা পূরণ করার দাবি করে। সমাজতন্ত্র সেটি কীভাবে এবং কতটুকু করেছে, সে তর্কে আমরা যাচ্ছি না। তবে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় নাগরিকদের জীবনধারণের মৌলিক উপাদান (كفالة عامة) প্রদান করার আবশ্যকীয়তা রয়েছে। আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) এর খিলাফতকালে এ আদর্শের যথার্থ বাস্তবায়ন দেখা গিয়েছিল। বস্তুত, ইসলামী অর্থনীতির রূহানী ধারা সমাজতন্ত্রের সাথে অনেকটাই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

অপরদিকে সমাজতন্ত্রের মধ্যে যে অযাচিত কড়াকড়ি দেখা যায়, ইসলামে সেরকম অযাচিত বলপ্রয়োগ নেই। সমাজতন্ত্রে পুঁজিকে স্তব্ধ করে রাখা হয়। উৎপাদনের উপকরণের একচ্ছত্র মালিকানা চলে যায় রাষ্ট্রের হাতে। এর ফলে জনসাধারণের মধ্যে শ্রম দেওয়ার উৎসাহ (Incentive) মরে যায়। ফলে উৎপাদন হ্রাস পায়, দারিদ্র অনিবার্য হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তি-মালিকানাকে মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়। পুঁজির কোনো লাগাম থাকে না। ফলে প্রায় সমস্ত সম্পদ পুঁজিপতিদের করতলগত হয়ে যায়। ইসলাম এ ধরনের এককেন্দ্রিক ব্যবস্থাকে অপছন্দ করে। আল্লাহ বলেছেন,

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ

-যেন সম্পদ কেবল তোমাদের মধ্যকার ধনাঢ্যদের মধ্যে কুক্ষিগত না হয়। (সূরা হাশর, আয়াত-৭)

ইসলাম পুঁজিকে স্তব্ধ করেনি। পুঁজিবাদের ন্যায় ইসলামও পুঁজিকে ছেড়ে দেয়। তবে ইসলাম পুঁজিকে নিয়ন্ত্রণ (Control) ও ব্যবস্থাপনা (Manage) করে। যাতে প্রতিযোগিতা বহাল থাকে, আবার লাগামহীন প্রতিযোগিতা না হয়। এটি সমাজতন্ত্রের মতো

সর্ব-নিয়ন্ত্রক নয়। কিছু শর্ত পূরণ করা সাপেক্ষে ইসলামী অর্থনীতি বাজারকে (Market) খুলে দেয়, উৎপাদনকে উৎসাহ প্রদান করে, শ্রমের ইচ্ছাকে বাঁচিয়ে রাখে। ইসলামী অর্থনীতি হালাল-হারামের পার্থক্য সূচনা করার মাধ্যমে পুঁজিকে Control তথা নিয়ন্ত্রণ করে। সুদ, জুয়া, কালোবাজারি, মজুতদারী ও ফটকাবাজিকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে। পুঁজির চেয়ে শ্রমকে এবং সঞ্চয়ের চেয়ে বিনিয়োগকে অধিক উৎসাহ প্রদান করে, যেন উৎপাদনের অভাব দেখা না দেয়। ফলে পুঁজি নিয়ন্ত্রিত থাকে, আবার স্তব্ধও হয় না। এতে দেখা যায় যে, ইসলামী অর্থনীতিতে একটি সুস্থ প্রতিযোগিতা চলমান। আবার এ প্রতিযোগিতায় যারা পিছিয়ে পড়ে, তাদেরকে অর্থব্যবস্থার মূলধারার সাথে সংযুক্ত করার জন্য ইসলাম যাকাতের বাধ্যবাধকতা রেখেছে। যাকাত অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যাওয়া গোষ্ঠীর সাথে পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীর একটি চমৎকার সমতা বা সামঞ্জস্য তৈরি করে। এভাবে ইসলাম পুঁজিকে Manage তথা ব্যবস্থাপনা করে।

পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের সাথে ইসলামী অর্থনীতির মূল পার্থক্যের জায়গা হচ্ছে সম্পদের মালিকানাতত্ত্ব। সম্পদ তথা উৎপাদনের উপকরণ কার মালিকানায় থাকবে, সেটি অর্থনীতির মৌলিক আলোচ্য বিষয়। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় সম্পদ তথা উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা থাকে ব্যক্তির হাতে। ব্যক্তি একে ব্যবহার করে ইচ্ছেমতো উৎপাদন ও মুনাফা অর্জন করতে পারে। অধিক মুনাফা লাভের আশায় ব্যক্তি শ্রম দিয়ে যায়, যার ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। আবার সমাজবাদী অর্থব্যবস্থায় সম্পদ তথা উৎপাদনের উপকরণের একচ্ছত্র মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে। এখানে ব্যক্তির অধিকার নির্দিষ্ট এবং সীমাবদ্ধ। এর ফলে সমাজবাদী অর্থব্যবস্থায় শ্রমের উদ্দীপনা থাকে না, ফলে উৎপাদন হ্রাস পায়। অপরদিকে ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পদের মালিকানা চূড়ান্তভাবে ব্যক্তির হাতেও নয়, আবার একচ্ছত্রভাবে রাষ্ট্রের হাতেও নয়। বরং ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পদের মূল মালিকানা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার হাতে নিহিত। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে- لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ -যা কিছু রয়েছে আসমানসমূহে, যা কিছু যমীনে এবং এতদুভয়ের মধ্যখানে এবং যা কিছু ভূগর্ভস্থ, সবকিছু তাঁরই। (সূরা ত্বাহা, আয়াত-০৬)

অপর আয়াতে বলা হয়েছে-

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ

-কত জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি, যার বাসিন্দারা নিজেদের ভোগ সম্পদের দম্ভ করত। এগুলোই তো তাদের ঘরবাড়ি। তাদের পরে এখানে খুব কম লোকজন বসবাস করেছে। আর আমিই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী। (সূরা কাসাস, আয়াত-৫৮)

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় মানুষ বা রাষ্ট্র সম্পদের মূল মালিক (Absolute Owner) নয়; বরং আমানতদার (Sacred Trustee)। এ আমানত মানুষ তার রবের পক্ষ থেকে লাভ করেছে। অতএব সম্পদ যেহেতু রবের পক্ষ থেকে প্রদত্ত আমানত, তাই মানুষ এ আমানত তথা সম্পদকে তার রবের সন্তুষ্টির বিপরীত কোনো কাজে ব্যবহার করতে পারে না। মানুষ যখন একে অপরের কাছে সম্পদের মালিকানা হস্তান্তর করে, তখন কেবল ব্যবহারের অধিকার হস্তান্তর করা হয়। মূল মালিকানা যেহেতু মানুষের হাতে নয়, তাই এটি সংরক্ষণ করা কিংবা হস্তান্তর করার প্রশ্ন আসে না। মালিকানার ক্ষেত্রে এ মৌলিক পার্থক্য ইসলামী অর্থনীতিকে ভোগবাদী অর্থনীতির গহ্বর থেকে বের করে কল্যাণমুখী অর্থনীতিতে পরিণত করেছে। এখানে ব্যক্তি তার মালিকানার দোহাই দিয়ে সম্পদের যথেচ্ছা ব্যবহারও করতে পারে না, আবার রাষ্ট্র জোরপূর্বক ব্যক্তির সম্পদের ওপর থেকে ব্যক্তির ব্যবহারের অধিকারকেও কেড়ে নিতে পারে না। ইসলামী অর্থনীতিতে ভারসাম্য বজায় থাকে।

প্রসঙ্গত একটি কথা জেনে রাখা আবশ্যক যে, ইসলামী অর্থনীতির একমাত্র চারণভূমি হলো ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা। প্রচলিত পশ্চিমা ধাচের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় ইসলামী অর্থনীতির পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। কারণ প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হয় জনগণ (Democracy), নয়তো রাজা-বাদশা (Monarchy), নয়তো একটি দল বা গোষ্ঠী (Oligarchy)। অপরদিকে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতা আল্লাহর হাতে নিহিত, আর মানুষ আল্লাহর খলিফা। সার্বভৌম ক্ষমতা (Sovereignty) যেহেতু আল্লাহর হাতে, তাই খলীফা হিসেবে মানুষ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ-নিষেধ অমান্য করতে পারে না। আইন-কানুন যখন প্রণীত হয়, সেগুলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের ভেতরেই প্রণীত হয়। খিলাফতের এ চেতনাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুম পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়ন করার নিশ্চয়তা প্রদান করে। অতএব ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা না করে অন্যত্র ইসলামী অর্থনীতির পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন নেহায়েত অসম্ভব।

ইসলামী অর্থনীতিতে যাকাতের অবস্থান

ইসলামী অর্থব্যবস্থার যে দুটি ধারা আমরা আলোচনা করলাম, তন্মধ্যে যাকাত ইসলামী অর্থনীতির আইনি ধারার মূল উপাদান, যেহেতু রূহানী ধারার জীবনযাপনে যাকাতের প্রশ্ন আসে না। ইসলামী অর্থনীতি যাকাতের মাধ্যমে পুঁজিকে Manage তথা ব্যবস্থাপনা করে। যাকাত Bridge between the gap তথা শূন্যস্থান পূরণকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার ফলে সমাজে ধনী ও দরিদ্র পরিচয়ে যে দুটি শ্রেণির জন্ম হয়, যাকাত এদের মধ্যকার ফাটলকে যথেষ্ট পূর্ণ করে দেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ যাকাত গ্রহণের নির্দেশ দেওয়ার সময় স্পষ্ট করে বলেছেন,

أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

-আল্লাহ তাদের ওপর যাকাত ফরয করেছেন, যা তাদের বিত্তশালীদের নিকট হতে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের অভাবগ্রস্তদের মাঝে বিতরণ করা হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

যাকাতের পরিচয় ও প্রয়োজনীয়তা

যাকাত ইসলামের মূল স্তম্ভসমূহের মধ্যে একটি স্তম্ভ, যা আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের মধ্যে সামর্থবানদের ওপর ফরয করেছেন। পবিত্র কুরআনে ঈমান ও নামাযের পর যাকাতের বিধান সর্বাধিক গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ

-যারা ঈমান আনে, নেক আমল করে, নামায কায়িম করে এবং যাকাত প্রদান করে তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট প্রতিদান রয়েছে। (সূরা বাকারা, আয়াত-২৭৭)

একইসাথে, যাকাত প্রদান না করার ফলশ্রুতিতে যে মর্মন্তুদ শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে, তা-ও বলে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন,

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُم بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

-আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যা তোমাদেরকে দিয়েছেন, তাতে যারা কৃপণতা করে তারা যেন কিছুতেই মনে না করে যে, এটি তাদের জন্য মঙ্গল। না, এটি তাদের জন্য অমঙ্গল। যে সম্পদে তারা কৃপণতা করেছে, কিয়ামতের দিন তা-ই তাদের গলায় বেড়ি দেওয়া হবে। আসমান ও যমীনের স্বত্তাধিকার একমাত্র আল্লাহরই। তোমরা যা করো আল্লাহ তা বিশেষভাবে অবগত। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১৮০)

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

-পাঁচটি বিষয়ের উপর ইসলামের বুনিয়াদ রাখা হয়েছে। সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল, নামায কায়িম করা, যাকাত প্রদান করা, আল্লাহর ঘরের হজ্জ করা এবং রামাদানের রোযা পালন করা। (বুখারী ও মুসলিম)

একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের মালিক যদি ওই পরিমাণ নিসাবের মালিক থাকা অবস্থায় এক বছর পূর্ণ করে, তবে তার সম্পদের চল্লিশ ভাগের একভাগ তথা ২.৫% নির্ধারিত খাতে দান করে দেওয়ার নাম যাকাত। শর্ত হচ্ছে, ব্যক্তিকে সম্পদের বৈধ মালিক হতে হবে, সম্পদ নিসাব পরিমাণ হতে হবে এবং এক বছর হাতে থাকতে হবে। তাছাড়া ব্যক্তিকে অবশ্যই মুসলমান হতে হবে, সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন হতে হবে, স্বাধীন ও সাবালক হতে হবে। অমুসলিম, নাবালক বা পাগলের ওপর যাকাত ফরয নয়। যাকাতের নিসাব হচ্ছে সাড়ে সাত তুলা স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন তুলা রৌপ্য অথবা তৎসমপরিমাণ সম্পদ। যাকাতে আয়-ব্যয়ের কোনো পরিসংখ্যান হিসাব করা হয় না। বরং বছরান্তে হাতে থাকা মোট সম্পদ যদি নিসাব পরিমাণ হয়, তবে এর ওপরই ২.৫% যাকাত ধার্য করা হয়। এক বছর যদি সম্পদ দশ লাখ হয়, তবে এ দশ লাখের ওপরই যাকাত ফরয হবে। পরের বছর ব্যবসায় লোকসান হয়ে যদি সম্পদ পাঁচ লাখে চলে আসে, তাহলে সেই পাঁচ লাখের ওপর যাকাত ফরয হবে। এ দুই বছরে সম্পদের মালিক কতটুকু আয় করলেন আর কতটুকু ব্যয় করলেন, যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে এর কোনো হিসাবই আসবে না। হাতে যখন যা আছে, যদি নিসাব পরিমাণ হয়, তাহলেই বছরান্তে যাকাত ফরয হয়ে যাবে। যাকাতের সাথে প্রচলিত আয়করের পার্থক্য এই জায়গায়। আয়করে আয়-ব্যয় হিসেব করা হয়, যাকাতে কেবল হস্তগত সম্পদ বিবেচনা করা হয়। ঘর-বাড়ি, খাদ্যদ্রব্য, দোকানপাট, অফিস-আদালত ইত্যাদির ওপর যাকাত ধার্য হয় না। শুধু নগদ অর্থ, স্বর্ণ-রৌপ্য তথা অলংকার, গবাদিপশু, ব্যবসায়িক পণ্য, ব্যাংক ব্যালেন্স ইত্যাদির ওপর যাকাত ফরয হয়। এছাড়া ফসলের যাকাত আলাদাভাবে ধার্য হয়, যাকে উশর বলা হয়। যাকাত প্রদান করার জন্য নির্ধারিত ৮টি খাত রয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ এ খাতসমূহের কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ বলেছেন,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

-নিশ্চয়ই সাদকাহ হলো ফকির, মিসকিন ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারী ও যাদের মন জয় করা উদ্দেশ্য, তাদের জন্য এবং দাসমুক্তি ও ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে (ব্যয় করার জন্য) এবং মুসাফিরের জন্য। এটি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ফরয। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সূরা তাওবাহ, আয়াত-৬০)

প্রসঙ্গত বনূ হাশিম ও তাঁদের মাওলা তথা ক্রীতদাসরা যাকাত গ্রহণ করতে পারেন না। যেহেতু বনু হাশিম রাসূলুল্লাহ ﷺ এর গোত্র, তাই তাঁদের জন্য যাকাত গ্রহণ করা হারাম।

যাকাত একটি ফরয ইবাদত এবং এর আবশ্যকীয়তা নিয়ে প্রশ্ন করারও সুযোগ নেই। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ e মুআয ইবনে জাবালকে ইয়েমেনে প্রেরণ করার সময় বলেছিলেন,

إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ

-অচিরেই তুমি আহলে কিতাবদের এক গোত্রের কাছে যাচ্ছ। তাদের কাছে পৌঁছে তুমি তাদেরকে শাহাদাতের দাওয়াত দেবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল। তারা যদি তোমার কথা মেনে নেয়, তখন তাদেরকে এ কথা জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাদের ওপর দিনে ও রাতে পাঁচবার নামায ফরয করেছেন। তারা তোমার কথা মেনে নিলে তুমি তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাদের ওপর যাকাত ফরয করেছেন, যা তাদের বিত্তশালীদের নিকট হতে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের অভাবগ্রস্তদের মাঝে বিতরণ করা হবে। যদি তারা তোমার কথা মেনে নেয়, তাহলে (যাকাত গ্রহণকালে) তাদের সম্পদের উৎকৃষ্টতম অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে। (বুখারী ও মুসলিম)

ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী বলেছেন,

الزكاة أمر مقطوع به في الشرع يستغني عن تكلف الاحتجاج له وإنما وقع الاختلاف في بعض فروعه وأما أصل فرضية الزكاة فمن جحدها كفر

-যাকাত শরীআতের এমন এক অকাট্য বিধান, যে সম্পর্কে দলীল-প্রমাণের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। যাকাত সংক্রান্ত কিছু কিছু মাসআলায় ইমামদের মধ্যে মতভিন্নতা থাকলেও মূল বিষয়ে অর্থাৎ যাকাত ফরয হওয়া সম্পর্কে কোনো মতভেদ নেই। যাকাতের আবশ্যকীয়তাকে যে অস্বীকার করে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়। (ফাতহুল বারী, ৩/৩০৯)

যাকাতের মাধ্যমে কেবল ধনী-গরীবের মধ্যকার শূন্যস্থান-ই পূরণ করে না; বরং যাকাত অর্থের প্রবহণকেও (Circulation of wealth) গতি দান করে। যাকাতের ফলে অর্থ কুক্ষিগত হওয়া থেকে রক্ষা পায় এবং সমাজের সব শ্রেণির মধ্যে অর্থের প্রবহণ নিশ্চিত হয়।

এছাড়াও, যাকাত ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। ধনী ব্যক্তি যখন তার সমাজের দরিদ্র ব্যক্তির কাছে যাকাতের অর্থ প্রদান করে, তখন সে অর্থ দরিদ্র ব্যক্তির ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। যদি একটি সমাজের ৫০% মানুষ যাকাত গ্রহণের যোগ্য হন, আর তাদেরকে যাকাত না দেওয়া হয়, তাহলে এরা বাজারে অপাংক্তেয় হয়ে পড়বে। ফলে বাকি ৫০% যে পণ্য উৎপাদন করবে, তার ক্রেতা হবে কেবল তারাই। কারণ বাকি ৫০% মানুষের তো সেই ক্রয়ক্ষমতাই নেই যে, এদের উৎপাদিত পণ্য ক্রয় করতে পারে। যাকাত এ অসমতাকে পূরণ করে দেয়। ফলে বাজার গতিশীলতা পায়, উৎপাদিত পণ্য অধিকহারে হস্তান্তর হয় রাষ্ট্রব্যবস্থা যদি ইসলামী রাষ্ট্র হয়, তাহলে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে জনগণের কাছ থেকে যাকাত গ্রহণ ও বণ্টন করা। যদি সুষ্ঠুভাবে ব্যবস্থাপনা করা যায়, তাহলে যাকাত, উশর ও খারাজ থেকে এত বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতে আসা সম্ভব যে, ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকদের জীবনধারণের মৌলিক উপাদান (كفالة عامة) প্রদান করার জন্য রাষ্ট্রের আর কোনো ট্যাক্স আদায় করার প্রয়োজনই থাকবে না।

সামনে রামাদান মাস আসছে। যদিও আমাদের দেশে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত নয়, তবুও আমরা ব্যক্তিগত অথবা সম্মিলিতভাবে যাকাত প্রদান করার মাধ্যমে আমাদের সমাজকে দারিদ্রমুক্ত করতে পারি। যাকাত এমন একটি ইবাদত, যার সরাসরি উপকারিতা আমরা পার্থিব জীবনে চোখের সামনে দেখতে পাই। প্রয়োজন শুধু সদিচ্ছার, প্রয়োজন শুধু সুব্যবস্থাপনার।

ইয়ামানে মানবিক সংকট যুদ্ধ বন্ধের ডাক

রহমান মোখলেস

মাঝে মাঝেই দক্ষিণ থেকে ছুটে আসা ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাত আর উড়ে আসা ড্রোন হামলায় প্রকম্পিত হয়ে ওঠে সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদ অথবা দেশটির অন্য কোনো শহর বা অঞ্চল। আগুন জ্বলে বিভিন্ন স্থাপনায় ও তেলক্ষেত্রে। এ ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন আসে ইয়ামান থেকে। ইয়ামানের হুতি বিদ্রোহীরা এ ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ে। ড্রোন হামলাও হুতিদের। অনেক সময় এ ক্ষেপণাস্ত্র গুলি করে ভূপাতিত করে সৌদি আরব। আর সৌদি আরব থেকেও একইভাবে ইয়ামানে ছুটে যায় সৌদি জোটের যুদ্ধ বিমান। নির্বিচারে চলে বোমা বর্ষণ হুতিদের অবস্থান লক্ষ্য করে। আর অনেক সময়ই তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে প্রাণহানি ঘটে বেসামরিক লোকজনের। এভাবেই চলছে গত ছয় বছর ধরে। কিন্তু কারা এই হুতি? আর কেনই বা এ লড়াই?

কারা এই হুতি?

আসলে ইয়ামানে এ লড়াইয়ের শুরু হয় 'আরব বসন্ত' দিয়ে। কিন্তু কি এই 'আরব বসন্ত'? ২০১০ সালের ১৭ ডিসেম্বর নিজের গায়ে আগুন জ্বেলে বিপ্লবের মশাল জ্বেলেছিলেন তিউনিসিয়ার যুবক বাওয়াজিজি। তৎকালীন তিউনেশিয়ার শাসক জয়নাল আবেদিন বেন আলীর আমলে দুর্নীতি, বেকারত্ব, রাজনৈতিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে ছিল এই বিদ্রোহ। আর আরব দেশগুলিতে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েমে এই বিদ্রোহে ছিল পশ্চিমা দেশগুলোর ইন্ধন। ক্রমে এই বিদ্রোহের আগুন আরব বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে। তিউনিসিয়ার পর মিসর, লিবিয়া, ইয়ামান, বাহরাইন ও সিরিয়া। বিদ্রোহের আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে যায় দেশগুলো। এই বিদ্রোহে পতন ঘটে তিউনেশিয়ার শাসক জয়নাল আবেদীন বেন আলীর, পতন ঘটে লিবিয়ার একসময়ের 'সবুজ বিপ্লবের' নায়ক এবং পরবর্তীতে 'স্বৈরশাসক' কর্নেল মুয়াম্মার গাদ্দাফীর, পতন ঘটে মিসরের লৌহমানব হোসনী মুবারকের। আর এই 'আরব বসন্তে'র হলকা ছড়িয়ে পড়ে ইয়েমনেও। দেশ ছেড়ে পালান ইয়ামানের প্রেসিডেন্ট আলী আবদুল্লাহ সালেহ। কিন্তু গত ছয় বছরেও দেশগুলো কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি। বরং ঘটেছে উল্টোটা। আজও গৃহযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত ইয়ামান, লিবিয়া ও সিরিয়া। শান্তি আসেনি তিউনেশিয়া ও মিসরেও। ইয়ামানে 'আরব বসন্তের' শুরু ২০১১ সালে। এ বছরেই প্রচণ্ড বিক্ষোভের মুখে দেশটির দীর্ঘদিনের প্রেসিডেন্ট আলী আবদুল্লাহ সালেহকে তাঁর ডেপুটি আবদ-রাব্বু মানসুর হাদীর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধ্য করা হয়। ইয়ামানে টানা ৩৩ বছর ক্ষমতায় ছিলেন আবদুল্লাহ সালেহ। কিন্তু প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণের পর হাদীকে অনেকগুলো সংকটের মুখোমুখি হতে হয়। আল কায়েদার হামলা, দক্ষিণে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন, সালেহের প্রতি অনেক সামরিক কর্মকর্তার আনুগত্য। এছাড়া ইয়ামান তখন আগের সরকারের রেখে যাওয়া দুর্নীতি, খাদ্যাভাব ও বেকারত্বের উচ্চ হারে জর্জরিত। এই সুযোগে দেশটির শিয়া হুতিরা নতুন করে বিদ্রোহ শুরু করে। নতুন প্রেসিডেন্ট হাদীর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইয়ামানের উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশ এবং এর আশপাশের এলাকা দখল করে নেয় হুতিরা। ইয়ামানের অবস্থা এখন আরও ভয়ানক। তথাকথিত 'আরব বসন্তের' একযুগ পরও দেশে শান্তির লেশ নেই। কেবল যুদ্ধ আর যুদ্ধ। একদিকে দেশটিতে সক্রিয় আইএস ও তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী আল-কায়েদা। অন্যদিকে শিয়া সম্প্রদায়ের বিদ্রোহী হুতি গোষ্ঠী। হাদী ক্ষমতা গ্রহণের পর হুতিরা হাদী সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে। রাজধানী সানাসহ দেশটির এক বড় অংশ এখন তাদের দখলে। প্রেসিডেন্ট হাদী রাজধানী সানা ছেড়ে এডেনে তাঁর শাসনতান্ত্রিক সদর দপ্তর স্থাপন করেন। হুতিরা সানায় নিজেদের অবস্থান ধরে রেখেছে এবং সেখান থেকেই সৌদি আরবে মর্টার আর ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ে মারছে। চালাচ্ছে ড্রোন হামলা। আবদুল্লাহ সালেহের মতো এক পর্যায়ে প্রেসিডেন্ট মনসুর হাদীও দেশ থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। হাদীর সমর্থনে এগিয়ে আসে সৌদি আরব। হুতিরা একদিকে এডেন ভিত্তিক মনসুর হাদীর সরকার উৎখাতে লড়াই, অন্যদিকে সৌদি আরবে হামলা চালিয়ে আসছে। সৌদি জোটও হুতিদের অবস্থান লক্ষ্য করে ফেলছে বোমা।

সৌদি আরব যেভাবে জড়িয়ে পড়ে ইয়ামান যুদ্ধে

ইয়ামানে হাদীর দুর্বল সরকার এবং হুতি বিদ্রোহীদের মধ্যে সংঘাতের শুরু ২০১৪ সালে। আর হুতি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সৌদি নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা সেনা সমর্থিত জোটের অভিযান শুরু হয় ২০১৫ সালে। প্রেসিডেন্ট মনসুর হাদীর সমর্থনে সৌদি নেতৃত্বাধীন এ জোটের ইয়ামানে অভিযান। ২০১৫ সালের মার্চ মাসে জোট ইয়ামানে বিমান থেকে বোমাবর্ষণ শুরু করে। নির্বাসনে থেকেই হাদী এই অভিযানে সমর্থন দেন। সৌদি আরবের মূল লক্ষ্য হুতি বিদ্রোহীদের উৎখাত। সৌদি আরবের আশঙ্কা, হুতি বিদ্রোহীরা ইয়ামান দখল করলে শিয়া নেতৃত্বাধীন ইরানের অনুগত হয়ে যাবে।শিয়া শাসনাধীন ইরান হচ্ছে সুন্নি শাসনাধীন সৌদি আরবের বড় আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বী। অন্যদিকে হুতিদের সমর্থনে এগিয়ে আসে ইরান। অভিযোগ রয়েছে হুতিদের অস্ত্র ও ড্রোন দিয়ে সহায়তা করছে ইরান। সংযুক্ত আরব আমিরাতেরও সমর্থন পাচ্ছে হুতিরা। আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকেরা মনে করেন, ইয়ামানে চলা যুদ্ধ এক অর্থে ইরান ও সৌদি আরবের যুদ্ধ।দিনে দিনে ইয়ামানে সংঘাতের

তীব্রতা বৃদ্ধি পায় যখন সৌদি আরব ও আটটি আরব দেশের জোট হুতি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে বিমান হামলা শুরু করে। এর আগে সৌদি সরকার অন্য আরব দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে হস্তক্ষেপের এমন অভিযোগ থাকলেও এই প্রথম তারা একটি আরব দেশের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। সৌদি যুবরাজ মুহাম্মদ বিন সালমানই সৌদি নীতিতে এ ধরনের বড় পরিবর্তন নিয়ে আসেন। এভাবেই সৌদি আরবের ইয়ামান যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার সূচনা। আর এতে সৌদি সরকার এতদিন পশ্চিমা দেশগুলোর সমর্থন ও অস্ত্র সহযোগিতা দুইই পেয়েছে। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের। যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স এতে সমর্থন দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ও ডোনাল্ড ট্রাম্প সরাসরি সৌদির পক্ষ নেয় এবং দেশটিতে অস্ত্র বিক্রি বাড়ায়। ২০১৫ সালে প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা সৌদি নেতৃত্বাধীন জোটের অভিযানে সমর্থন দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এর একটি কারণ ছিল, ইরানের সাথে পরমাণু চুক্তির কারণে সৃষ্ট যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্র সৌদি আরবের ক্ষোভ সামাল দেওয়া। একই ভূমিকা নেয় ব্রিটেন ও ফ্রান্সও। ব্রিটেনও সৌদিতে অস্ত্র বিক্রি বাড়ায়। কিন্তু আজ ছয় বছরেও সৌদি সরকার মনসুর হাদীকে ইয়ামানের ক্ষমতায় বসাতে পারেনি। বরং দিনে দিনে হুতিদের হামলা আরও তীব্র হয়েছে। আর ইয়ামানে বছরের পর বছর ধরে এই যুদ্ধের কারণে মূল্য দিতে হচ্ছে দেশটির সাধারণ মানুষকে। ইতিমধ্যে দেশটিতে এক লক্ষ ১০ হাজার লোক নিহত হয়েছেন। নিহতদের ৬৫ শতাংশের মৃত্যুর কারণ সৌদি নেতৃত্বাধীন জোটের ফেলা বোমা। আর বাকিদের মৃত্যুর কারণ হুতি বিদ্রোহীরা। আঞ্চলিক ও ভূরাজনৈতিক কারণে সৌদি আরব চায় ইয়ামানে তার সমর্থিত সরকার। ভূরাজনৈতিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ এই দেশটি যদি হুতি তথা বিরোধীদের হাতে চলে যায় তা হলে কিছুটা কোণঠাসা হয়ে পড়বে সৌদি আরব। এছাড়া লোহিত সাগর ও এডেন উপসাগরের মাঝখানে দেশটির অবস্থান। এই নৌপথ দিয়েই বিশ্বের সিংহভাগ তেলবাহী জাহাজ চলাচল করে। তাই ইয়ামান যার নিয়ন্ত্রণে থাকবে, তার পক্ষে তেলসম্পদের ওপর খবরদারিও সহজ হবে। ঠিক এই কৌশলগত কারণেই ইয়ামান সবার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

ইয়ামানে মানবিক সংকট

জাতিসংঘের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী ইয়ামান এখন শতাব্দীর সবচেয়ে বড় দুর্ভিক্ষ ও মানবিক বিপর্যয়ের মুখে। জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস বহুবার বলেছেন, সাম্প্রতিক দশকে যুদ্ধের কারণে বিশ্বের মধ্যে ইয়ামানে সবচেয়ে বড় মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে। বাড়ি-ঘর ছেড়ে হাজার হাজার ইয়েমেনি জনগণ উদ্বাস্তু হয়ে দিন কাটাচ্ছে আশ্রয় শিবিরে। খাদ্য সংকট চরমে। দেশ জুড়ে বিরাজ করছে দুর্ভিক্ষ। ইয়ামানের ৮০ শতাংশ অর্থাৎ আড়াই কোটি মানুষের মানবিক সহায়তা ও সুরক্ষা প্রয়োজন। এই ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় কাটাতে বিশ্বের সহযোগিতা চেয়েছে জাতিসংঘ। সেখানে জনসংখ্যার ৮০ শতাংশই মানবিক সহায়তায় বেঁচে আছে। সেভ দ্য চিলড্রেন ও ইউনিসেফের মতে সেখানে অধিকাংশ শিশু, নারী ও পুরুষ অপুষ্টির শিকার। এছাড়া প্রাণ বাঁচাতে ঘর ছেড়েছে দেশটির প্রায় অর্ধকোটি মানুষ। যুদ্ধের কারণে সেখানে কোনো ত্রাণসহায়তা পাঠাতে পারছেনা রেড ক্রিসেন্ট ও আন্তর্জাতিক ত্রাণসহায়তাগোষ্ঠী। ইউএনডিপির দেওয়া সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, বর্তমান গৃহযুদ্ধ যদি ২০২২ সাল পর্যন্ত চলে, তবে ইয়ামান পরিণত হবে পৃথিবীর সবচেয়ে দরিদ্র দেশে। বর্তমানে দেশটিতে সবচেয়ে দুর্ভোগে রয়েছে শিশুরা। কংকালশার দেহ, ক্ষুধা আর পুষ্টিহীনতার চরম শিকার এই শিশুরা। ন্যূনতম মানবিক সহায়তা থেকেও বঞ্চিত শিশুরা। সাহায্য সংস্থাগুলোর হিসেব মতে বর্তমানে জরুরি ভিত্তিতে দেশটিতে ২ কোটি ৪০ লাখ মানুষের ত্রাণ সহায়তা প্রয়োজন। যুদ্ধের কারণে আন্তর্জাতিক ত্রাণ সংস্থাগুলো প্রয়োজনীয় ও জরুরি ত্রাণসহায়তা সেখানে পৌঁছাতে পারছে না।

ইন্টারন্যাশনাল রেসকিউ কমিটি (আইআরসি) বলছে, এই অবস্থা অব্যাহত থাকলে চলতি বছর পরিস্থিতির আরও ভয়াবহ অবনতি হতে পারে। সম্প্রতি সংস্থাটি ২০২১ সালে যেসব দেশের জরুরি ত্রাণ সহায়তা প্রয়োজন তার একটি তালিকা প্রকাশ করেছে। এতে দেখা যায়, বর্তমানে সবচেয়ে মানবিক সংকটে রয়েছে ইয়ামান। এর পরই অবস্থান আফগানিস্তানের। তারপর অবস্থান সিরিয়ার। আর এই তিনটি দেশই মুসলিম।

ইয়ামান যুদ্ধ বন্ধে জাতিসংঘের আহ্বান

ইয়ামান যুদ্ধ শুরুর পর থেকে জাতিসংঘ যুদ্ধ বন্ধ এবং আলোচনার মাধ্যমে সংকট নিরসনের আহ্বান জানিয়ে আসছে সৌদি যুবরাজ মুহাম্মদ বিন সালমানের প্রতি। করোনা মহামারি শুরু হলে যুদ্ধের কূটনৈতিক সমাধানের জন্য সৌদি যুবরাজের প্রতি আহ্বান জানান জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস। তিনি বলেছেন, এখন যুদ্ধ বন্ধ করে করোনাভাইরাস মোকাবিলার উপায় খুঁজতে হবে সবাইকে। লিবিয়া, সিরিয়া এবং ইয়ামানে যুদ্ধ বন্ধ করে করোনা পরিস্থিতি কীভাবে মোকাবিলা করা যায় তার দিকে এখন মনোনিবেশ করা উচিত। তিনি বলেন, করোনাভাইরাসের হুমকি সমস্ত যুদ্ধ-সংঘাতের চেয়ে বড় হুমকি। এদিকে মানবিক সহায়তা পৌঁছাতে জাতিসংঘ মানবাধিকার সংস্থা ও রেডক্রিসেন্ট ও মানবাধিকার কর্মীরাও যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানিয়েছে। এছাড়া গত ডিসেম্বরে ২০২১ সালের মধ্যে ইয়ামান সরকার ও ইরান সমর্থিত হুতি বিদ্রোহীদের যুদ্ধবিধ্বস্ত ইয়ামানের সংকট নিরসনে সংঘাত বন্ধের আহ্বান জানান জাতিসংঘের বিশেষদূত মার্টিন গ্রিফিতস। এতদিন কোন পক্ষই এসব তেমন আমলে নেয়নি। তবে সম্প্রতি সৌদি আরব শর্তাধীনে এক নতুন যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব উপস্থান করেছে। এছাড়া ইয়ামানে মানবিক সহায়তা প্রদানের জন্য জাতিসংঘকে বিভিন্ন সময়ে অর্থ দিয়ে এসেছে সৌদি সরকার।

যুদ্ধ বন্ধের ডাক বাইডেনের

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সম্প্রতি ইয়ামান যুদ্ধ বন্ধের জন্য সৌদি আরবের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি সৌদিতে অস্ত্র বিক্রিও বন্ধের ঘোষণা দিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিতে এ এক বড় পরিবর্তন। বাইডেন বলেন, ইয়ামান যুদ্ধে সৌদি আরবের কাছে অস্ত্র বিক্রিসহ সকল সমর্থন প্রত্যাহার করেছেন তিনি। কারণ এই যুদ্ধ মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। এই যুদ্ধের অবসান করতে হবে। বাইডেন ইয়ামানে বিশেষ দূত হিসেবে টিমুথি লেনডারকিংকে নিয়োগ দিয়ে বলেন, এই দূত জাতিসংঘের যুদ্ধ বিরতি প্রচেষ্টা এবং সরকার ও হুতি বিদ্রোহীদের মধ্যে শান্তি আলোচনায় সহায়তা করবে। তিনি বলেন, যুদ্ধের অবর্ণনীয় দুর্দশায় থাকা ইয়ামানের জনগণের কাছে মানবিক সহায়তা পৌঁছানো নিশ্চিত করতে যুক্তরাষ্ট্র কাজ করবে। এছাড়া বাইডেন হুতিদেরকে যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাসীদের কালো তালিকা থেকে মুক্ত করেছে। তবে এর পরই দুই শীর্ষ হুতি নেতাকে ফের কালো তালিকাভুক্ত করেছে। তবে ইয়ামানে যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি ইয়ামানে ১৯ কোটি ১০ লাখ মার্কিন ডলারের সহায়তার ঘোষণা দিয়েছে। একই সাথে নতুন মার্কিন প্রশাসন বলেছে, 'শুধু সাহায্য দিলে সংঘর্ষ থামবে না। যুদ্ধ বন্ধ হলেই কেবল ইয়ামানে

মানবিক সংকটের শেষ হতে পারে। এদিকে বাইডেনের যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান সত্ত্বেও ইরান সমর্থিত হুতি বিদ্রোহীদের মোকাবিলায় ইয়ামান সরকারেকে সামরিক ও রাজনৈতিক সহযোগিতা দেওয়া অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে সৌদি আরব। আর ইরান জানিয়েছে, ইয়ামান সংকট সমাধানে আন্তর্জাতিক মহলের যেকোনো পদক্ষেপকে সমর্থন করবে তেহরান।

যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব সৌদির

এতদিন সৌদি আরব যুদ্ধবিরতিতে সাড়া না দিলেও গত ২২ মার্চ যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিয়েছে দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফয়সাল বিন ফারহান আল সৌদ। এতে সৌদি আরব বলেছে, চলমান সংঘাতের অবসান ঘটাতে ইরান-সমর্থিত হুথি বিদ্রোহীদেরও যুদ্ধবিরতি এবং রাজনৈতিক সমঝোতাসহ চুক্তিসহ চুক্তিতে আসতে হবে।

সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, যদি হুথি বিদ্রোহীরা উদ্যোগের শর্তগুলো মানতে সম্মত হয়, তাহলে সৌদি আরবও জাতিসংঘ-পর্যবেক্ষণাধীন দেশটিতে (ইয়ামান) যুদ্ধবিরতি মেনে চলবে। তবে হুতির গোষ্ঠীটির এক কর্মকর্তা এই উদ্যোগটিকে 'গুরুতর বা নতুন নয়' বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

এই মুহূর্তে যা প্রয়োজন

মানব ইতিহাসের অন্যতম প্রাচীন বসতির দেশ ইয়ামান। ইসলামের আলোও দেশটিতে দ্রুত পৌঁছায়। কিন্তু সেই ইয়ামান এখন গৃহযুদ্ধে ও সৌদি মিত্র জোটের হামলায় পুরোপুরি বিপর্যস্ত। বছরের পর বছর ধরে হাদীর সমর্থনে সৌদি নেতৃত্বাধীন জোট বিমান হামলা চালিয়েও হুতিদের হটাতে কিংবা হাদীকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনতে পারেনি। আন্তর্জাতিক বিশ্লেষক মহল মনে করে ইয়ামানের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সুরক্ষায় অবিলম্বে সকল পক্ষকে যুদ্ধ বন্ধ করে কূটনৈতিক সমাধানের পথে আসা উচিৎ। জাতিসংঘের উদ্যোগে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের মতো পার্থক্য নিরসন করে বাস্তবসম্মত পথে এগিয়ে আসতে হবে বর্তমান ইয়ামান সরকার ও হুতি বিদ্রোহীদের।একই সঙ্গে সৌদি জোটকে হামলা বন্ধ করতে হবে। সরকারের সমর্থক বাহিনী ও হুতি বিদ্রোহীদের সংঘর্ষেরও ইতি টানতে হবে। কিন্তু সবাই চাইলেও বিবদমান কোনো পক্ষেরই যুদ্ধ বন্ধের উদ্যোগ নেই। কে জানে সামনে ইয়ামানের জনগণের ভাগ্যে আরও কত দুর্ভোগ অপেক্ষা করছে?

পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনে ঝুলন্ত বিধানসভার আশঙ্কা

পরওয়ানা ডেস্ক:

ভারতের পশ্চিমবঙ্গে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচন শুরু হয়েছে গত ২৭ মার্চ। দফায় দফায় ২৯৪ আসনের নির্বাচন শেষে পূর্ণাঙ্গ ফলাফল প্রকাশ হবে মে মাসের ২ তারিখ। পশ্চিমবঙ্গে গত কয়েক বছর ধরে ৩৪ বছরের শাসক বামফ্রন্ট ও তার আগের শাসকদল অন্যতম বৃহত্তম জাতীয় দল কংগ্রেস অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে। গত দশ বছরের পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল তৃণমূলের সাথে পাল্লা দিয়ে ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে যাচ্ছে উগ্র হিন্দুত্ববাদী ও কেন্দ্রীয় শাসকদল বিজেপি।

এই পরিস্থিতিতে এককালের প্রধান দুই প্রতিপক্ষ বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস এবার জোটবদ্ধ হয়ে লড়ছে, সাথে জোটসঙ্গী করে নিয়েছে ফুরফুরার পীরযাদা আব্বাস সিদ্দিকীর প্রতিষ্ঠিত নতুন দল আইএসএফকে। বাম-কংগ্রেস-আইএসএফ জোটের নেতৃবৃন্দ এবার ত্রিমুখী লড়াইয়ের দাবি করলেও তৃণমূল ও বিজেপির দাবি- এবারের নির্বাচনের মূল লড়াই হতে যাচ্ছে তাদের দুই দলের মধ্যে, বাম-কংগ্রেসধ-আইএসফের সংযুক্ত মোর্চাকে তারা কার্যত কোন গুরুত্বই দিচ্ছেন না।

তবে নির্বাচনী জরিপ ও বিশ্লেষকদের মতে, তৃণমূল এবার বিজেপি থেকে এগিয়ে থাকলেও খুব পিছিয়ে নেই বিজেপিও। বিজেপি এবার যে কোন উপায়ে বাংলা দখল করতে চায়, এমনটাই মত বিশ্লেষকদের। আর সে জন্য মমতাকে আটকাতে খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী থেকে শুরু করে বিজেপির সর্বভারতীয় সব গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দ নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ নির্বাচনের ক্যাম্পেইনের দায়িত্ব।

পশ্চিমবঙ্গে সরকার গঠন করতে হলে থাকতে হবে ১৪৮টি আসন। সিএনএক্স অপিনিয়ন পোলসহ বিভিন্ন জরিপে দেখা যাচ্ছে, কোন দলই এককভাবে ১৪৮ আসন দখল করতে সক্ষম হবে না। এরকমটা হলে শেষ পর্যন্ত বিজেপি-তৃণমূল দুই দলই মুখিয়ে থাকবে সংযুক্ত মোর্চার সমর্থন লাভের আশায়।

বিশ্লেষকদের মতে, এরকম পরিস্থিতিতে বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস সরাসরি কাউকে সমর্থন না করলেও তারা চাইবে অন্তত বিজেপিকে ঠেকাতে তৃণমূলই আবার ক্ষমতায় আসুক। সেক্ষেত্রে তাদের জোটসঙ্গী আব্বাস সিদ্দিকী হয়তো ২ মে এর পর বিজেপি ঠেকাতে আবার তৃণমূলের হাত ধরতে পারেন। অবশ্য এবারের নির্বাচনে তৃণমূলের গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দ যেভাবে দলবদল করে বিজেপিতে পাড়ি জমাচ্ছেন, ২ মে এর পর বিজয়ী তৃণমূল বিধায়কদের কেউ কেউ এরকম করে বসেন কিনা, সে আশঙ্কাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না বিশ্লেষকরা। সেক্ষেত্রে তৃণমূলের জন্য শেষ হাসি হাসাটা কঠিনই হয়ে পড়বে বলা চলে। কথায় আছে, রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই। এবারের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন যেন সে কথাটিই বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছে।

উজবেকিস্তানে ওলী-আউলিয়ার পাশে

মারজান আহমদ চৌধুরী

প্রাচ্যে রত্ন সমরকন্দে আমাদের অবস্থানের পালা শেষ হলো। আমাদের যাত্রা এবার তিরমিয শহরে। সকাল ৮টায় গাড়িতে চড়লাম। প্রায় সারাদিন কেটে গেল গাড়িতে। প্রশস্ত রাস্তাঘাট, খানাখন্দ নেই বললেই চলে, ট্রাফিক জ্যামও দেখা যায় না। তবুও গাড়িগুলো চলে শামুকের গতিতে। বসতে বসতে ক্লান্ত হয়ে একেকবার উঠে দাঁড়াই। ওমনি সাথে থাকা ট্যুর গাইড দৌড়ে আসে। বলে, বসে পড়। তোমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আমাদের দায়িত্ব। আমি কালকে গাইডকে বললাম, শুনো আমরা সেই জাতি, যারা প্রয়োজনমতো পুরো দেশের মানুষ একটি রেলগাড়িতে চড়ে বসতে পারি। এই বিছানার মতো রাস্তায় শামুকের গতিতে চলা গাড়িতে আমার দেশের দুই বছরের বাচ্চা ফুটবল খেলতে পারবে।

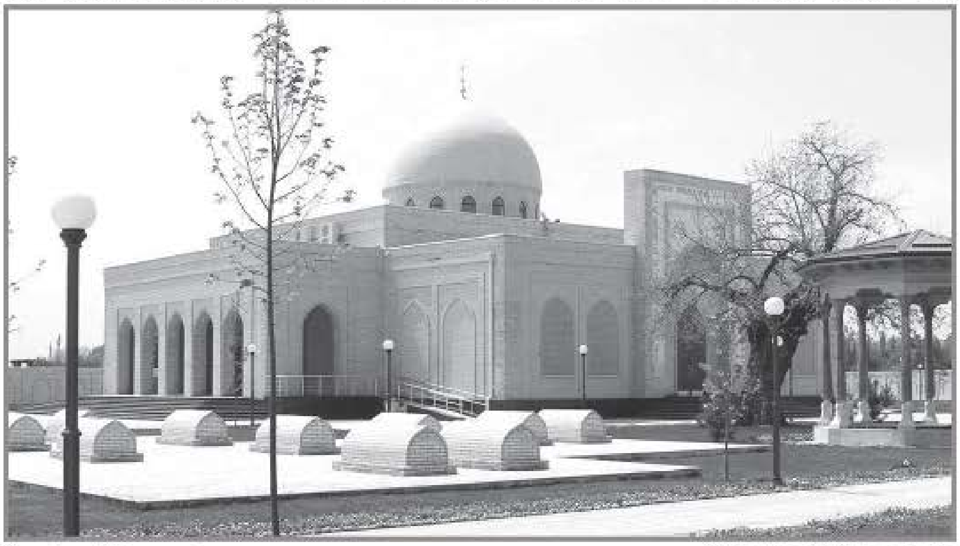

সত্যিই আমাদের পুরো সফরে গাড়িগুলোর স্পিড কখনও ৬০-এর ওপরে উঠেনি। তার ওপর চারটি বাস, চারটি মাইক্রোবাস, দুটি কার, একটি এম্বুলেন্স এবং আগে পিছে পুলিশের এস্কোর্ট। একজন যাত্রী হাঁচি দিলেই পুরো বহর থেমে যায়। সবাই বাস থেকে নামে, কী হয়েছে দেখার জন্য। এদের সবাইকে জড়ো করে আবার বাসে তুলতে আরও আধঘন্টা সময় চলে যায়। বাস ছেড়ে দেওয়ার পর দেখা যায় দুই-তিনজন কোথা থেকে দৌড়ে আসছেন। চোখ বন্ধ করে বলে দেওয়া যায়, এরা বাঙালি।

দুপুরে পৌঁছালাম কাশকাদারিয়া। উরঘুদ পর্বতমালা দিয়ে ঘেরা তাজিকিস্তান সীমান্ত সংলগ্ন এলাকা এই কাশকাদারিয়া। সবুজ তৃণভূমির ওপর পাহাড়ের নীলাভ ছায়া পড়ে এক অদ্ভুত সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে। মনে হয়, পরিচিত পৃথিবী নয়; অন্য কোথাও চলে এসেছি। ভাবি, এই দুরদেশে কারা বসবাস করে? কী তাদের পরিচয়? এক মানবজাতি, আর কত বৈচিত্র তাদের মধ্যে!

যুহরের নামায শেষে ইমাম আবু মুঈন আন-নাসাফী (র.) এর কবর যিয়ারত করলাম। তিনি আকাইদে নাসাফীর লেখক নন; তিনি অন্যজন। খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা হলো একটি ধাবার মতো জায়গায়। উজবেক প্লাভ (পোলাও), সাথে ভেড়ার মাংস। নানা দেশের নানা ভাষার নানা বর্ণের মানুষ একত্রে বসে খেলাম। কেউ ব্রিটিশ, কেউ আরব, কেউ ফ্রেঞ্চ, কেউ ফিলিপিনীয়, আবার কেউ উপমহাদেশের। ইসলাম সবাইকে এক ছাতার নিচে নিয়ে এসেছে। খাওয়া যতটা না আনন্দের, তার চেয়ে বেশি আনন্দ ছিল ওই মেলবন্ধনে।

খাওয়া শেষে আবার গাড়িতে চড়লাম। পাহাড়ের চূড়াঘেষা পথ ভেঙ্গে টানা পথ চললাম দক্ষিণ দিকে। রাত ১১টায় এসে পৌঁছালাম সুনান আত-তিরমিযীর সংকলক ইমাম আবূ ঈসা আত-তিরমিযী (র.) এর কবরে। তাঁর কবর তিরমিয শহরে নয়। তিরমিয থেকে ৬০ কিলোমিটার উত্তরে, শেরোবদ নামক এলাকায়। সত্যি কথা বলতে, আমরা তখন এতো বেশি ক্লান্ত ছিলাম যে, যিয়ারতের আবেগ মরে গিয়েছিল। কিন্তু ইমাম তিরমিযীর কবরের পাশে দাঁড়ানো মাত্র ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। এতদিন ধরে যার পরিশ্রমের ফসল ভোগ করেছি, আজ এসে দাঁড়িয়েছি সেই মহাত্মার সামনে। হৃদয়টি শ্রদ্ধায় ভরে গেল। ক্লান্তি, ক্ষুধা সব ছাপিয়ে মনের কোণে জমে থাকা সীমাহীন কৃতজ্ঞতা অশ্রুর রূপ ধারণ করে চোখ বেয়ে বেরিয়ে এলো।

২০৯ হিজরীতে ইমাম তিরমিযী জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ৭০ বছর বয়সে, ২৭৯ হিজরীতে ইলমুল হাদীস ও আরবী ভাষাবিজ্ঞানের এ মহান ইমাম বুগ পল্লীতে ইন্তিকাল করেন। ইমাম তিরমিযী ছিলেন অসাধারণ এবং বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তির অধিকারী। এ বিষয়ে শাহ আবদুল আযীয দেহলভী 'বুসতানুল মুহাদ্দিসীন' কিতাবে একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। ইমাম তিরমিযী কোনো এক মুহাদ্দিসের কাছ থেকে ইযাযতস্বরূপ হাদিসের দুটি পাণ্ডুলিপি লাভ করেছিলেন। অর্থাৎ ওই মুহাদ্দিস তাঁকে পাণ্ডুলিপি দুটিতে লিপিবদ্ধ হাদীসগুলো বর্ণনা

করার অনুমতি দিয়েছিলেন। কিন্তু ইমাম তিরমিযীর আকাঙ্ক্ষা ছিল পাণ্ডুলিপি দুটির বিষয়ে সরাসরি উস্তাদের কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়া। একবার এক সফরে ওই উস্তাদের সঙ্গে ইমাম তিরমিযীর সাক্ষাৎ হলে তিনি নিজের বাসনার কথা তাঁকে জানান। উস্তাদ বললেন, ঠিক আছে পাণ্ডুলিপি দুটি নিয়ে এসো। ইমাম তিরমিযী নিজ বাসস্থানে গিয়ে তালাশ করে পাণ্ডুলিপি পেলেন না। তিনি বুঝতে পারলেন হাদীসের পাণ্ডুলিপি বাড়িতে রয়ে গেছে, তার পরিবর্তে তিনি সাদা কাগজ নিয়ে এসেছেন। তিনি খুবই পেরেশান হলেন। অতপর সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ভয়ে তিনি পাণ্ডুলিপিসদৃশ সাদা কাগজ নিয়ে উস্তাদের সামনে বসে গেলেন। উস্তাদ হাদীস পড়তে লাগলেন আর তিনি ওই কাগজের ওপর এমনভাবে চোখ ঘোরাতে লাগলেন, যেন তিনি উস্তাদের পঠিত হাদীসের সঙ্গে পাণ্ডুলিপি মিলিয়ে নিচ্ছেন। একসময় উস্তাদ বিষয়টি বুঝতে পারলেন। তিনি রেগে গিয়ে বললেন, তুমি আমার সঙ্গে মশকরা করছ? ইমাম তিরমিযী অত্যন্ত আদবের সঙ্গে ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা করে বললেন, আপনার পঠিত সব হাদীসই আমার স্মৃতিতে গেঁথে গেছে। আমি মুখস্থ করে নিয়েছি। উস্তাদ তখন তাঁকে হাদীসগুলো শোনাতে বললেন। তখন তিনি সবগুলো হাদীস নির্ভুলভাবে শুনিয়ে দিলেন। অতঃপর উস্তাদ তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য অতিরিক্ত আরো ৪০টি হাদীস শুনালেন। ইমাম তিরমিযী সেগুলোও হুবহু শুনিয়ে দিলেন। উস্তাদ আশ্চর্য হয়ে বললেন, তোমার মতো আর কাউকে আমি কোনো দিন দেখিনি। ইমাম তিরমিযী ইলমে হাদীসের যে বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার আত্মস্থ করেছিলেন, তা দিয়ে তিনি অসংখ্য যোগ্য মুহাদ্দিস তৈরি করে রেখে গেছেন। একই সময়ে তাঁর হাদীসের দারসে হাজারো উচ্চতর জ্ঞানপিপাসু উলামায়ে কিরাম উপস্থিত হতেন। এক বর্ণনা থেকে জানা যায়, তাঁর কাছ থেকে ৯০ হাজার মুহাদ্দিস ইলমে হাদীসের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন।

এরপর আবার বাসে চড়লাম সুরখান্দারিয়া প্রদেশের উদ্দেশ্যে। রাত ২টায় এসে পৌঁছালাম সুরখান্দারিয়া প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত তিরমিয শহরে। এ শহরটি একেবারে আফগানিস্তান সীমান্তে। রাস্তায় একবার গাড়ি বহর থেমেছিল। নেমে আমরা কয়েকজন গ্রাম্য (পাহাড়ি) লোকদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করলাম। যদিও কেউ কারও কথা বুঝতে পারিনি, তবে মনের ভাব প্রকাশে তেমন সমস্যাও হয়নি। তিরমিয এলাকার মানুষজন দেখতে অনেকটাই আফগানদের মতো। লম্বাটে গড়ন, মাথায় বিশাল বড় পাগড়ি, পশতু টানে কথা বলে। বাকি উজবেকদের মতো এরাও অমায়িক, অতিথিপরায়ণ।

পরদিন আমরা তিরমিয শহর থেকে বের হয়ে প্রখ্যাত সূফি-চিকিৎসক হাকিম তিরমিযী এবং নকশবন্দী তরীকার শায়খ আলাউদ্দীন আত্তার (র.) এর কবর যিয়ারত করলাম। শায়খ আলাউদ্দীন আত্তার ৭৩৯ হিজরীতে এক ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অল্পবয়সেই পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সব ধনসম্পদ ভাইদেরকে দিয়ে তিনি শূন্য হস্তে দ্বীনী ইলম অর্জনের জন্য বুখারায় চলে যান। এক পর্যায়ে তাঁর সাক্ষাত হয় ইমাম বাহাউদ্দীন নকশবন্দ বুখারী (র.) এর সাথে। তিনি ইমাম নকশবন্দের কাছে তাঁর কন্যা বিয়ে করার আবেদন করেন। ইমাম নকশবন্দ আলাউদ্দীন আত্তারের কাছে নিজের কন্যাকে বিবাহ দেন। একদিকে নকশবন্দিয়্যা সিলসিলায় ইমাম বাহাউদ্দীন নকশবন্দের খলীফা খাজা ইয়াকুব চারখি, অপরদিকে নকশবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া সিলসিলায় ইমাম বাহাউদ্দীন নকশবন্দের খলীফা হচ্ছেন তাঁর জামাতা আলাউদ্দীন আত্তার।

তিরমিয থেকে আমরা ফ্লাইটে চড়লাম উজবেকিস্তানের রাজধানী তাশখন্দের উদ্দেশ্যে। তাশখন্দে পৌঁছে উজবেকিস্তানের সাবেক গ্রান্ড মুফতি, মধ্য এশিয়ার খ্যাতনামা আলিমে দ্বীন সূফি শায়খ মুহাম্মদ সাদিক মুহাম্মদ ইউসুফের স্মৃতিবিজড়িত মসজিদে আমাদের সমাপনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলো। সেখানে পরিচিত হলাম শায়খ ইউসুফের পুত্রের সাথে, যিনি বর্তমানে ওই মসজিদের খতিব।

প্রায় সন্ধ্যা নাগাদ আমাদেরকে খাবার দেওয়া হলো। খাবার খেয়ে আমরা চলে গেলাম হাস্ত ইমাম কমপ্লেক্সে। এখানে সংরক্ষিত আছে আমীরুল মুমিনীন সায়্যিদুনা উসমান ইবনে আফফান (রা.) এর সময়ে লিখিত পবিত্র কুরআনের মূল কপিগুলোর মধ্যে একটি। এর নাম 'মুসহাফে সমরকন্দ'। অটোমান খিলাফতকালে তৈমুর লং সিরিয়া থেকে লুণ্ঠন করে এ পাণ্ডুলিপি মধ্য এশিয়ায় নিয়ে আসেন। তার ইচ্ছা অনুযায়ী পাণ্ডুলিপিটি সমরকন্দে তার সমাধিতে রাখা হয়েছে বলে সাধারণভাবে মনে করা হয়। পরবর্তীকালে এটি রাশিয়ান সম্রাজ্যের রাজধানী পেট্রোগাদে (লেনিনগ্রাদে) স্থানান্তরিত হয়। কমিউনিস্ট বিপ্লবের পর লেনিনের নির্দেশে এটি পুনরায় তাশখন্দে ফেরত পাঠানো হয়। এখনো তা সেখানেই আছে। উজবেকিস্তানে স্থানান্তরিত হবার পূর্বে এ কপিটি দীর্ঘকাল যাবৎ লেনিনগ্রাদের ইম্পেরিয়াল মিউজিয়ামে সংরক্ষিত ছিল। বর্তমানে এটি তাশখন্দে সংরক্ষিত আছে। আল্লাহর কালামের প্রাচীন লিখিত সংস্করণ দেখে চোখের পানি আটকাতে পারিনি। হংকংয়ের এক শায়খ আমাকে বললেন, দেখুন আমাদের ইতিহাস কতো সুরক্ষিত। আমি বললাম, শায়খ, যে ইতিহাস কুরআনের হাত ধরে চলে, সেটি সুরক্ষিত না হয়ে পারে? ওখানে রয়েছে মধ্য এশিয়ার সবচেয়ে বড় মসজিদ।

রাতে আমাদের ফ্লাইট। উজবেকিস্তানকে আল-বিদা বলার সময় এসে গেছে। এয়ারপোর্ট যাওয়ার পথে আমরা স্থানীয় বাজার থেকে কিছু কেনাকাটা করলাম। যুদ্ধাস্ত্রের মতো শক্ত ও মোটা একটি কোট, সাথে চারকোণা বিশিষ্ট একটি টুপি আজও আমার আলমারিতে শোভা পাচ্ছে। সমরকন্দ থেকে কেনা নয়নাভিরাম বাসনকোসন দেখে যদিও মানুষ আহ্লাদিত হয়েছে; তবে এ বেঢক সাইজের পোশাক কেবল হাসির উপকরণ-ই যোগান দিয়ে আসছে।

দীর্ঘ এক সপ্তাহের সঙ্গী আমাদের ট্যুর গাইডরা এয়ারপোর্টের বাইরে আমাদের হাতে খাবারের প্যাকেট ধরিয়ে দিল। তাঁদেরকে কিছু হাদিয়া দিয়ে আমরা মুসাফাহা করলাম। অনেকেই তখন আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছিলেন। এরা দীর্ঘ এক সপ্তাহ আমাদেরকে সাধ্যমতো সঙ্গ দিয়েছে। চাইবার আগে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে। উজবেকিস্তানে এসে অনেক কিছু দেখলাম, শিখলাম। পেছনে রেখে গেলাম একদল অমায়িক বন্ধুবৎসল ভালো মনের মানুষকে। ওরা এবং ওদের নয়নাভিরাম মাতৃভূমি চিরদিন আমাদের হৃদয়ে অম্লান স্মৃতি হয়ে রয়ে যাবে। ভাবতে ভাবতে কখন যে ফ্লাইট আকাশে উড়ল, টের পেলাম না। [সমাপ্ত]

গ্রন্থ পরিচিতি

আল কাউলুছ ছাদীদ

ফরিদ উদ্দিন

পবিত্র কুরআন তারতীল সহকারে বা সহীহ শুদ্ধভাবে তিলাওয়াতের জন্য তাজবীদ জানা অত্যন্ত জরুরি। সমসাময়িক প্রচলিত ও পঠিত তাজবীদ গ্রন্থসমূহের মধ্যে আল-কাউলুছ ছাদীদ গ্রন্থখানা সবচেয়ে সহজবোধ্য ও সহজ আমলযোগ্য একটি কিতাব। কিতাবটির মূল নাম হলো 'আল-কাউলুছ ছাদীদ ফিল কিরাআতি ওয়াত তাজবীদ'। গ্রন্থটি আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) কর্তৃক লিখিত। মূল কিতাবটি ১৯৫২ সালে উর্দু ভাষায় প্রণীত হয়। পরবর্তীতে তদীয় বড় ছাহেবজাদা আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন এবং তাতে বিভিন্ন কায়দা যেমন ইখফা, ইযহার, ইদগাম, পুর, বারিক ইত্যাদির হরফগুলোকে মুখস্থ রাখার সুবিধার্থে শব্দগুচ্ছ করে দিয়েছেন এবং সকল ক্ষেত্রে মুখস্থ রাখার সহজ কৌশল ব্যবহার করেছেন।

স্বাধীন জ্ঞানচর্চার কিছু আগ্রহ থাকায় তাজবীদ বিষয়ে অধমের একাধিক গ্রন্থ সংগ্রহে আছে। তাই কিছুটা তুলনা করার সুযোগ হয়েছে। মনে হয়েছে অন্য কিতাবগুলো শুধু বিশেষভাবে আলিমদের কাছেই বোধগম্য হবে আর আল-কাউলুছ ছাদীদ গ্রন্থটি আলিম ও সাধারণ শিক্ষিত লোক, সকলেরই সহজে বোধগম্য। কারণ এর ভাষা অত্যন্ত সহজ ও প্রাঞ্জল যা অন্যান্য কিতাবের তুলনায় অনেক আলাদা। অর্থাৎ অন্যান্য কিতাব পাঠ করে এ কিতাবে এসে তার সারসংক্ষেপ পাওয়া যাবে।

এ কিতাবে অনুসরণ করা হয়েছে তাজবীদের মৌলিক ও নির্ভরযোগ্য কিতাবাদী যেমন- হিরজুল আমানি ওয়াজহুত তাহানী, যিনাতুল কারী, শরহে জাযরী, মাখারিজে হুরূফ এবং তদীয় উস্তাদ রঈসুল কুররা আহমদ হিজাযী মাক্কী (র.) কর্তৃক তার কাছে উপহারস্বরূপ প্রেরিত দুইখানা আরবী কিতাব। তাই একে বিভিন্ন ভাষায় রচিত তাজবীদের কিতাবসমূহের একটি সহজবোধ্য সংকলন বলা যায়।

সম্ভবত সকল পাঠকই চায়- সে যে বইটি পড়ছে তা যেন সে বুঝতে পারে এবং আমল করার যোগ্য হলে তা আমল করতে পারে।

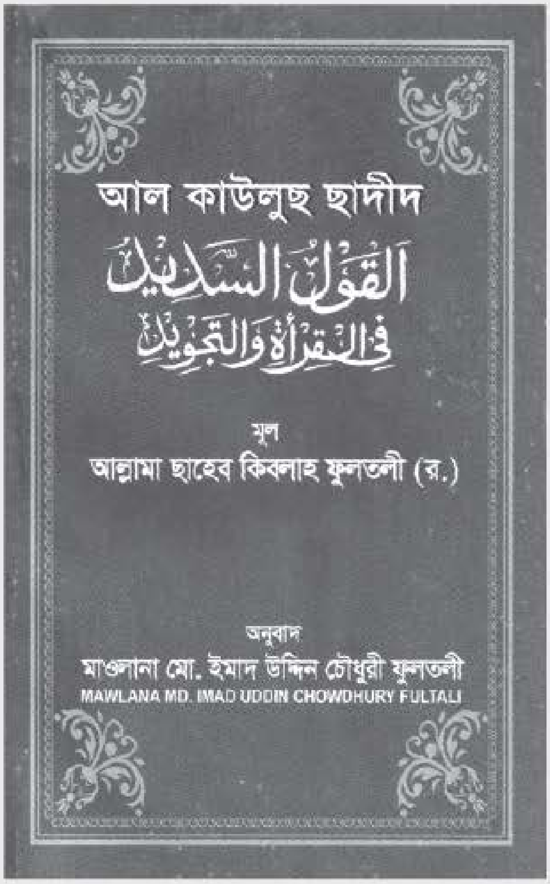

কিতাবখানা এত বুদ্ধিবৃত্তিক বিন্যস্ত যে, একজন নতুন পাঠক প্রথমে কুরআন পাঠ শিখতে হলে যে কাওয়াইদ বা নিয়মাবলি জেনে নিতে হয় সেগুলো প্রথমেই আলোচিত হয়েছে। তারপর পরবর্তী প্রয়োজনীয় মাসআলা আলোচিত হয়েছে। এতে যেকোনো বয়স ও যেকোনো স্তরের শিক্ষিত লোকের পক্ষে তা আয়ত্ত করা সহজ।

কিতাবখানা সহীহভাবে সাথে কুরআন তিলাওয়াত, নামাযে তিলাওয়াতের ফরয আদায় করতে, ভুলভাবে কুরআন তিলাওয়াতের কবীরা গুনাহ থেকে জিহ্বাকে হিফাযত করতে ও অর্থ বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। এর ফলে তা পাঠক ও শ্রোতাকে কুরআনের প্রতি আগ্রহী করে তুলে, কুরআনের প্রতি ভালোবাসা তৈরি করে, আরবী জানা লোকদেরকে অর্থ বুঝতে সহায়তা করে এবং কুরআন এর লফযী তিলাওয়াতের যতটুকু সাওয়াব আছে তা পুরোপুরি পাওয়ার সুযোগ করে দেয়।

মোটকথা কিতাবখানা আদ্যোপান্ত পাঠ করলে এবং এ জাতীয় অন্যান্য কিতাবের সাথে তুলনা করলে বুঝা যায়, এটি সরল উদ্দেশ্যে লিখিত। কাসরাতুল ইনতিফা বা বেশি উপকার দেওয়ার জন্য, সবাইকে সহীহ কুরআন শেখানোর জন্য। এজন্য তিনি সবচেয়ে মশহুর একটি কিরাত অর্থাৎ ইমাম হাফছ (র.) এর পদ্ধতি বেছে নিয়েছেন, সকল পদ্ধতি নয়। কেননা সকল কিরাতের নিয়মাবলি পাঠ করা অনেকের জন্য বোঝা হয়ে যাবে। এ সহজ পদ্ধতির কারণেই কিতাবখানা পড়ে বাংলাদেশসহ ইউরোপ-আমেরিকার অনেক দেশে বসবাসকারী মুসলিম ভাই-বোনেরা অনবরত কুরআনের বিশুদ্ধ পাঠক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছেন। ইউরোপ-আমেরিকার শিক্ষার্থীদের সহজে বোধগম্য করার জন্য কিতাবটি ইংরেজিতেও ভাষান্তর করা হয়েছে। ইংরেজি অনুবাদ করেছেন, ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) এর দৌহিত্র সৈয়দ আজমল হোসেন ওয়াসি।

বইটি নিউজপ্রিন্ট এবং সাদা কাগজে সুন্দর বাধাইসহ সকল ইসলামী লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়। মূল্য অত্যন্ত সাশ্রয়ী ৫০ টাকা মাত্র।

আধুনিক যুগের তাফসীর শাস্ত্রের দিকপাল আল্লামা সাবুনী

মিফতাহুল ইসলাম তালহা

রাসূল ﷺ যে সকল ভূখণ্ডের জন্য বিশেষভাবে দুআ করেছেন, শাম তথা আধুনিক সিরিয়া তন্মধ্যে অন্যতম। রাসূল ﷺ এর দুআর বরকতে এ অঞ্চলে যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করেছেন ইসলামের ইতিহাসের বহু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ। আধুনিক যুগে এরকম এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব হলেন আল্লামা মুহাম্মাদ আলী আস সাবুনী। ইসলামি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। বিশেষত তাফসীর শাস্ত্রে তাঁর অবদান কিংবদন্তীতুল্য। তাঁর জনপ্রিয় কিতাব 'সাফওয়াতুত তাফাসীর' আধুনিক যুগের অন্যতম বহুলপঠিত তাফসীরের কিতাব হিসেবে বিবেচিত হয়।

১৯৩০ সালে সিরিয়ার ঐতিহাসিক আলেপ্পো শহরে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর পিতা ছিলেন সে যুগে সিরিয়ার শীর্ষস্থানীয় আলিম শায়খ জামিল সাবুনী। ইসলামি ঐতিহ্যবাহী পরিবারে জন্মগ্রহণের সুবাদে আলিম পিতার নিকটই তাঁর লেখাপড়া শুরু হয়। শৈশবে স্থানীয় মক্তবে পবিত্র কুরআন মাজীদ হিফয করেন। স্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা অর্জনের পাশাপাশি সিরিয়ার বিখ্যাত আলিমগণের নিকট থেকে তিনি ধর্মীয় শিক্ষা ও সনদ অর্জন করেন। এরপর সিরিয়ার ধর্মমন্ত্রণালয় উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য তাঁকে মিসরের আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করে। আল আযহারের শরীআহ অনুষদ থেকে ১৯৫২ সালে স্নাতক সম্পন্ন করেন, এবং ১৯৫৪ সালে আল কাদ্বা আশ শারঈ বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেন।

উচ্চশিক্ষা অর্জন শেষে সাবুনী সিরিয়ায় ফিরে এসে ১৯৫৫ সালে শিক্ষকতায় আত্মনিয়োগ করেন। সত্তরের দশকে সৌদি আরবের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বিশেষজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগের প্রয়োজন দেখা দিলে সৌদি সরকার সিরিয়ার নিকট সহযোগিতা কামনা করে। ১৯৬২ সালে সৌদি সরকারের অনুরোধে সিরিয়ার শিক্ষা মন্ত্রণালয় মুহাম্মদ আলী আস সাবুনীকে সৌদিতে প্রেরণ করে। তিনি সেখানে মক্কা শরীফে অবস্থিত উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীআহ অনুষদে প্রভাষক পদে যোগদান করেন, পাশাপাশি তিনি কিং আব্দুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অনুষদেও শিক্ষকতা করেন। দীর্ঘ তিন দশক তিনি উম্মুল কুরায় শিক্ষকতা করেন, এরপর রাবেতা আল-আলাম আল-ইসলামীর উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেন। পবিত্র মক্কা মুকাররামায় অবস্থানকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা ও গবেষণা ছাড়াও তিনি সাধারণ মানুষের জন্য হারাম শরীফে প্রতিদিন তাফসীরের দারস প্রদান করতেন এবং জেদ্দার একটি মসজিদে সপ্তাহে একদিন দারস প্রদান করতেন। এছাড়া টেলিভিশনে প্রচারের জন্য তাঁর তাফসীরের দারস রেকর্ড করা হয়, এরকম প্রায় ছয় শতাধিক রেকর্ডিং রয়েছে। ২০০৭ সালে তিনি দুবাই ইন্টারন্যাশনাল কুরআন অ্যাওয়ার্ড কর্তৃক বর্ষসেরা ইসলামি ব্যক্তিত্ব মনোনীত হন।

আল্লামা সাবুনী বিভিন্ন বিষয়ে অর্ধশতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তবে তিনি সবচেয়ে বেশি খ্যাতি অর্জন করেন সাফওয়াতুত তাফাসীর নামক তাফসীর গ্রন্থের জন্য। আধুনিক যুগে রচিত সবচেয়ে জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য তাফসীরগ্রন্থসমূহের মধ্যে এটি অন্যতম। সহজবোধ্য ভাষা এ গ্রন্থটির জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। তিনি এ গ্রন্থে পূর্ববর্তী সকল গুরুত্বপূর্ণ তাফসীরগ্রন্থের সারনির্যাস সাবলীল ভাষায় সাধারণ পাঠকদের উপযোগী করে উপস্থাপন করেন। এ গ্রন্থে তিনি কুরআন মাজীদের শাব্দিক বিশ্লেষণ, পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে পরবর্তী আয়াতের প্রাসঙ্গিকতা, আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট, আয়াতের ব্যাখ্যা, আয়াতসমূহের অলঙ্কার বিশ্লেষণ, আয়াতের শিক্ষণীয় বিষয় ইত্যাদি সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত করেন, কিন্তু এরপরও কিতাবটি সাধারণ পাঠকের জন্য একটুও কঠিন হয়নি। এছাড়া রাওয়াইউল বায়ান নামক তাঁর আরেকটি তাফসীরগ্রন্থ অত্যন্ত গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। বাংলাদেশের মাদরাসাসমূহেও এ গ্রন্থটি পাঠ্যপুস্তক হিসেবে রয়েছে।

তার আরো দুটি অনবদ্য কীর্তি হলো উম্মুত তাফাসীর খ্যাত তাফসীর শাস্ত্রের আদিগ্রন্থ তাফসীরে তাবারী ও তাফসীরে ইবন কাসীরের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। তাফসীর শাস্ত্রের মৌলিক গ্রন্থ হিসেবে বিদগ্ধজনের নিকট এ দুটি কিতাব অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করলেও রচনাশৈলীর কারণে সাধারণ পাঠকদের জন্য কিতাব দু'টি সহজপাঠ্য নয়। ফলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি এসকল কিতাবের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ রচনা করেছেন। তবে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা অনুসারে আল্লামা সাবুনীর লেখা সংক্ষিপ্ত সংস্করণই সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে। তিনি তাবারী ও ইবনে কাসীরের রচিত তাফসীরের সনদসমূহ সংক্ষিপ্ত করেন, যাতে সাধারণ মানুষ পাঠের আগ্রহ ধরে রাখতে সক্ষম হয়। এছাড়া ভাষাগত জটিলতা দূর করে মূল কিতাবের কঠিন ইবারতকে সহজ ও সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরেন।

আল্লামা সাবুনী তাঁর প্রতিটি তাফসীর গ্রন্থে আহলুস সুন্নাহ তথা আশআরী-মাতুরীদী ধারার আকীদা অনুসরণ করেছেন। এসকল তাফসীরকে কেন্দ্র করে নজদী মতবাদের অনুসারী (কথিত সালাফী) শীর্ষস্থানীয় শায়খদের সাথে তাঁর চরম মতবিরোধ দেখা দেয়। নজদী ধারার শীর্ষস্থানীয় শায়খ সৌদী গ্র্যান্ড মুফতী ইবন বায, শায়খ আলবানীসহ আরো অনেকেই আল্লামা সাবুনীর বিরুদ্ধে ফতওয়া প্রদান ও বই রচনা করেন। এমনকি গ্র্যান্ড মুফতী ইবন বাযের প্রচেষ্টায় সৌদিতে তাঁর লেখা জগদ্বিখ্যাত মকবুল তাফসীরের কিতাব সাফওয়াতুত তাফাসীর নিষিদ্ধও হয়েছিল। আশআরী-মাতুরীদী আকীদার পক্ষাবলম্বনের কারণে সৌদি আরবে আল্লামা সাবুনী বিভিন্ন রকমের সমস্যায় পড়েন। এসব কারণে তিনি সৌদি থেকে তুরস্কে চলে যান, এবং সেখানেই শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। তুরস্কে অবস্থানরত আরেক সিরীয় অধ্যাপক ড. আব্দুল কাদের আল হুসাইনের বর্ণনামতে, আল্লামা সাবুনী তুরস্কের প্রখ্যাত নবশবন্দী তরীকার বুযুর্গ শায়খ মাহমুদ এফেন্দী (রহ.) এর নিকট থেকে তরীকতের জ্ঞান অর্জন করেন।

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআতের এই মহান মুফাসসির গত মার্চ মাসের ১৯ তারিখ তুরস্কের ইয়ালোভা শহরে ৯১ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তাঁর ইন্তিকালে সমগ্র মুসলিম জাহানে শোকের ছায় নেমে আসে।

দেশে দেশে রামাদান সংস্কৃতি

আখতার হোসাইন জাহেদ

রাহমাত, মাগফিরাত ও নাজাতের মহা বার্তা নিয়ে পবিত্র মাহে রামাদান আমাদের সন্নিকটে। রামাদানকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুতি নিচ্ছে বিশ্বজুড়ে মুমিন-মুসলমান। মুমিনরা রামাদানকে ইবাদাতের মওসুম হিসাবে বেচে নেয়। রোযা রামাদানে মুসলমানদের জন্য একটি অপরিহার্য ইবাদত। এ ইবাদতে মানুষ হয় সংযমী, অর্জন করে আত্মার পরিশুদ্ধিতা। সংযমকে প্রাধান্য দিয়ে মানুষ দৈনন্দিন জীবনে নিয়ে আসে অনেক পরিবর্তন। এর মধ্যে রাতের শেষ ভাগে উঠে সাহরী খাওয়া, সারাদিন কাজের পাশাপাশি ধর্মীয় কাজকে প্রাধান্য দেওয়া, সংযমী জীবন যাপন করা, সূর্যাস্তে সবার সাথে ইফতার করা, ইফতার শেষ তারাবীহ পড়া ইত্যাদি, এ যেন এক অনন্য রামাদান সংস্কৃতি। এছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাবে উদযাপিত হয়ে আসছে মাহে রামাদান। দেশে দেশে রামাদান সংস্কৃতি কেমন? পাঠকের জন্য মুসলিম বিশ্বের দেশভেদে রামাদান সংস্কৃতির কিছু আকর্ষণীয় অংশ তুলে ধরা হলো-

মিসর: প্রাচীন সভ্যতার দেশ মিসর। এখানে উৎসবমুখর পরিবেশে শুরু হয় সিয়াম সাধনা। মানুষ যাতে ইবাদত এবং মসজিদে বেশি সময় ব্যয় করতে পারে এজন্য এ দেশে রামাদান মাসে সরকারি ব্যবস্থাপনায় কমিয়ে আনা হয় কর্মঘন্টা। রামাদানের রাতে ঘরে ঘরে বাতি জ্বালানো এবং ফানুস ওড়ানো মিসরীয়দের অনেক পুরনো সংস্কৃতি। মিসরীয়রা কামানের গোলার শব্দে ইফতার করেন এবং সাহরী শেষ করেন।

ইরান: শিয়া অধ্যুষিত ইরানে নানা আয়োজনের মধ্যদিয়ে পালিত হয় মাহে রামাদান। রামাদান উপলক্ষে ইরানের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখে ইরান সরকার। তবে মজার বিষয় হচ্ছে ইরানের শিয়া মতাবলম্বি ফকিহদের মতে, কোনো ব্যক্তি রামাদানে মাত্র ১৭ কিলোমিটার ভ্রমণ করলেই সে মুসাফির হবে। আর মুসাফিরদের জন্য রোযা রাখা তাদের মতে হারাম। এদিকে অধিকাংশ ইরানিই মাসব্যাপী ইতিকাফ করে থাকেন। তারা সারাদিন অফিস করে মসজিদে রাত যাপন করাকেই ইতিকাফ হিসেবে গণ্য করেন। রাতে মসজিদ কর্তৃপক্ষই ইতিকাফকারীদের খাবার সরবরাহ করেন।

আইসল্যান্ড ও সুইডেন: ইউরোপের একটি প্রজাতান্ত্রিক দ্বীপরাষ্ট্র আইসল্যান্ড। ২৭ হাজার ৭৫ বর্গকিলোমিটার আয়তনের এদেশে প্রায় ৩ লক্ষাধিক জনসংখ্যার মধ্যে মুসলমান বাস করেন মাত্র ৭৭০ জন। ইফতারের মাত্র দুই ঘন্টা পরই সাহরী শেষ করতে হয় তাদের। স্থানীয় সময় অনুযায়ী রাত ১২টায় ইফতার করে আবার ২টায় সেহরি খান তাঁরা। অন্যদিকে ইউরোপের তৃতীয় সর্ববৃহৎ দেশ সুইডেনের মুসলমানদের অবস্থাও একই রকম। মোট জনসংখ্যার প্রায় পাঁচ লাখ মুসলমানের বসবাস এখানে। গ্রীষ্মের রোযা সুইডেনিদের জন্য সবচেয়ে কঠিন। ইফতারের মাত্র চার ঘন্টা পর সাহরী খেতে হয় তাদের।

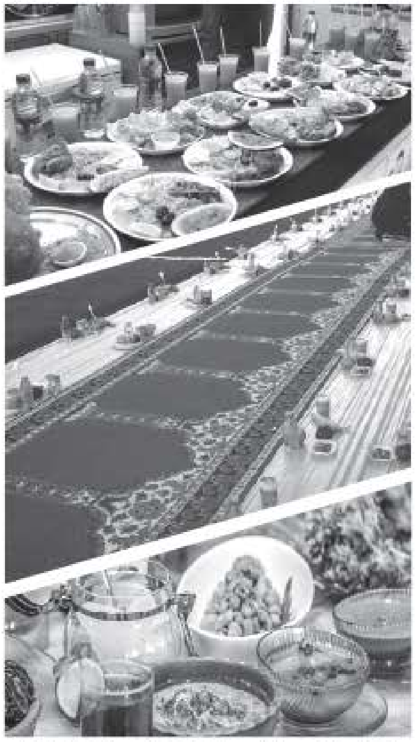

জার্মান ও যুক্তরাজ্য: ১৯ ঘন্টা রোযা রাখেন জার্মানের মুসলমানরা। রাত ৩ টায় সাহরী খেয়ে পরদিন রাত ১০টায় ইফতার করেন তারা। অন্যদিকে জার্মানের মুসলমানদের চেয়ে পাঁচ মিনিট কম অর্থাৎ প্রায় ১৮ ঘন্টা ৫৫ মিনিট রোযা রাখেন যুক্তরাজ্যের ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা। যুক্তরাজ্যে প্রায় ৩০ লাখ মুসলিমের বসবাস; যা মোট জনগোষ্ঠীর ৫ শতাংশ। দেশটিতে আছে প্রায় ১ হাজার ৭৫০টি মসজিদ। এখানকার অভিবাসী মুসলমানরা তাদের স্ব স্ব দেশের সংস্কৃতি অনুযায়ী রামাদান পালন করেন। মসজিদে মসজিদে রোযাদারদের জন্য ইফতারের আয়োজন হয়। ভিন্ন ধর্মের মানুষদের আমন্ত্রণও জানানো হয় এমন অনেক আয়োজনে। দীর্ঘ সিয়াম সাধনার পর রাতে ঘরে ঘরে ও মসজিদে মসজিদে সালাতুত তারাবীহতে মিলিত হতে ভুলেন না যুক্তরাজ্যের মুসলমানরা।

তুরস্ক: রামাদানজুড়ে বড় বড় মসজিদের পাশে বইমেলা এবং কুরআন প্রতিযোগীতা তুর্কিদের রামাদান সংস্কৃতির অংশ। রামাদান মাসে অফিস-আদালত ঠিক রেখেই তারা ইফতারের আগে ঘরে ফেরার চেষ্টা করেন। সেহরির সময় হলেই দেশটির অলিগলিতে বেজে ওঠে ড্রামের শব্দ। মানুষকে সময় মতো জাগিয়ে দেওয়ার জন্য তুর্কি তরুণরা ড্রাম বাজিয়ে সংগীত পরিবেশন করে ডাকাডাকি করেন। আবার কামানের গোলার আওয়াজ শোনার মাধ্যমে সাহরী ও ইফতার শেষ করার সংস্কৃতিও রয়েছে তুরস্কে। দিনের বেলায় রেস্তোরাঁ এবং খাবারের দোকান বন্ধ থাকলেও দুপুরের পর থেকেই জমে ওঠে মার্কেটিগুলো। চলতে থাকে ইফতারের আয়োজন। সাহরীর সময়ও রেস্তোরাঁগুলো খোলা রাখা হয়। দেশটিতে সাহরী ও ইফতারের সময় অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষরাও মুসলিমদের সঙ্গে সৌহার্দ্য বজায় রেখে যোগ দিতে দেখা যায়। এছাড়াও খেজুরের পরিবর্তে জলপাই দিয়ে ইফতারের সময় রোযা ভঙ্গ করা তুর্কিদের অন্যতম একটি সংস্কৃতি।

ওমান: রামাদান এলেই নিত্যপণ্যের দাম বাড়িয়ে দেওয়া কিংবা মজুদদারী করা অসৎ ব্যবসায়ীদের একটি নেশা। কিন্তু ঠিক উল্টো চিত্র দেখা যায় উপসাগরীয় দেশ ওমানের ব্যবসায়ীদের মাঝে। রামাদান উপলক্ষ্যে সেখানে বিভিন্ন দ্রব্যমূল্যে কোম্পানিগুলোর থাকে বিশেষ ছাড়। ব্যবসায়ীরা যথাযথ ছাড় ক্রেতাদের হাতে বুঝিয়ে দেন সৎভাবে। রামাদান শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই ওমানের বিভিন্ন রাস্তার পাশে দেখা যায় সারি সারি তাঁবু। এসব তাঁবু রোযাদারদের ইফতার করানোর জন্য ওখানকার স্থানীয় মানুষ বিশেষভাবে তৈরি করেন। ওমানীয়রা এসময় বেশি পরিমাণে দান-সাদকাহ করেন। দানের সময় শর্ত জুড়ে দেন, যেন তার নাম প্রকাশ না হয়। রসিদে লিখে দিতে হয় একজন দাতা কিংবা 'আবদুল্লাহ' [আল্লাহর বান্দা]।

সৌদি আরব: মক্কা-মদিনার দেশ সৌদি আরবে রামাদানের চাঁদ উঠতেই শুরু হয় একে অন্যের কল্যাণ কামনা করে ক্ষুদেবার্তা বিনিময়। শহরগুলো সাজে নতুন সাজে। ঘরবাড়ি সংস্কার এবং ধোঁয়ামোছা হয়। আমরা ঈদের আগে যা যা করি সৌদিয়ানরা রামাদানের শুরুতে ঠিক তাই করেন। দান-সাদাকাতের নীরব প্রতিযোগিতা চলে সৌদি বাসিন্দাদের মাঝে।

রোযাদারকে ইফতার করানোর ঐতিহ্যবাহী সৌদি সংস্কৃতি রামাদান মাসের সবচেয়ে মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। রোযাদারকে ইফতার করানোর জন্য রাস্তার মোড়ে মোড়ে এবং মসজিদে মসজিদে স্থাপন করা হয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিশেষ তাঁবু। বাঙালি, ইন্ডিয়ানসহ ভিনদেশী শ্রমিকরা এসব তাঁবুতে মেহমান হয়ে ইফতার গ্রহণ করেন আর খাদেমের মতো তাদের মাঝে ইফতার বিতরণের কাজটি করেন সৌদিয়ানরা। রোযাদারদের ইফতার করানোর নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখা যায় মদিনা মুনাওয়ারায়। বিশেষ করে মসজিদে নববীর আশপাশে। ক্ষুধার্ত মানুষ যেমন লোভনীয় খাবারের দিকে ছুটে বেড়ায়, মদিনার মানুষেরাও ঠিক সেভাবে ছুটোছুটি করেন রোযাদারকে নিজের দস্তরখানে বসানোর জন্য। সৌদি আরবে সালাতুত তারাবিহ ও কিয়ামুল লাইল চলে সাহরীর পূর্ব পর্যন্ত। এ সময় মাইক থেকে ভেসে আসা সুমধুর কন্ঠের তিলাওয়াতের সুরের মূর্ছনা আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলে। এখানে দিনের কোলাহল থাকে রাতভর। রামাদানে সৌদি আরবের সুপার মার্কেটগুলোর দৃশ্যপট সম্পূর্ণ উল্টো। বিভিন্ন কোম্পানি, মুদি ও গ্রোসারি আইটেমে থাকে বিশেষ ছাড়।

সুদান: আফ্রিকা মহাদেশের অন্যতম একটি মুসলিম দেশ সুদান। এখানে ইফতারিতে সাধারণত খেজুর, গোশতের হামড়া, লাহমা এবং চালের তৈরি 'আছিদা' গোশত ও সস দিয়ে তৈরি 'মুলাহ' নামক খাদ্য তাদের প্রিয় এবং একই সঙ্গে 'গাওয়া' নামক চা জাতীয় পানীয় তারা পান করেন। সুদানিরা ইফতারে খুবই ভোজন বিলাসী। তাই তারা 'শোরবা' নামক স্যুপ, গোশত দিয়ে তৈরি 'মুহাম্মার' নামক খাবার, দুধ ভাত দিয়ে তৈরি 'রুসবিল হালিব' তারা ইফতারীতে রাখেন। তদুপরি পায়েস, ক্ষির, ফিরনি এগুলো তাদের প্রিয় খাবার।

সংযুক্ত আরব আমিরাত: আরব বিশ্বের ইউরোপ হিসেবে পরিচিত সংযুক্ত আরব আমিরাত। সেখানে রামাদানের চাঁদ দেখার সাথে সাথেই একে অন্যকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু হয় রোযা। একইদিনে রামাদান শুরু হলেও আলাদা সময়ে সাহরী ও ইফতার করেন দেশটির শিয়া ও সুন্নি মুসলিমরা। সুন্নাত মেনে খেজুর দিয়ে ইফতার করেন তারা।

বরকতের এ মাসে রোযাদারদের প্রতি আমিরাতবাসীর আতিথেয়তা মুগ্ধ করার মতো। আরব আতিথেয়তার গুণটি এখনো ধরে রাখছেন তারা। রামাদান এলেই এখানকার জনগণ পাড়া-মহল্লা বা বড় বড় মসজিদের পাশে তাঁবু-প্যান্ডেল টানিয়ে ইফতার আয়োজনের পাশাপাশি সন্ধ্যার আগে রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে রোযাদারদের মাঝে ইফতার বিতরণে ব্যস্ত থাকেন আমিরাতবাসী।

অন্যদিকে রামাদান শুরুর সাথে সাথেই দেখা যায় দেশটিতে ভিন্নচিত্র। বন্ধ করা হয় নাইট ক্লাব এবং মদের বার। সে সময় প্রকাশ্যে পানাহার ও ধূমপান সেখানে দণ্ডনীয় অপরাধ। দেশের সড়কগুলোকে সাজানো হয় ভিন্ন সাজে। আলোকসজ্জায় সাজে উপসাগরীয় দেশটি এবং সরকারীভাবে আয়োজন করা হয় আন্তর্জাতিক কুরআন প্রতিযোগীতা।

ইরাক: রামাদানের চাঁদকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানায় ইরাকিরা। ইরাকের মুসলমানেরা তোপধ্বনির মাধ্যমে রামাদানকে বরণ করে নেয়। এ সংস্কৃতি তারা গ্রহণ করেছে তুর্কিদের কাছ থেকে। তুর্কিরা উসমানীয় শাসনামলে বাগদাদবাসীকে তোপধ্বনির মাধ্যমে ইফতার ও সেহরির সময় সম্পর্কে অবগত করাত। তোপধ্বনি কালের বিবর্তনে এখনো ইরাকে টিকে আছে একটি জনপ্রিয় রামাদান সংস্কৃতি হিসেবে। তবে হ্যাঁ, এখন আর উসমানি আমলের তোপগুলো ব্যবহার করা হয় না। এখন কম্পিউটারাইজড নিয়ন্ত্রিত তোপ ব্যবহার করা হয়।

রামাদানে আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি বেড়াতে যাওয়া ইরাকের আরেকটি ঐতিহ্য। এ সময় তারা পরস্পরকে ধর্মীয় গ্রন্থাদি উপহার দেন। প্রতিবেশিদের বাড়িতে ইফতার সামগ্রী পাঠান। ইরাকিরা খোলা ছাদে বা বাড়ির সামনে খোলা প্রাঙ্গণে বসে ইফতার করতে পছন্দ করেন। এটা ইরাকের একটি নিজস্ব সংস্কৃতি। বসরার খেজুর ও দুধ এবং বিশেষ ধরনের শরবত ইরাকীদের ইফতার ও সেহরিতে খুবই পছন্দ। বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম দেশের ন্যায় রামাদানে ইরাকের মসজিদগুলোও মুসল্লি মুখর হয়ে ওঠে। সব বয়সী মুসল্লির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় মসজিদগুলোতে। অন্যদিকে ইরাকীদের বিয়েগুলো যথাসম্ভব রামাদানে সম্পন্ন করা তাদের অন্যতম সংস্কৃতি।

যুক্তরাষ্ট্র: এখানে প্রায় ৭০ লাখ মুসলমানের বসবাস। বেশির ভাগ মুসলমান বাস করেন নিউইয়র্ক, মিশিগান, ক্যালিফোর্নিয়া, নিউজার্সি, ইলিনয়েস, ইন্ডিয়ানো, টেক্সাস, ভার্জিনিয়া ও মেরিল্যান্ড অঙ্গরাজ্যগুলোতে। এশিয়ান মুসলিমরা রামাদানে তাদের সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবে পায়জামা, পাঞ্জাবি ও কাবুলি সেট (কোর্তা) পরিধান করেন এবং মহিলা ও শিশুরা মেহেদি দিয়ে হাত রাঙান। আমেরিকায় ইফতার সামগ্রীর মধ্যে খেজুর, খোরমা, সালাদ, পনির, রুটি, ডিম, গোশত, ইয়োগার্ট, হট বিনস, স্যুপ, চা ইত্যাদি থাকে। আর বাঙালী মুসলমানদের ইফতার তালিকায় অন্য সবকিছুর পাশাপাশি থাকে বিরিয়ানী, খিচুড়ী, শরবত, পিয়াজু এবং জিলাপীসহ আরো অনেক কিছু। রামাদান মাসে হোয়াইট হাউসে ইফতার পার্টি প্রথম শুরু করেছিলেন সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন। এটা বর্তমানে একটি প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মালয়েশিয়া: সাইরেনের শব্দে রামাদানের আগমনী বার্তা পৌঁছে যায় সবার কানে কানে। 'শাহরুন মুবারাকুন' বলে অভিবাদন জানিয়ে এবং উপহার বিনিময় করে শুরুতেই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে মজবুত করে নেয় মালয়েশিয়ানরা। এ দেশে সরকার এবং ব্যবসায়ীরা রামাদান উপলক্ষে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীতে দেয় বিশেষ ছাড়। মালয়েশিয়ানরা অনেকাংশেই ধর্মপ্রাণ। রমাদানে মালয়েশিয়ার মসজিদগুলো কানায় কানায় পরিপূর্ণ থাকে। তারাবিহসহ অন্যান্য নামাজে নারী ও শিশুদের উপস্থিতি থাকে লক্ষণীয়। তারাবিহর শেষে বিশেষ শিক্ষামূলক আসর বসে মালয়েশিয়ার মসজিদগুলোতে। সাহরীর পর ঘুমানোর অভ্যাস নেই মালয়েশিয়ার মুসলমানদের। স্থানীয় মসজিদে ধর্মীয় আলোচনা শুনে সূর্য উঠলে নিজ নিজ কাজে বেরিয়ে পড়েন তাঁরা।

বাংলাদেশ: বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ বাংলাদেশ। সারাদিনের রোযা শেষে এখানকার রোযাদারদের প্রধান আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায় ইফতার। অঞ্চলভেদে সকলেই সাধ্যমত চেষ্টা করে ইফতারকে বর্ণাঢ্য করতে। সাধারণত বাংলাদেশী ইফতারিতে থাকে খেজুর, শরবত, ছোলা, মুড়ি, পিয়াজু এবং বেগুনি। বাহারী জিলাপি তো থাকবেই। পাশাপাশি থাকে নানা ধরনের ফল। এছাড়াও অনেকে বিরিয়ানি, খিচুড়ি, ভাত ও রুটির মত ভারী খাবারও খেয়ে থাকেন। রামাদান এলে বাংলাদেশে উৎসবের আমেজ বিরাজ করে সর্বত্র। ইফতার মাহফিল, আত্মীয়ের বাড়িতে ইফতার পাঠানো বাঙালীর পুরোনো সংস্কৃতি। রামাদানে বাংলাদেশের মসজিদগুলো সরব হয়, জেগে উঠে। মুসল্লি বেড়ে যায় কয়েক গুণ। রামাদানে ইফতার, তারাবিহ, সাহরী, দিনের বেলায় পাড়ায়-পাড়ায়, মসজিদ-মাদরাসা, স্কুল-কলেজে কুরআন শিক্ষার আসর ইত্যাদি যেন বাংলাদেশের রামাদানকে ভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপন করে।

তথ্যসূত্র: ইন্টারনেট

রোযায় গৃহিণীর রোজনামচা

তাওহিদা ফেরদৌস তান্নি

বছরে একবার আসে মাহে রামাদান। ফরয ইবাদাতের পাশাপাশি নফল ইবাদাতে মনযোগী হন ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা। নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের দৈনন্দিন কার্যপ্রাণালিতে আসে বৈচিত্র্য। বয়সভেদে কাজকর্মেও থাকে ভিন্নতা। ছোটবেলায় যেভাবে রামাদান কাটাতাম আজকের দিন তেমন নয়। ঘুম থেকে ওঠেই মক্তবে যাওয়ার প্রস্তুতি চলতো। দারুল কিরাতের সেই সোনামাখা দিনগুলি কি আর ফিরে আসবে? আমরা বিভিন্ন স্কুল মাদরাসায় পড়তাম কিন্তু গ্রামের সমবয়সি সকলেই আমার সহপাঠী এই দারুল কিরাতের সুবাদে। যখন দিনে তিন চারটে রোযা রাখতাম সে সময়টি ছিল আরো সুখের। খেজুরের বীজ সংগ্রহ করে চায়ের কাপে ভিজিয়ে রাখতাম। পানের সাথে খেজুর বীজ চিবিয়ে খাওয়ার স্বাদ ছিল আলাদা। এখন আর সেইদিন নেই। এখন যেমন ফরজ হিসেবে রোযা রাখতে হয় তেমনি পারিবারিক দায়দায়িত্বে ব্যস্ত সময় পার করি। রামাদানে গৃহিণীদের জন্য লিখতে ইচ্ছে হলো। তাই এ অগোছালো উপস্থাপনা।

এ মাসে গৃহকর্ত্রীদের জন্য কিছুটা কাজ বেড়ে যায়। রামাদানে যেমনি সন্তানদের সময় দিতে হয় তেমনি বয়স্ক মা-বাবা, শ্বশুর শাশুড়িদের প্রতিও বিশেষ খেয়াল রাখতে হয়। রামাদানে রাতের বেলা রোযাদারের ঘুম কম হয় তাই দেরিতে শয্যাত্যাগ করতে হয়। বাবা-মা ঘুমিয়ে থাকলে মক্তবে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত শিশুরা বিভিন্ন অভিনব কাজ করে বসে। তাই সাঁতার জানে না এসব শিশুদের প্রতি মনোযোগ রাখা দরকার। একটু অবহেলায় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। যেসব মহিলাদের ছোট বাচ্চা রয়েছে তাদের প্রতিও পরিবারের সদস্যদের সদয় হওয়া প্রয়োজন। রোযার দিনে তাদের ওপর চাপ কমাতে অন্তত শিশুকে কোলে নিয়ে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে।

এছাড়াও মহিলাদের নিজের জন্য কোরআন তিলাওয়াত ও নফল ইবাদাতের সময় বের করতে হয়। কিন্তু সময় নির্ধারণ করবেন কীভাবে। বড় পরিবার হলে মহিলারা পারস্পারিক সহযোগিতায় সহজে এসব করতে পারেন। ধরুন, একটি পরিবারে কর্মক্ষম দুইজন মহিলা আছেন। দুজন মহিলার মধ্যে একজন কোরআন তিলাওয়াত করবেন যুহরের নামাযের আগে তখন অন্যজন গৃহস্থালি করবেন। তিনি যখন নামায শেষ করে রান্নাঘরে যাবেন তখন অন্যজন নামায আদায় করে তিলাওয়াতে বসবেন। তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে একটি পরামর্শ দিতে পারি। সাধারণত আমরা মাসে এক খতম করার উদ্দেশ্যে দিনে এক পারা তিলাওয়াত করি। বিশেষ কোন ব্যস্ততায় দুইদিন তিলাওয়াতে বসতে না পারলে বিশ রামাদানে দেখবেন আপনার খতম এখনও সতেরো পারায়। তাই যেদিন সময় বেশি পাবেন তিলাওয়াত একটু এগিয়ে রাখবেন।

এশা ও তারাবীহের নামাযের ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। একই সাথে শিশুদের খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো ও রান্নাবান্না এসব কাজ প্রায় একই সময়ে উপস্থিত হয়। তাই আন্তরিকতার সাথে সময় ভাগাভাগি করে এসব কাজ করে নিতে হবে। পরিবারের লোকদের সহযোগিতা করাও ইবাদাত।

একটা কথা আমাদের মনে রাখা উচিত, রোযায় আমি যেমন কষ্টবোধ করছি, প্ররিশ্রমীদের জন্য এ কষ্ট আরোও বেশি হবে। তাই কোন কাজ একজনের জন্য ছেড়ে দিতে নেই। ছোট পরিবার হলে জায়া ও পতি সম্মিলিতভাবে কাজ করলে বোঝা অনেক হালকা হয়। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন, ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। (সূরা তাওবা: ৭১) রাসূল ﷺ নিজেও নিজ গৃহের কাজে উম্মুল মুমিনিনদের সাহায্য করতেন। হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি বকরির দুধ দোহন করতেন এবং নিজের কাজ নিজেই করতেন।' (মুসনাদ আহমদ) তাই পুরুষরা রাসূল ﷺ এর সুন্নাত মনে করে গৃহস্থালি কাজে মহিলাদের সাহায্য করবেন। অধিকন্তু দায়িত্বোধ তো আছেই।

রোযা অবস্থায় তরকারি রান্না করার সময় স্বাদ গ্রহণ করা যায় না। অনেক সময় খাবার সুস্বাদু নাও হতে পারে। এমতাবস্থায় খাবারে দোষক্রটি না ধরাই ভালো। এটা থেকে রাঁধুনী অখুশি হন। আবার গুরুজনের অসুবিধার জন্য অনেক রাঁধুনী ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ফলে তাদের সাহরী ও ইফতার ব্যাহত হয়। আমরা এ সম্পর্কিত একটি হাদিস জানতে পারি। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো খাবারের দোষক্রটি ধরতেন না। তার পছন্দ হলে খেতেন আর অপছন্দ হলে রেখে দিতেন।' (বুখারী ও ইবনে মাজাহ)

বিত্তবান পরিবারে অনেকে রোযার মাসের জন্য গৃহকর্মী নিয়োগ করে থাকেন। তাদের ওপর সকল কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে নিজেরা ইবাদাতে মশগুল হন। কাজের লোককে আপনি বেতন বোনাস দিবেন ঠিক কিন্তু এটা ভুলে গেলে চলবে না তারাও আমার মতো রোযা রেখেছে। অনেকে কাজের লোকের ইবাদাতের প্রতি গুরুত্ব দেন না। আবার তাদের কোনো ভুলের জন্য হাসি তামাশা করে থাকেন। তাই হাসির খোরাক না হতে গৃহকর্মীরা নিয়মিত নামায কাযা করেন। এরকম সাংঘাতিক কাজ থেকে বিরত থাকা জরুরি। আপনার বাড়িতে কাজের সময় যদি নামাযের সময় পার হয় এবং সে নামায কাযা করে তবে আপনিও এ দায়ভার থেকে মুক্ত নন। অধিকাংশ কাজের লোক পাওয়া যায়, যারা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত লিখতে পড়তে যানেন না। এমনকি নামাযের জন্য চার ছয়টি সূরাও শুদ্ধ করে মুখস্ত বলতে পারেন না। তাদেরকে ইবাদতের বুনিয়াদী বিষয়াবলি শিক্ষা দেওয়া জরুরি।

বলছিলাম গৃহিনীদের কথা। রুটিন করে সময়মতো কাজ না সারলে বেগ পেতে হয়। বাংলাদেশে অঞ্চলভেদে ইফতারিতে আছে বৈচিত্র্য। তবে সারাদিন রোযা রেখে নরম খাবার সকল রোযাদারেরই পছন্দ। এসব খাবারের ক্ষেত্রে রয়েছে হালিম, পায়েস ও খিচুড়ি। কম সময়ে এসব খাবার রান্না করতে আগে চাল ডাল ভিজিয়ে রাখলে ভালো হয়। সাথে ছোলা থাকছেই। সেহরি শেষে ছোলা ভিজিয়ে রাখা ভালো, সিদ্ধ করার ঝামেলা থাকে না। অনেকে পিঁয়াজু, বেগুনী এসব তৈরি করেন। এসব মুখরোচক বটে কিন্তু তেলেভাজা হিসেবে স্বাস্থ্যের জন্য মাননসই নয়। এবার রামাদান এল বৈশাখে। গ্রীষ্মের তাপদাহে দিনের বেলা রোযাদারের বেশি তৃষ্ণা পাবে। ইফতারে তরমুজ বা লেবুর শরবত বানানো যেতে পারে। বছরে রামাদান আসে মাত্র একবার। কাজকর্মের চাপ বেড়ে গেলেও ঈদের পর মনে হবে, আহা রামাদানটা চলে গেল! তাই একটি দিনও অবহেলায় কাটানো যাবে না। মানুষের জীবনে হাতেগোনা কয়েকটি রামাদান আসে মাত্র।

জীবন জিজ্ঞাসা

জবাব দিচ্ছেন-
মাওলানা আবূ নছর মোহাম্মদ কুতুবুজ্জামান তাফাদার
প্রিন্সিপাল ও খতীব, আল ইসলাহ্ ইসলামিক সেন্টার
মিশিগান, আমেরিকা।

আবুল হোসেন
ইটাখলা, বরমচাল, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার

১। বাথরুমে উলঙ্গ হয়ে গোসল করা জায়িয আছে কি?
২। হাঁটুর উপর লুঙ্গি উঠলে উযূ ভঙ্গ হবে কি?

জবাব ১: প্রয়োজন ব্যতীত উলঙ্গ হয়ে গোসল করা মাকরূহ। কেননা নির্জন অবস্থায়ও আল্লাহ তাআলা থেকে লজ্জাবোধ করা মুমিনের কর্তব্য। এ মর্মে হাদীসে এসেছে- রাসূল ﷺ কে নির্জন অবস্থায় লজ্জাস্থান অনাবৃত রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জবাবে বললেন, লজ্জাবোধ করার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলাই সর্বাধিক হকদার। (আল মু'জামুল কাবীর: হাদীস নং ৯৯০, ৯৯১ ও ৯৯২, আল মাবসূত: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯৬, ১০ম খণ্ড, ১৫৬ পৃষ্ঠা)
অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূল ﷺ টয়লেটে প্রবেশ করেও মাটির নিকটবর্তী না হওয়া পর্যন্ত কাপড় উঠাতেন না। (সুনানে আবী দাউদ: হাদীস নং ১৪, সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ১৪)

জবাব ২: হাঁটুর উপরে লুঙ্গি উঠলে উযূ ভঙ্গ হবে না, যেহেতু ইহা উযূ ভঙ্গের কারণ নয়। তবে সতর অনাবৃত থাকাবস্থায় উযূ করা নিষেধ। উযূ করার পর বিনা ওজরে সতরের কোনো অংশ অনাবৃত হলে ফরয পরিত্যাগের কারণে গোনাহ হবে। (আল মাবসূত, ১ম খণ্ড/ পৃষ্ঠা ১৯৬)

আব্দুল হাই মাসুম
মৌলভীবাজার টাউন কামিল মাদরাসা

গাড়িতে নামায আদায়ের পদ্ধতি কী?

জবাব: চলন্ত গাড়িতে নামায আদায়ে যেহেতু দাঁড়ানো ও সঠিকভাবে রুকু সিজদা আদায় করা সম্ভবপর হয় না। তাই নিকটবর্তী যাত্রা হলে এবং গন্তব্যে পৌঁছে নামায আদায় সম্ভব হলে বাস থেকে নেমে নিকটবর্তী মসজিদ বা সুবিধাজনক স্থানে নামায আদায় করা উচিত। আর দূরবর্তী যাত্রা হলে এবং বাস থামিয়ে নামায আদায় সম্ভব না হলে ওয়াক্ত চলে যাওয়ার আশংকার ক্ষেত্রে চলন্ত গাড়িতে যতটুকু সম্ভব মা'জুর মানুষের মতো বসে রুকু সিজদা ইশারায় হলেও আদায় করে ফরয বা ওয়াজিব নামায আদায় করা উচিত। এমতাবস্থায় কিবলাহমুখী হয়ে নামায আরম্ভ করার সুযোগ থাকলে সেটা করবে নতুবা যেদিকে আছে সেদিকেই পড়বে। তবে সতর্কতামূলক উক্ত নামায গন্তব্যে পৌঁছার পর পুনরায় পড়ে নেওয়া প্রয়োজন। (ফাতহুল কাদীর: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭০, আদ দুররুল মুখতার: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭১৪)

আবু রেদওয়ান রাজু
শাহজালাল উপশহর, সিলেট

আসরের নামাযের সর্বশেষ সময় কখন?

জবাব: আসরের নামাযের শেষ ওয়াক্ত ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। তাই কেউ সূর্য অস্তমিত হওয়ার আগে আসরের নামায আদায় করলে তা আদায় হয়েছে বলে গণ্য হবে। অবশ্য বিনা ওজরে সূর্যের রং পরিবর্তন হওয়া পর্যন্ত আসরের নামাযকে ইচ্ছাকৃতভাবে বিলম্বিত করা মাকরূহ হবে। (আল মাবসূত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪৪; বাদাইয়ুছ ছানায়ী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২৩; আল মুহীতুল বুরহানী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭৪)

হৃদয় অনিক তালুকদার

আযানে নবী করীম ﷺ এর নাম মুবারক শুনে বৃদ্ধাঙ্গুলি চুম্বন করার বিধান কি?

জবাব: আযানে মুআযযিন "আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ" বলার সাথে সাথে শ্রবণকারী এর জবাবে উক্ত বাক্য বলবে এবং তৎসঙ্গে প্রথমবারে "সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ" ও দ্বিতীয়বারে "কুররাতু আইনী বিকা ইয়া রাসূলাল্লাহ" বলে বৃদ্ধাঙ্গলিদ্বয়ের নখদ্বয় চুম্বন করে উভয় চোখে মাসেহ করবে। ইহা মুস্তাহাব। (রদ্দুল মুহতার: ১ম খণ্ড/ পৃষ্ঠা ৩৯৮)

হাফিজা খাতুন
ভরণ সুলতানপুর, জকিগঞ্জ, সিলেট

কোন মহিলার মাসিক রক্তস্রাব (হায়িয) কিংবা নেফাস চলাকালে কোন মৃত নারীর গোসল দিতে পারবে কি? দলীল সহকারে জানতে চাই।

জবাব: ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এর মতে মাকরূহ। অন্যান্য ইমামগণের মতে মাকরূহ ব্যতীত জায়িয। সুতরাং মৃত নারীর গোসল পবিত্র নারীরা দেওয়াই উত্তম। (বাদাইয়ুছ সানায়ী: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০৪)

সালমান খান
নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ

রোযা অবস্থায় যদি শরীরের কোন অঙ্গ থেকে রক্ত বের হয় কিংবা সিরিঞ্জ দিয়ে শরীর থেকে রক্ত বের করা হলে কি রোযা ভঙ্গ হবে?

জবাব: রোযা অবস্থায় শরীর থেকে রক্ত বের হলে রোযা ভঙ্গ হয় না। তদ্রুপ সিরিঞ্জ দ্বারা বের করা হলেও রোযা নষ্ট হয় না। তবে বিশেষ ওযর ছাড়া শরীর থেকে ইচ্ছাকৃত এ পরিমাণ রক্ত বের করা মাকরূহ, যার কারণে ওই দিন রোযা পূর্ণ করার শক্তি হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হয়। (সহীহ বুখারী, হাদীস ১৯৩৬, ১৯৪০; আল বাহরুর রাইক: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭৩; আল হিদায়াহ: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০০; ফিকহুন নাওয়াযিল: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০০; মাজমাউল আনহুর: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৬০)

রায়হান আহমদ
গোয়ালাবাজার, সিলেট

রোযা অবস্থায় চোখে ড্রপ ব্যবহারের ফলে মুখে তিক্ততা অনুভব হলে কী রোযা ভেঙ্গে যাবে?

জবাব: না, রোযা অবস্থায় চোখে ড্রপ ব্যবহার করলে রোযা ভাঙ্গবে না। এমনকি এর তিক্ততা মুখে বা গলায় অনুভব হলেও রোযা ভাঙ্গবে না। এ মাসআলাটি সাধারণ কিয়াসের বহির্ভূত সরাসরি আছার দ্বারা

প্রমাণিত। (ফাতাওয়া আলমগীরীঃ ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০৩, ২০৪; আল মুগনীঃ ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬; ফাতাওয়া তাতারখানিয়াঃ ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৭৯; বাদাইয়ুছ সানায়ীঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৩)

কামরুল হাসান
লালাবাজার, সিলেট

রোযা অবস্থায় কি দাঁত ব্রাশ করা যাবে? এতে কি রোযা নষ্ট হয়ে যাবে?

জবাবঃ রোযা অবস্থায় টুথপেস্ট বা মাজন দিয়ে দাঁত ব্রাশ করা মাকরূহ। পেস্ট বা মাজন গলার ভেতর চলে গেলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। তাই রোযা অবস্থায় টুথপেস্ট বা মাজন ব্যবহার করা উচিত নয়। ব্রাশ করতে হলে সাহরীর সময় শেষ হওয়ার আগেই করে নিতে হবে। (ফাতাওয়া আলমগীরীঃ ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯৯; খুলাসাতুল ফাতাওয়াঃ ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬৬, ইমদাদুল ফাতাওয়াঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪১; জাওয়াহিরুল ফিকহ: ৩য় খণ্ড)

রেদওয়ান আহমদ
রাজনগর, মৌলভীবাজার

রোযা অবস্থায় যদি কেউ স্যালাইন বা ইঞ্জেকশন নেয় তাহলে কি রোযা ভেঙ্গে যাবে? অসুস্থ অবস্থায় কেউ যদি গ্লুকোজ স্যালাইন নেয় তাহলে কি তার রোযা ভঙ্গ হবে?

জবাবঃ স্যালাইন বা ইঞ্জেকশন নিলে রোযা ভঙ্গ হয় না। তেমনিভাবে অসুস্থতার কারণে গ্লুকোজ স্যালাইন নিলেও রোযার ক্ষতি হবে না। তবে অসুস্থতা ছাড়া গ্লুকোজ স্যালাইন নেওয়া নাজায়িয। (আল হিদায়াহঃ ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০০, বাদাইয়ুছ সানায়ীঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০০; আলাতে জাদিদা কে শরয়ী আহকামঃ ১৫৩)

ফারুক উদ্দীন
দক্ষিণভাগ, বড়লেখা, মৌলভীবাজার

রামাদান মাসে রোযা অবস্থায় অসুস্থতার কারণে কোনো ব্যক্তির বমি হলে রোযা ভঙ্গ হবে?

জবাবঃ বমি হলে রোযা ভঙ্গ হয় না। কেননা রোযা অবস্থায় অনিচ্ছাকৃত বমি হলে (যদি তা বেশিও হয়) রোযা ভাঙ্গে না। অবশ্য কেউ ইচ্ছাকৃত মুখ ভরে বমি করলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, রোযা অবস্থায় (অনিচ্ছাকৃত) বমি হলে তা কাজা করতে হবে না। কিন্তু ইচ্ছাকৃত বমি করলে সে যেন তা কাজা করে নেয়। (তিরমিযী, হাদীস ৭২০; আল মুহিতুল বুরহানিঃ ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২৬)

আশিকুর রহমান
বিশ্বনাথ, সিলেট

করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন রোযা অবস্থায় নেওয়া যাবে কি?

জবাবঃ হ্যাঁ, নেওয়া যাবে। এতে রোযা ভঙ্গ হবে না। ইহা অন্যান্য ইনজেকশনের মতো পাকস্থলী বা মস্তিস্কে সরাসরি প্রবেশ করে না। (আল হিদায়াহঃ ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০০, বাদাইয়ুছ সানায়ীঃ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৩)

জুলহাস আহমদ চৌধুরী

কদমবুচি করার সময় ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় মাথা সামান্য নিচু হলে কি শিরক হবে? জানতে চাই।

জবাবঃ অবশ্যই না। যেহেতু যাকে কদমবুচি করা হয় তাকে উপাস্য মনে করে এরূপ করা হয় না। উক্ত সামান্য পরিমাণে মাথা নিচু হওয়াটা কেবল কদমবুচির সুবিধার্থে হয়ে থাকে। আর কদমবুচি শরীআতসম্মত বৈধ আমল হিসেবে বহু হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত। তাই উক্ত ঈষৎ মাথা নিচু হওয়া রুকু কিংবা সিজদার সাথে বাহ্যিক বা উদ্দেশ্যগত কোনো প্রকারের সাদৃশ্যতা রাখে না। অবশ্য ইবাদতের নিয়তে তথা কাউকে উপাস্য মনে করে রুকু কিংবা সিজদা করলে তা শিরক হিসেবে পরিগণিত।

জাহেদ আহমদ
নিতেশ্বর, গিয়াসনগর, মৌলভীবাজার

প্রশ্নঃ বর্তমান সমাজে প্রচলিত বিবাহ শাদীর মধ্যে হারাম, বিদআত ও কুসংস্কার কাজগুলো কী কী? জানতে চাই।

জবাবঃ বিবাহ শাদীর প্রচলিত অনুষ্ঠান বা আয়োজনে যে সকল হারাম সংগঠিত হয় তন্মধ্যে পাত্রী দেখার ক্ষেত্রে বেগানা পুরুষকে পাত্রী দেখানো, বেপর্দা ও বেহায়ামী, নাচ-গান ও বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার, বিবাহে যৌতুক চাওয়া, পাত্র ও পাত্রীর পক্ষদ্বয়কে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ করতে বাধ্য করা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

আর বিদআত বা বদ রসুমাতের আওতাভুক্ত বহু বিষয়াদি রয়েছে। যথা- গায়ে হলুদ, ব্যয়বহুল গেইট বা তোরণ নির্মাণ, গেইটে প্রবেশকালে বরকে আটকিয়ে টাকা প্রদানে বাধ্য করা, বর-কনের সালাম গ্রহণের বিনিময়ে সালামী প্রদান, বেগানা নারী পুরুষ আত্মীয়গণকে কদমবুচি করানো, শ্যালক-শ্যালিকা কর্তৃক অতিরিক্ত হাসি-তামাশা ইত্যাদি। এছাড়া বিবাহ পরবর্তী বাধ্যতামূলক কনে পক্ষকে ইফতার প্রেরণ, মৌসুমী ফল পাঠানো, বিশেষ বিশেষ সময়ে পিঠা-সন্দেশ প্রদানের আবশ্যকীয় নীতি সবই কুসংস্কার এবং পরিত্যাজ্য। এগুলো ছাড়াও আরো অনেক শরীআত পরিপন্থি বিষয়াবলি এলাকা বিশেষে প্রচলিত রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে নিকটস্থ বিশ্বস্ত ও বিজ্ঞ আলিমগণের নিকট থেকে জেনে নেওয়া এবং সেগুলো থেকে বেঁচে থাকা ঈমান ও তাকওয়ার পরিচায়ক। (ইসলাহুর রুসূম)

আব্দুল্লাহ

প্রশ্নঃ কোনো বিধর্মী কিংবা মুসলমান ব্যক্তি হারাম কাজের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে থাকলে তার অন্যান্য ভালো কাজের দরুণ তাকে অন্তর থেকে মুহব্বত করা যাবে কী? চাই সে জীবিত হোক কিংবা মৃত হোক।

জবাবঃ জীবিত কিংবা মৃত, মুসলমান কিংবা অমুসলমান যেকোনো ব্যক্তির কৃত ভালো কাজের স্বীকৃতি প্রদান বৈধ। তবে কোনো অমুসলমান কিংবা ফাসিক ব্যক্তিকে অন্তর দিয়ে মুহব্বত করা জায়িয নয়। এমনকি সে নিকটাত্মীয় হলেও, যেহেতু তার উপর আল্লাহ অসন্তুষ্ট।

(সূরা মুজাদালাহ, আয়াত-২২, সূরা মুমতাহিনা, আয়াত-১, সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড; পৃষ্ঠা-১০, সুনানে আবী দাউদ, হাদীস নং ৪৫৯৯, মুসনাদুল বাজ্জার, হাদীস নং ৪০৭৬, মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ২১৩০৩)

সৈয়দ বাকী বিল্লাহ জালালী
মনরাজ, পৃথিমপাশা, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার

প্রশ্নঃ আমার পরিচিত একজন লোক খ্রিষ্টান থেকে মুসলমান হয়েছেন বলে প্রত্যক্ষদর্শী তার ভাই ও বন্ধু সাক্ষ্য দিয়েছেন। কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে নিজের পক্ষ থেকে মুসলমান হওয়ার ঘোষণা দেওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ

লোককে মুসলমান মনে করে তার জন্য মাগফিরাতের দুআ বা ঈসালে সাওয়াব করা যাবে কী?

জবাব: উক্ত ব্যক্তির মুসলমান হিসেবে পরিগণিত হওয়ার বিষয়টি যদি কারো কাছে স্পষ্টরূপে ও সন্দেহাতীতভাবে সাব্যস্ত হয়ে থাকে তাহলে কেবল তার পক্ষে ঐ ব্যক্তির জন্য মাগফিরাতের দুআ কিংবা কোনো নেক কাজের সাওয়াব তার রূহের উপর পৌঁছাতে কোনো বাঁধা নেই। আর যদি মুসলমান সাব্যস্ত হওয়ার বিষয় সন্দেহযুক্ত থেকে যায় তবে এরূপ না করাই উচিত।
(সূরা তাওবাহ, আয়াত-১১৩ ও ১১৪)

আব্দুল্লাহ

নববধুর সঙ্গে কোনো আত্মীয়/অনাত্মীয় মহিলা পাঠানোর হুকুম কি?

জবাব: নববধুর সঙ্গে কোনো কোনো এলাকায় আত্মীয় বা অনাত্মীয় মহিলা বা কিশোরী পাঠানো হয়। প্রাথমিক অবস্থায় নববধুরা অধিক লজ্জাশীল থাকার কারণে নতুন অবস্থানে নিজের প্রয়োজন সারতে অনেক ক্ষেত্রে অসুবিধা বোধ করে থাকেন। তাই সহজভাবে নিজের আবশ্যক বিষয়াবলি সমাধানের ক্ষেত্রে সাহায্য সহায়তা করার নিমিত্তে তার সাথে পিত্রালয় থেকে এ রকম কাউকে পাঠানো হয়ে থাকে। শরীআতের দৃষ্টিতে এটি কোনো আবশ্যকীয় বিষয় নয়। প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে এটা জায়িয।

বদরুল ইসলাম
ডাইকের বাজার, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট

মীলাদ শরীফ এর উৎপত্তি কখন? সাহাবায়ে কিরাম কি মীলাদ পড়েছেন? ইমাম আবূ হানীফা (র.) কিংবা অন্যান্য মাযহাবের ইমামগণ কি মীলাদ পড়তেন বা মীলাদ শরীফ সম্পর্কে কোনো অভিমত করেছেন? কেউ কেউ বলেন মীলাদ শরীফের উৎপত্তি রাসূল ﷺ এর ইন্তিকালের ৫০০ বছর পরে হয়েছে- কথাটি কি সঠিক? এ বিষয়ে জানালে কৃতজ্ঞ হব।

জবাব: 'মীলাদ শরীফ' নামক প্রচলিত আমলের মধ্যে বহুবিধ নেক কাজ সংযুক্ত রয়েছে। যথা: কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত, দুরূদ শরীফ পাঠ, রাসূল ﷺ এর শানে রচিত কাসীদাহ-কবিতা পাঠ, তাঁর জন্মকালীন অলৌকিক ঘটনাবলির আলোচনা এবং দাঁড়িয়ে সালাত ও সালাম পেশ করা ইত্যাদি। আলাদাভাবে উপরোক্ত বিষয়ের প্রতিটির আমল রাসূল ﷺ এবং সাহাবায়ে কিরাম ও তৎপরবর্তী যুগে প্রচলিত ছিল। কিন্তু এগুলোর সমষ্টিগত রূপায়ণ ঘটেছে 'মাহফিলে মাওলিদ' নামে নামকরণের মাধ্যমে পরবর্তীতে ৬০৪ হিজরীতে। এর পর থেকে যুগশ্রেষ্ঠ মনিষীগণের অধিকাংশ বরেণ্য ব্যক্তিগণ এর প্রচলিত রূপরেখার বিশদ বিশ্লেষণপূর্বক একে জায়িয ও মুস্তাহসান বলে অভিমত পোষণ করেছেন।
তাই সাহাবায়ে কিরামের যুগে প্রচলিত রূপরেখার মীলাদ মাহফিল ছিল না। তবে এর মধ্যে সম্পাদিত কাজগুলোর সবগুলো আলাদাভাবে ছিল। অনুরূপ পরবর্তী তাবিঈন, তাবে-তাবিঈন ও মাযহাবের ইমামগণের যুগে এবং তৎপরবর্তী যুগেও আলাদাভাবে প্রত্যেকটির আমল প্রচলিত ছিল, যেহেতু বিষয়গুলোর সবকটি শরীআতে স্বীকৃত নেক কাজ। আর মাযহাবের ইমামদের থেকে প্রচলিত মীলাদ মাহফিল সম্পর্কে কোনো অভিমত এজন্য নেই যেহেতু তাদের যুগে এর প্রচলন হয়নি।
উল্লেখ্য যে, বর্তমান যুগের ওয়ায মাহফিলে কিরাত, গজল, ধর্মীয় আলোচনা, চাঁদা কালেকশন, কোথাও পাগড়ি প্রদান বা পুরস্কার বিতরণ এবং দুআ মুনাজাত, শিরনী বিতরণ ইত্যাদি হয়ে থাকে। আলাদাভাবে এগুলোর প্রত্যেকটি শরীআতের দৃষ্টিতে জায়িয থাকার কারণে প্রচলিত ওয়ায মাহফিলে এগুলো একত্রে সম্পাদিত হওয়ার কারণে ওয়ায মাহফিল জায়িয হবে কি না- এ বিষয়ে কেউ আপত্তি করেন না কিংবা প্রশ্ন উত্থাপন করেন না। তদ্রুপ বৈধ বিষয়াবলি সম্বলিত মীলাদ মাহফিলের বৈধতা বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করাও অসমীচীন ও অনুচিত। (হুসনুল মাকসাদ ফী আমালিল মাওলিদ, আল হাবী লিল ফাতাওয়া: ১ম খণ্ড/পৃষ্ঠা ২২২, ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকীম, ফায়সালায়ে হাফত মাসআলা, আল মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ, মা ছাবাতা বিস সুন্নাহ)

মো. মিনহাজ উদ্দিন
সহকারী শিক্ষক, বাউরভাগ দক্ষিণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
কানাইঘাট, সিলেট

চাকরিজীবীদের জন্য জেনারেল প্রভিডেন্ড ফান্ডে প্রতি মাসের মূল বেতনের কিছু অংশ বাধ্যতামূলক কর্তন করে এবং চাকরি পরবর্তী জীবনে বছরে ১৩% হারে লভ্যাংশসহ প্রদান করে থাকে। এটা গ্রহণ হালাল কিনা? জানতে চাই।

জবাব: প্রভিডেন্ট ফান্ডের নিয়ম দুধরনের হতে পারে।
যথা-(ক) বেতনের নির্দিষ্ট অংশ বাধ্যতামূলক কর্তন; অর্থাৎ উক্ত ফান্ডে বেতন থেকে কেটে রাখা যদি বাধ্যতামূলক সরকারী নীতিমালার আওতাধীন বিধায় কোনো চাকরিজীবি এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকে না। যা পরবর্তীতে প্রভিডেন্ট ফান্ডরূপে দেওয়া হয়ে থাকে। তাহলে উক্ত প্রভিডেন্ট ফান্ড সুদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা বেতনের কর্তনকৃত ঐ অংশ ইচ্ছা করলেও উক্ত চাকরিজীবি এখন শোধ করতে পারবে না। আর হস্তগত হওয়ার পূর্বে কেউ কোনো বেতন ভাতার মালিক হতে পারে না। যখন সে উক্ত টাকার মালিকই হয়নি, তখন কীভাবে এ টাকাকে সুদে লাগাবে। তাই বাধ্যতামূলক কর্তনকৃত টাকার প্রভিডেন্ট ফান্ডকে সুদ বলা যাবে না।
বরং এক্ষেত্রে এটাই অনুমান করা হবে যে, বেতন-ভাতার অপরিশোধিত সেই টাকাগুলোই এখন তার হস্তগত হচ্ছে।
এখানে সবগুলোকেই তার বেতনরূপে গণ্য করা হবে।

(খ) কেটে রাখা বেতনের অংশ রাখার নিয়ম যদি ইচ্ছাধীন নীতিমালার আওতাধীন থাকে। যা ইচ্ছা করলে এড়িয়ে চলা যায়। তাহলে যতটুকু টাকা ইনকাম ট্যাক্সরূপে কেটে রাখা হয়েছে, পরবর্তীতে প্রভিডেন্ট ফান্ডের ততটুকু টাকাই তার জন্য গ্রহণ করা জায়িয হবে। অতিরিক্ত টাকাকে এক্ষেত্রে সুদ হিসেবে গণ্য করা হবে। কেননা সে ইচ্ছা করলে কর্তনকৃত ঐ টাকাগুলোকে পূর্বেই নিজ হাতে নিয়ে আসতে পারত। যখন সে ইচ্ছা করে আনেনি। তাই বুঝা গেল যে, সে ইচ্ছা করে সুদে লাগিয়েছে। (জাদীদ ফিকহী মাসাইল: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৬)

রায়হান হোসেন

১। একজন আলিম ব্যক্তি রাসূল ﷺ কে মাটির সৃষ্টি হিসেবে উপস্থাপন করতে গিয়ে একটি দৈনিক পত্রিকায় লিখেছেন "রাসূল ﷺ যদি নূরের হন তাহলে তার মর্যাদা মানুষের চেয়ে কম হয়ে যায়, কেননা মানুষ তো আশরাফুল মাখলুকাত।" এ সম্পর্কে সঠিক জবাব কি?

২। উমর কাযা নামাযের ওয়াক্তের সংখ্যা যদি মনে না থাকে তাহলে তার করণীয় কি?

জবাব-১: উক্ত মাওলানার কথা কয়েকটি কারণে পরিত্যাজ্য। যথা: ১)

তার কথায় স্পষ্টত বুঝা যায় যে, তার মতে রাসূল ﷺ নূরের হলে মানুষের শ্রেণিভুক্ত থাকবেন না, অথচ একথা দলীল বহির্ভূত একটা ভ্রান্ত ধারণা মাত্র। পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ নূর এবং বাশার তথা মানুষ।

২) তার কথায় একথা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, সকল মানুষের সৃষ্টির উপাদান সরাসরি মাটি হওয়া আবশ্যক এবং মাটি ব্যতীত অন্য কোনো কিছু দ্বারা মানুষকে বানানো হয়নি। অথচ হযরত হাওয়া (আ.) হযরত আদম (আ.) এর বাম পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি হওয়ার বিষয়টি কুরআন সুন্নাহ থেকে অকাট্যভাবে সাব্যস্ত। অদ্রূপ অন্যান্য মানুষকে পিতা-মাতার বীর্য থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে বহু আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

৩) তার বক্তব্যে একথা স্পষ্ট যে, নূর এবং অন্যান্য সবকিছুর চেয়ে মাটির মূল্য বেশি। যদি তা সত্যি হতো তাহলে ইবলিস আল্লাহর সামনে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করত না যে, "আমি তার থেকে উত্তম, যেহেতু আপনি আমাকে আগুন দিয়ে বানিয়েছেন এবং তাকে মাটি থেকে তৈরি করেছেন।"

সর্বোপরি, দামি কিংবা সম্মানিত হওয়ার কারণ কেবল সৃষ্টির উপাদানের দিক থেকে সম্মানিত হওয়া নয় বরং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সম্মান অর্জিত হওয়া। কেননা মুমিন ও কাফির এক ধরনের উপাদান থেকে সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও মুমিন আল্লাহর নিকট সম্মানিত এবং কাফির অপমানিত। তাই জনৈক মাওলানার উপরোক্ত উক্তি অযৌক্তিক ও অবান্তর বৈ কি হতে পারে?

জবাব-২: কারো দায়িত্বের ফরয কোনো নামায অনাদায় থাকলে বা ছুটে গেলে চাই সেটা নতুন কিংবা পুরাতন হোক, সংখ্যায় কম বা বেশি যাই হোক সে নামাযকে 'ফাওয়াইত' নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। এর কাযা করা শরীআতের বিধানানুযায়ী ফরয। এরকম নামাযের সংখ্যা কারো অজানা থাকলে কাযা আদায়ের ক্ষেত্রে এতটুকু বেশি পরিমাণে আদায় করে নেওয়া বাঞ্ছনীয়। যাতে অনাদায় রয়েছে বলে কোনো সন্দেহ না থাকে। উল্লেখ্য যে, ছুটে যাওয়া নামাযের সংখ্যা ছয় বা ততোধিক হলে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা আবশ্যক নয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে আগের ছুটে যাওয়া নামায আগে আদায় করা জরুরি নয়। আর সংখ্যায় পাঁচ কিংবা তার চেয়ে কম সংখ্যক হলে কাযার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা অপরিহার্য, যতক্ষণ না সময়ের অভাবে নির্দিষ্ট ওয়াক্তের নামায অনাদায় থাকার আশঙ্কা দেখা না দেয়।

আর উমর কাযা বলতে ফকীহগণ যা বুঝিয়েছেন তা হচ্ছে অতীত জীবনের আদায়কৃত সকল ফরয ও ওয়াজিব নামায মনোযোগ ও অধিক যত্ন সহকারে পুনরায় পড়া, চাই সে সকল নামাযে ভুল-ত্রুটির সম্ভাবনা সন্দেহ থাকুক কিংবা না থাকুক। তাই উমর কাযার ক্ষেত্রে নামাযের সংখ্যার হিসাব করা হবে কোনো ব্যক্তির বালেগ হওয়ার সম্ভাব্য বয়স থেকে গণনা করে। উল্লেখ্য যে, উমর কাযা ফকীহগণের কারো কারো মতে মুস্তাহাব।

(কানযুদ্দাকাইক: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮১, আদ দুররুল মুখতার: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৭, আল বাহরুর রাইক: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৬, আল জাওহারাতুন নায়্যিরাহ: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৭)

মদিনার রহস্যময় পাহাড়: যেখানে সবকিছু চলে উল্টো

আপনি ইঞ্জিন বন্ধ গাড়িতে বসে আছেন, তারপরও গাড়ি চলছে। আর চলাটা স্বাভাবিক নয়, উল্টোভাবে! শুধু চলছে বললে ভুল হবে। ধীরে ধীরে গাড়ির গতি বাড়ছে। আপনার কাজ শুধু স্টিয়ারিং ধরে গাড়ির দিকটি ঠিক রাখা। শুধু গাড়ি নয়, পানির বোতল কিংবা পানি ফেললে, জুতা রেখে দিলে তাও ঢালুর বিপরীত দিকে গড়াতে থাকে। বিষয়টি অলৌকিক মনে হলেও এমনি ঘটনা ঘটে মদিনার রহস্যময় জিনের পাহাড়ের পথে। আরবরা অবশ্য এই পাহাড়কে জিনের পাহাড় বলেন না। তাদের কাছে এই পাহাড়ের নাম ওয়াদি আল আবইয়াদ বা ওয়াদি আল বায়দা।

কথিত ওয়াদি আল জিনের অবস্থান মদিনা শহর থেকে ৪৫ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে। মদিনা থেকে বের হয়ে কিছু খেজুর বাগান পার হয়ে যেতে হয় এলাকাটিতে। খেজুর বাগানের পর পাহাড়ি পথ। পাহাড়ের মধ্যখান দিয়ে বয়ে গেছে পিচঢালা সড়ক। আর সেই সড়কেই লুকিয়ে আছে এমন অপার বিস্ময়। ওয়াদি আল জিন এলাকার রাস্তা খুব উঁচু নয়, তারপরও শো শো আওয়াজে কান ভারি হয়ে যায়। পাহাড়ের ঢালে নেমে দাঁড়ালে মনে হয়, কেউ যেন পেছন থেকে ঠেলে দিচ্ছে। স্থানীয় আরবরা ছুটির দিন ওয়াদি আল জিনে অবসর কাটাতে আসেন।

২০১০ সালের দিকে সাউদি সরকার ওয়াদি আল বায়দায় একটি রাস্তা বানানোর পরিকল্পনা করে। কিন্তু ৩০ কিলোমিটার পর্যন্ত কাজ করার পর সমস্যা শুরু হয়। হঠাৎ দেখা যায়, রাস্তা নির্মাণের যন্ত্রপাতি আস্তে আস্তে মদিনা শহরের দিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলে যাচ্ছে। যেন অদৃশ্য কোনো শক্তি যন্ত্রপাতিগুলো মদিনার দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।

এসব দেখে কর্মরত শ্রমিকরা ভয় পেয়ে যায় এবং কাজ করতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে রাস্তার নির্মাণ কাজ এখানেই বন্ধ হয়ে যায়।

জিনের পাহাড়কে ঘিরে মানুষের মাঝে রয়েছে অনেক কৌতূহল। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে অসংখ্য পর্যটক এখানে আসেন পাহাড়টি দেখতে। হজ্জ পালন শেষে মদীনায় আসা হাজীদের অনেকেই রহস্যময় পাহাড়টি দেখার জন্য ভিড় জমান।

বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল

তুর্কেমেনিস্তানের ডারভায শহরের ক্যারিবীয় সাগরের এক কল্পিত ত্রিভুজ এলাকা হলো বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল। ত্রিভুজের তিন বিন্দুতে আছে ফ্লোরিডা, বারমুডা এবং প্যুয়ের্তো রিকো। এটি একটি জ্বলন্ত গর্ত। জ্বলন্ত জায়গাটি 'নরকের দরজা' নামে পরিচিত। ১৯৭১ সাল থেকে জায়গাটি একটানা দাউ দাউ করে জ্বলছে। এখানে গ্যাস খনির সন্ধান মেলে। প্রাথমিকভাবে গবেষণা করে বিষাক্ত গ্যাসের ব্যাপারে গবেষকরা নিশ্চিত হন। যার পরিমাণ ছিল সীমিত। সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, এই গ্যাস জ্বালিয়ে শেষ করা হবে। ফলে এর বিষাক্ততা ছড়ানোর সুযোগ পাবে না। এরপর এখানে গর্ত করে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এখনও অর্থাৎ ৫০ বছর ধরে অবিরাম জ্বলছে। পৃথিবীর সবচেয়ে আশ্চর্যজনক স্থানগুলোর মধ্যে অন্যতম এই বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল। এটা শয়তানের ত্রিভুজ নামেও পরিচিত। এর রহস্যচিত্র তখন উদঘাটন করেন ইভি ডব্লিউ জোনস। আটলান্টিক মহাসাগরের একটি বিশেষ অঞ্চলে এটি অবস্থিত। যেখানে বেশ কিছু জাহাজ ও বিমান রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে গেছে। যার রহস্য আজও অজানা। অনেকে মনে করেন ঐ সকল অন্তর্ধানের কারণ নিছক দুর্ঘটনা। যার কারণ হতে পারে প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা চালকের অসাবধানতা। আবার চলতি উপকথা অনুসারে এসবের পেছনে দায়ী হলো কোন অতিপ্রাকৃতিক শক্তি।

অভ্যন্তরীণ

সুখী দেশ সূচকে ১০১তম বাংলাদেশ

জাতিসংঘের সৌজন্যে ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস রিপোর্ট ২০২১-এ প্রকাশিত র‍্যাংকিংয়ে আগের ১০৭তম অবস্থান থেকে ছয় ধাপ এগিয়ে ১০১তম স্থান পেয়েছে বাংলাদেশ। ২০১৮-২০২০ সাল পর্যন্ত বিশ্বের ১৪৯টি দেশে জরিপ চালিয়ে এই প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। এই তালিকায় প্রথম স্থানে ফিনল্যান্ড ও তলানীতে আফগানিস্তানের নাম। মানুষ তার ব্যক্তিগত জীবনে কতোটা সুখী সেটার গড় মূল্যায়ণে প্রাপ্ত স্কোর অনুযায়ী তালিকার ৬৮ নম্বর পেয়েছে বাংলাদেশ। মূলত ১৪৯টি দেশের মানুষকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে তাদের সুখ পরিমাপ করা হয়েছে। সুখের পরিমাপক হিসেবে দেশটির সামাজিক সুযোগ-সুবিধা, সামাজিক উদারতা, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, মোট দেশজ উৎপাদন-জিডিপি, গড় আয়ু এবং দুর্নীতির মাত্রা বিষয়গুলোকে সামনে রাখা হয়। তবে এবার সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে করোনাভাইরাস মহামারীতে মানুষের সার্বিক পরিস্থিতিকে।

সমুদ্র তলদেশ কর্তৃপক্ষের সদস্য হলো বাংলাদেশ

আন্তর্জাতিক সমুদ্র তলদেশ কর্তৃপক্ষের (আইএসএ) পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছে বাংলাদেশ। ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত চার বছর মেয়াদে এই পরিষদ কাজ করবে। গত ৫ মার্চ জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন থেকে এ তথ্য জানানো হয়। আইএসএ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার ফলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি নিজস্ব স্বার্থ সংরক্ষণে বাংলাদেশের সুযোগ আরও বৃদ্ধি পাবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক সমুদ্র তলদেশ কর্তৃপক্ষের সদরদপ্তর জ্যামাইকার রাজধানী কিংস্টোনে অবস্থিত। পরিষদটির সদস্য সংখ্যা ৩৭। প্রতিষ্ঠানটি জাতিসংঘের সমুদ্র আইন বিষয়ক কনভেনশনের আওতায় বিশ্বের সব মানুষের কল্যাণে আন্তর্জাতিক সমুদ্র তলদেশ এলাকায় খনিজ সম্পর্কিত সব ধরনের কার্যক্রম, সংগঠন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

খাদ্য নিরাপত্তায় বিশ্বব্যাংকের ঋণ অনুমোদন

কৃষি ও মৎস্যখাতে উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশে খাদ্য নিরাপত্তা উন্নয়নে ১২ কোটি ডলার ঋণ অনুমোদন দিয়েছে বিশ্বব্যাংক। বিশ্বব্যাংকের ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের (আইডিএ) কাছ থেকে পাঁচ বছরের গ্রেস পিরিয়ডসহ ৩৫ বছর মেয়াদে এই অর্থ ঋণ হিসেবে পাবে বাংলাদেশ। 'দ্য ক্লাইমেট স্মার্ট অ্যান্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট' প্রকল্পের আওতায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ, ড্রেন ও সেচ অবকাঠামো তৈরি ও আধুনিকায়নের জন্য এই বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে এক লাখ ১৫ হাজার হেক্টর জমিতে সেচ ও ড্রেন উন্নত করতে সহায়তা করা হবে। এত করে বন্যার কারণে ফসলের ক্ষতি ৬০ শতাংশ কমবে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঝুঁকিতে থাকা এক লাখ ৭০ হাজার দরিদ্র মানুষের আয় বৃদ্ধি করতে সহায়তা করবে এই প্রকল্পটি। এই প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের ক্লাইমেট স্মার্ট প্রযুক্তি, নতুন শস্য নিয়ে পরীক্ষা এবং ফসল উৎপাদন পরবর্তী ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এছাড়াও উপকূল অঞ্চলে ধান ও মাছ চাষে সহযোগিতা, কোল্ড স্টোরেজ সুবিধা এবং স্থানীয় বাজার উন্নয়নেও কাজ করা হবে এই প্রকল্পের মাধ্যমে।

১১তম গ্রেডে বেতন পাবেন ইবতেদায়ী প্রধান শিক্ষক

সংশোধিত এমপিও নীতিমালা অনুসারে ১১তম গ্রেডে বেতন পাবেন ইবতেদায়ী মাদরাসার প্রধান শিক্ষকরা। ইতোমধ্যেই এ সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রদান করেছে সরকার। এ বিষয়ে চলতি এপ্রিল মাস থেকে অনলাইনে আবেদন নেয়ার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে মাদরাসা শিক্ষা অধিদফতর। গত ২৩ মার্চ মাদরাসা শিক্ষা অধিদফতর সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। ইবতেদায়ী মাদরাসার প্রধানরা সংশোধিত এমপিও নীতিমালা অনুসারে বর্ধিত গ্রেডে বেতন পাচ্ছেন না। নীতিমালায় ১১তম গ্রেডে বেতনের কথা বলা হলেও ১৫ গ্রেডে বেতন পেয়ে তারা বঞ্চিত হচ্ছেন। নীতিমালা অনুসারে শিক্ষকদের ১১তম গ্রেডে বেতন দেওয়ার আদেশ জারী হয় এক বছর আগে। তবুও তা বাস্তবায়িত হয়নি। এবার মাদরাসার এমপিও নীতিমালা সংশোধন করে কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগের আদেশ জারি করা হয়।

২৩ মে খুলবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

আগামী রোযার ঈদের পর দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দেওয়া হবে। গত ২৫ মার্চ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়। এতে বলা হয়েছে, রোযার ঈদের পর ২৩ মে দেশের সব মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান শুরুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কোভিড-১৯ সংক্রান্ত জাতীয় পরামর্শক কমিটির সঙ্গে পরামর্শ করে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। উল্লেখ্য, করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে গত বছরের ১৭ মার্চ থেকে দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। এরপর ধাপে ধাপে এই ছুটি বাড়ানো হয়েছে।

মোদির আগমনে ১৭ জনের প্রাণহানি

স্বাধীনতার ৫০ বছরপূর্তিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফর ছিল গতমাসের সবচেয়ে আলোচিত ঘটনা। তার সফরকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রতিক্রিয়া ছিল লক্ষ্যণীয়। আলিম-উলামা থেকে শুরু করে শিক্ষার্থী এমনকি বাম রাজনীনিকরাও সম্রাজ্যবাদী এ নেতার বাংলাদেশ সফরের প্রতিবাদ জানান। গত ২৬ মার্চ শুক্রবার ঢাকায় পৌঁছেন মোদি। তাকে লাল গালিচা সংবর্ধনা ও গার্ড অব অনার দেওয়া হয়। এদিকে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভে ফুঁসে ওঠে দেশের মানুষ। বাদ জুমুআ জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম পরিণত হয় রণক্ষেত্রে। সাঁজোয়া যান থেকে গুলি ছুড়ে পুলিশ। গুলিবিদ্ধ হন অনেকে। মসজিদের মেঝেতে রক্তের ছোপ দেখা যায়। চট্টগ্রামের হাটহাজারিতে প্রতিবাদ মিছিলে বাধা দিলে পুলিশের সাথে সংঘর্ষে ৪ জন, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আরো ১জন নিহত হন। পরদিন প্রতিবাদ মিছিলে আবারো পুলিশের সাথে বিক্ষুব্ধ জনতার সংঘর্ষ হয়। এতে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় মারা যান আরো ৫ জন। রবিবার হরতাল চলাকালে পুলিশ ও বিজিবি'র গুলিতে মারা যান আরো ৭জন। আহত ও গ্রেফতার হয়েছেন অনেকে।

প্রথমবারের মতো কিনোয়া চাষ

দেশে প্রথমবারের মতো উত্তর আমেরিকার ফসল কিনোয়ার চাষাবাদ শুরু হয়েছে। লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম ও পটুয়াখালীতে মোট পাঁচটি প্লটে নতুন ফসলটির আশানুরূপ উৎপাদন হয়েছে। কিনোয়া হলো উচ্চ প্রোটিন সম্পন্ন খাবার। এটিকে সুপার ফুডও বলা হয়। সালাদ থেকে শুরু করে ডেজার্টেও খাওয়া যায় কিনোয়া। কিনোয়া দিয়ে যেমন ফালুদা বানানো যায় তেমনি বিরিয়ানিও রান্না করা যায়। কিনোয়া অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে এবং লাইসিন সমৃদ্ধ, যা সারা শরীর জুড়ে স্বাস্থ্যকর টিস্যু বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। কিনোয়া আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম, ভিটামিন ই,পটাসিয়াম এবং ফাইবারের একটি উৎকৃষ্ট উৎস। এক কাপ কিনোয়ায় পাওয়া যায় ২২২ ক্যালরি ও ২২ গ্রাম কার্বস রান্না করা হলে এর দানাগুলো আকারে চারগুণ বড় হয়ে যায় এবং দেখতে প্রায় স্বচ্ছ। আন্তর্জাতিক বাজারে কিনোয়ার ব্যাপক চাহিদা আছে। রাজধানী ঢাকাসহ বড় শহরগুলোতে কিনোয়ার চাহিদা আছে। আমদানিকৃত প্রতি কেজি কিনোয়া কিনতে হচ্ছে ১৬০০ টাকা দরে। প্রতি শতাংশ জমিতে কিনোয়া চাষ করতে খরচ হয় ৫০০-৬০০ টাকা আর উৎপাদন হতে পারে ৪-৬ কেজি। নভেম্বরের মাঝামাঝি এ ফসল চাষ করে মার্চের প্রথম সপ্তাহ থেকে মাঝামাঝি সময় ফলন ঘরে তোলা যায়।

আন্তর্জাতিক

হজ্জ প্রটোকল ঘোষণা করলো সউদি আরব

করোনা মহামারির প্রেক্ষাপটে ২০২১ সালে পবিত্র হজ্জ পালনের জন্য হজ্জ প্রটোকল ঘোষণা করেছে সউদি সরকার। এতে বলা হয়েছে, করোনার কারণে চলতি বছর হজ শুধুমাত্র ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়সীরা অংশ নিতে পারবেন। প্রটোকল অনুযায়ী হজ্জে অংশগ্রহণকারীরা সউদি আরবে অবতরণের কমপক্ষে ১ সপ্তাহ আগে করোনা ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ডোজগ্রহণের প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। এছাড়া সউদি আরবে অবতরণের ৭২ ঘণ্টা আগে করা করোনা ভাইরাসের পিসিআর টেস্টের নেগেটিভ রিপোর্টও সঙ্গে রাখতে হবে। একইসঙ্গে সউদি আরবে পৌঁছানোর পর হজ্জ যাত্রীদের টানা ৭২ ঘণ্টা কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে এবং তাদের পুনরায় পিসিআর টেস্ট করা হবে এবং নেগেটিভ রিপোর্ট আসার পর কোয়ারেন্টাইন সমাপ্ত হবে। মহামারি করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ফের বৃদ্ধি পাওয়ায় আসন্ন রামাদানেও উমরা পালন, মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববীতে ইতিকাফসহ ইফতার আয়োজন হচ্ছে না। তবে প্রয়োজনীয় সতর্কতা ও নিয়ম মেনে খতমে তারাবি ও কিয়ামুল লাইল অনুষ্ঠিত হবে।

ইরাক ও আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহার করবে যুক্তরাষ্ট্র

আফগানিস্তানে জোরালো কূটনৈতিক উদ্যোগ শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্র। নতুন উদ্যোগ অনুযায়ী, তালেবানের অংশগ্রহণে একটি অন্তবর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠা এবং আফগানিস্তানের মাটিতে সব ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অবসান ঘটানোর কথা বলা হয়েছে। এ প্রচেষ্টার সাফল্যের ওপরই আফগানিস্তান থেকে মার্কিন বাহিনী প্রত্যাহারের বিষয়টি অনেকাংশে নির্ভর করছে। মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের ফাঁস হওয়া একটি গোপন চিঠি থেকে বিষয়টি ওঠে এসেছে। তালেবানের সঙ্গে ট্রাম্প প্রশাসনের স্বাক্ষরিত চুক্তি ২০২১ সালের মে মাসে কার্যকর হওয়ার কথা ছিল। এর আওতায় আফগানিস্তান থেকে অবশিষ্ট আড়াই হাজার মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের কথা রয়েছে।

এদিকে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরাক থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহার ইস্যুতে ফের আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের বাইডেন প্রশাসন। আগামী এপ্রিলে প্রথমবার আলোচনা হবে বলে জানিয়েছে হোয়াইট হাউস। ইরাকে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের আড়াই হাজার সেনা মোতায়েন রয়েছে। এবার সেই আড়াই হাজার মার্কিন সেনা প্রত্যাহার করা নিয়ে আলোচনায় বসবেন দুই দেশের কর্তারা। তবে শুধু সেনা প্রত্যাহার নিয়েই নয় বাণিজ্য, পরিবেশ, সাংস্কৃতিক বিষয়েও আলোচনা হবে। দ্বিপক্ষীয় স্বার্থের বিষয়েও কথা হবে। ইরানের জেনারেল কাশেম সোলাইমানি ও ইরাকের মিলিশিয়া নেতা আবু মাহদি আল-মুহান্দিকে হত্যার পর ওয়াশিংটনের সঙ্গে বাগদাদের সম্পর্ক খারাপ হয়। এরপর ইরাকের পার্লামেন্টে মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোট বাহিনীর চলে যাওয়ার ব্যাপারে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। -ডয়েচে ভেলে

পাকিস্তানের সাথে সুসম্পর্ক চান মোদি

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান বলেছিলেন, শান্তির জন্য এগিয়ে আসতে হবে ভারতকেই। এবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও পাকিস্তানের সাথে সুসম্পর্ক চান বলে বার্তা দিয়েছেন। গত ২২ মার্চ পাকিস্তানের জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জানিয়ে ইমরান খানকে চিঠি লেখেন তিনি। চিঠিতে মোদি লিখেছেন, 'পাকিস্তানের জাতীয় দিবসে সমস্ত নাগরিককে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। প্রতিবেশী দেশ হিসেবে পাকিস্তানের নাগরিকদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে চলতে আগ্রহী ভারত। বৈরিতা কাটিয়ে এ জন্য পারস্পরিক বিশ্বাসের পরিবেশ তৈরি করা জরুরি।' তিনি বলেন, 'মানবতার জন্য এই কঠিন সময়ে, কোভিড-১৯ মহামারির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমি আপনি ও পাকিস্তানের জনগণের প্রতি আমার শুভ কামনা জানাচ্ছি।' উরিতে সার্জিকাল স্ট্রাইক, পুলওয়ামায় বিস্ফোরণ, বালাকোটে এয়ার স্ট্রাইক ইত্যাদির পর পাক-ভারত সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছিল। কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহার করে নেয়ার পর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও শীতল হয়ে যায়। দীর্ঘ সময় পর প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে উষ্ণ বার্তা দিয়ে এই চিঠি পাঠালেন নরেন্দ্র মোদি। - এক্সপ্রেস ট্রিবিউন

সিরিয়া সংকটের রাজনৈতিক সমাধানের উদ্যোগ

সিরিয়া সংকটের রাজনৈতিক সমাধানের যৌথ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তুরস্ক, রাশিয়া ও কাতার। তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেভলুট কাভুসোলগু গত ১১ মার্চ এ তথ্য জানান। আলজাজিরার এক প্রতিবেদনে বলা হয়, তিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁদের বৈঠকে সামরিক সমাধানকে সংঘাত নিরসনের একমাত্র উপায় বলে মনে করেননি। তাঁরা জাতিসংঘের প্রস্তাবগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রাজনৈতিক সমঝোতার ওপর জোর দেন। সিরিয়ায় এক দশকের বেশি সময় ধরে চলা সংঘাতে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন এবং বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। বৈঠকের পর ওই তিন মন্ত্রীর যৌথ বিবৃতিতে সিরিয়ার সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা, ঐক্য ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষা করার প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি পুনরায় নিশ্চিত করা হয়। কাতার ও তুরস্ক সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদকে টেনে নামানোর লক্ষ্যে বিদ্রোহী সেনাদের অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করার বিষয়ে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে গুঞ্জন ছিল। একইভাবে বাশার আল-আসাদকে রাশিয়ার সামরিক সহায়তা প্রদানেরও অভিযোগ রয়েছে।

সক্ষমতায় মার্কিন নৌবাহিনীকে পেছনে ফেলেছে চীন

নতুন এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার, যুদ্ধবিমান, ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র বহনকারী সাবমেরিন যুক্ত করে নৌবাহিনীর শক্তিমত্তা বাড়িয়েই চলেছে চীন। মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএনের বিশ্লেষণ, সক্ষমতায় এরই মধ্যে মার্কিন নৌবাহিনীকে ছাড়িয়েছে চীন। ইউএস অফিস অব নেভাল ইন্টেলিজেন্স (ওএনআই) এর তথ্য অনুযায়ী, ২০১৫ সালে চীনা নৌবাহিনীর বহরে ২৫৫টি যুদ্ধজাহাজ ছিল। ২০২০ সালের শেষের দিকে যুদ্ধজাহাজের সংখ্যা বেড়ে ৩৬০ এ দাঁড়িয়েছে। যা যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে ৬০টি বেশি। আগামী চার বছর পর, চীনের কাছে ৪০০টি যুদ্ধজাহাজ থাকবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে ওএনআই। তবে এখনও সেনা সংখ্যার দিক থেকে এগিয়ে আছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন নৌবাহিনীতে প্রায় ৩ লাখ ৩০ হাজার সেনা আছে। অন্যদিকে চীনের নৌবাহিনীতে আছে ২ লাখ ৫০ হাজার সেনা।

জাহাজ আটকে বন্ধ সুয়েজ খাল

বিশাল আকারের একটি মালবাহী জাহাজ আটকে পড়ায় মিশরের সুয়েজ খালের জলপথটি বন্ধ হয়ে গেছে। আলজাজিরার এক প্রতিবেদনে বলা হয়, গত ২৩ মার্চ ভোরে লোহিত সাগর থেকে ভূমধ্যসাগরে যাওয়ার সময় দুই লাখ টনের একটি জাহাজ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সংকীর্ণ খালটিতে আড়াআড়িভাবে আটকে যায়। এতে পেছনে থাকা আরও ১৫টি জাহাজ আটকে গিয়ে জট তৈরি হয়। লয়েড'স লিস্টের তথ্যমতে, এতে প্রতিদিন ৯৬০ কোটি টাকার পণ্য পরিবহণ আটকে আছে। ফলে প্রতিঘণ্টায় ক্ষতি হচ্ছে ৪০ কোটি ডলার। এভারগ্রিন নামের মালবাহী জাহাজটি নেদারল্যান্ডের রটারড্যাম বন্দরে যাচ্ছিল। বিশেষজ্ঞদের মতে, পূর্ণ জোয়ারের সময় জাহাজটিকে আড়াআড়ি অবস্থান থেকে সোজা করা না গেলে মাল নামিয়ে তা করতে হবে। এতে কয়েকদিন লেগে যেতে পারে। ২০২০ সালে প্রায় ১৯ হাজার বা প্রতিদিন গড়ে ৫১টি জাহাজ সুয়েজ খাল দিয়ে চলাচল করেছে। দেড়শ বছরের পুরানো সুয়েজ খাল বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য রুট। আন্তর্জাতিক সমুদ্রবাণিজ্যের প্রায় ১২ শতাংশ পণ্য সুয়েজ খাল দিয়ে পরিবাহিত হয়।

জানার আছে অনেক কিছু

উপমহাদেশের প্রথম মাদরাসা

উপমহাদেশে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে যেসকল মনীষী আগমন করেছিলেন তাদের মধ্যে আল্লামা শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা বুখারী আদ দেহলভী আল হানাফী (র.) অন্যতম। তাঁর জন্মস্থান বর্তমান উজবেকিস্তানের রাজধানী বুখারা। ১২৭৭ সালে সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবনের আমলে তিনি দিল্লীতে আগমন করেন। পরবর্তীতে সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের অনুরোধে তিনি তৎকালীন বাংলার রাজধানী

সোনারগাঁয়ে আসেন। বাংলার সুলতানের অনুরোধ ও সহযোগিতায় তিনি পানামনগরে একটি মাদরাসা ও সমৃদ্ধ পাঠাগার গড়ে তুলেন। মাদরাসার শিক্ষার্থীদের তিনি ইলমে হাদীস, ফিকহ, তাসাউফ, গণিত, ভূগোল ও ভেষজশাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। প্রতিবছর প্রায় দশহাজার শিক্ষার্থী এ মাদরাসায় পড়াশোনা করতেন। শিক্ষা শেষে যারা উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে জ্ঞান বিতরণ করে উপমহাদেশকে ইসলামের আলোয় আলোকিত করেন। ভারতীয় উপমহাদেশে তিনিই প্রথম ইলমে হাদীস ও ফিকহ শিক্ষার গোড়াপত্তন করেন। ইলমে তাসাউফ বিষয়ক গ্রন্থ 'মনজিলে মাকাত' তিনি রচনা করেন, যদিও বর্তমানে এর কোন কপি সংরক্ষিত নেই। তবে ফিকহ বিষয়ে তিনি যে বক্তব্য দিতেন, তাঁর ছাত্ররা এসব একত্র করে একটি গ্রন্থ সংকলন করেন। গ্রন্থটির নাম ছিল 'নাম ই হক'। এটি ফার্সি ভাষায় রচিত এবং বহুল পরিচিত। এর পাণ্ডুলিপি বর্তমানে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রয়েছে। দীর্ঘ ২৩ বছর শিক্ষাদান শেষে ১৪ শতকের প্রথমদিকে তিনি ইন্তিকাল করেন। সোনারগাঁয়ে তাঁর সমাধি রয়েছে। ইমাম আবু তাওয়ামা ইন্তিকালের পর তাঁর ছাত্ররা মাদরাসাটিতে পাঠদান অব্যাহত রাখেন। যতদিন সোনারগাঁ বাংলার রাজধানী ছিল ততদিন মাদরাসাটি ভারতীয় উপমহাদেশে ইলমে হাদীসের প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে ভূমিকা রাখে। ইংরেজ আমলে মুসলমানদের এই শিক্ষাকেন্দ্র বন্ধ হয়ে যায়। মাদরাসাটির ধ্বংসাবশেষ আজও সোনারগাঁয়ে বিদ্যমান, যা সংরক্ষণের অভাবে কালের পরিক্রমায় বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

তেলাপোকা

- পৃথিবীতে বর্তমানে প্রায় ৪৬০০ প্রজাতির তেলাপোকা বিদ্যমান।
- মাত্র ৩০ প্রজাতির তেলাপোকা লোকালয়ে বাস করে এবং বাকী প্রজাতিগুলোর বসবাস বনজঙ্গলে।
- যেকোনো আবহাওয়ায় তেলাপোকা টিকে থাকতে পারে। উষ্ণ আবহাওয়ায় তো বটেই, আর্কটিক্ট মহাসাগরের মাইনাস ১৮৮ ডিগ্রি ফারেনহাইটেও এদের দুটো প্রজাতি দেখতে পাওয়া যায়।
- তেলাপোকার হাটু ১৮টি। শক্তিশালী হাটুর মাধ্যমে এরা শিকার বশ করে এবং দ্রুত চলাচল করতে পারে।
- তেলাপোকা কী খায়? প্রশ্ন না করে বলা যায় যে এরা কী খায় না। একমাত্র জিপসাম (সিমেন্ট) ব্যতীত তেলাপোকা সকল কিছু খেতে পারে।
- তেলাপোকা তাদের জীবদ্দশায় আটবার ডিম দেয় এবং প্রতিবারে অন্তত ৪০টি করে বাচ্চা দিতে পারে। ঘরে এত তেলাপোকা কীভাবে বসবাস করে, বুঝতে পারছেন?
- তেলাপোকার প্রাণশক্তি প্রবল। এদের মাথা আলাদা হয়ে গেলেও দিব্যি ৯ দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। পরে খাদ্যাভাবে মারা যায়।
- ১৯৪৫ সালে জাপানের হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক বোমা ফেলার পর তীব্র তেজস্ক্রিয়তায় সকল প্রাণী হতাহত হলেও তেলাপোকা অভিযোজন প্রক্রিয়ায় নিজের জন্য এই আবহাওয়া সহনীয় করে তোলে এবং বেঁচে যায়।
- প্রায় ৪০ প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া তেলাপোকা বহন করে এবং রোগ জীবানু ছড়ায়।
- ফর্সা আলোয় এরা বিভিন্ন অন্ধকার স্থানে লুকিয়ে থাকে এবং রাতে খাদ্যের সন্ধানে বের হয়।
- ঘরের যেকোনো খাবার রাতে ঢেকে রাখা জরুরি, অন্যথায় আপনার অজান্তে তেলাপোকা হয়তো 'চেখে' দেখতে পারে।
- সকালে ঘুম থেকে উঠে যদি শরীরে চিড় দেখতে পান, তাড়াতাড়ি বিছানা-বালিশ রোদে দিন এবং তেলাপোকাগুলো পরিষ্কার করুন। মানুষের শরীরের চামড়া তেলাপোকার অত্যন্ত প্রিয় খাবার!

বিজ্ঞান

এলাকাভেদে সাহরী-ইফতারের সময়ের ভিন্নতা যে কারণে

পরওয়ানা ডেস্কঃ

ইসলাম ধর্মের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দু'টি বিধান নামায ও রোযার সময় নির্ধারিত হয় সূর্যের অবস্থান অনুযায়ী। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্য সাধারণ মুসলিমরা মসজিদের আযানের উপরই নির্ভর করে থাকেন, কিন্তু রোযার সেহরি ও ইফতারের সময় সম্পর্কে সকলেই সচেতন থাকেন। এক্ষেত্রে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রচারিত সময়সূচিই বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি অনুসরণ করা হয়। এই সময়সূচি দেখে অনেকের মনে প্রশ্নের উদ্রেক হয়, কেন একই দেশের বিভিন্ন জেলায় ইফতার ও সেহরির সময় ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে? কীভাবেই বা এই ভিন্ন সময়সূচি নির্ধারিত হয়ে থাকে?

বিভিন্ন এলাকার আঞ্চলিক সময়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারিত হয় মূলত দ্রাঘিমারেখার ভিত্তিতে। দ্রাঘিমারেখা হলো উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত এক ধরনের কল্পিত রেখা। প্রতি গোলার্ধে ১৮০টি করে মোট ৩৬০টি দ্রাঘিমারেখা রয়েছে। এক দ্রাঘিমারেখা থেকে আরেক দ্রাঘিমারেখার মধ্যে সময়ের পার্থক্য হয় ৪মিনিট। উদাহরণস্বরূপ, লন্ডনের নিকটবর্তী গ্রিনউইচের দ্রাঘিমাংশ ০°, আবার ঢাকা শহরের নিকটবর্তী ফরিদপুরের দ্রাঘিমাংশ ৯০°। এর ফলে লন্ডন থেকে ঢাকার মধ্যে দ্রাঘিমাংশের ফারাক প্রায় ৯০°, তাই সময়ের পার্থক্য ৩৬০ মিনিট বা ৬ ঘন্টা।

সারা বাংলাদেশে যদিও ৯০° দ্রাঘিমাংশের মান সময় অনুসরণ করা হয়, কিন্তু বাস্তবে পুরো দেশ তো আর ৯০° দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত নয়, দেশটি ৮৮°১/ থেকে ৯২°৪১/ দ্রাঘিমাংশে বিস্তৃত। ফলে অফিসিয়াল সময় সারা দেশে এক হলেও ভৌগলিক অবস্থানের দিক থেকে পুরো দেশের সময় এক নয়। ভৌগলিক অবস্থানের ভিন্নতার কারণে ঢাকার সাথে বিভিন্ন জেলার সময়ের যে পার্থক্য, সেটির কারণেই সাহরী-ইফতারসহ নামাজের সময়সূচিতে ঢাকার সাথে বিভিন্ন জেলার সময়ের এই পার্থক্য দেখা দেয়।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সময়সূচিতে দেখা যায়, ঢাকা থেকে একই জেলার ইফতারের সময়ের যে পার্থক্য, সাহরীর সময়ের পার্থক্য ঠিক সে রকম নয়, একটু ভিন্ন। উদাহরণস্বরূপ, সাহরীর সময় ঢাকা থেকে সিলেটের পার্থক্য ৯ মিনিট, কিন্তু ইফতারের সময় ঢাকা থেকে সিলেটের পার্থক্য ৪ মিনিট। এখন দ্রাঘিমাংশের পার্থক্যের কারণে যে পার্থক্য হবে, তা তো সেহরি-ইফতার উভয় ক্ষেত্রে সমান হওয়ার কথা, তাহলে এই বেশকম কেন?

আসলে যে কোন এলাকার ভৌগলিক অবস্থান নির্ণয়ের জন্য দ্রাঘিমাংশের পাশাপাশি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো অক্ষাংশ। দ্রাঘিমাংশের কারণে সময়ের পার্থক্য হয়, তেমনি অক্ষাংশের কারণে আবহাওয়ার পার্থক্য হয়। এর ফলে দিনের দৈর্ঘ্য সব এলাকায় সমান হয় না। এ কারণে লন্ডনে যত ঘন্টা রোযা রাখতে হয়, ঢাকায় কিন্তু তত ঘন্টা রোযা হয় না। ঠিক তেমনি ঢাকার তুলনায় সিলেটে দিনের দৈর্ঘ্য একটু বেশি, তাই ঢাকার চেয়ে সিলেটে পাঁচ মিনিট বেশি রোযা রাখতে হয়। মোটকথা অক্ষাংশের ব্যবধানের কারণে ঢাকার ৯ মিনিট আগে সিলেটের সাহরীর সময় শেষ হলেও ইফতারের সময় হয় ৪ মিনিট পূর্বে।

যেভাবে কাজ করে GPS

পরওয়ানা ডেস্কঃ

প্রাচীনকালে মানুষ আকাশের দিকে তাকিয়ে নিজেদের অবস্থান বোঝার চেষ্টা করত। নাবিক বা পর্যটকরা রাতে আকাশের তারা দেখে দেখে নিজেদের জায়গা থেকে পথ চিনে নিত। এখনো আমরা নিজেদের অবস্থান জানার জন্য আকাশের ওপরই নির্ভর করি। তবে তারার পরিবর্তে এখন স্যাটেলাইট বা কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবহার করি।

জিপিএস হলো একধরনের স্যাটেলাইট নেভিগেশন সিস্টেম, যেটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার পরিচালনা করে। যুক্তরাষ্ট্রের মতোই আরো কিছু দেশের নিজস্ব স্যাটেলাইট নেভিগেশন ব্যবস্থা রয়েছে। রাশিয়ার গ্লোনাস, চায়নার বিডিএস'এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের গ্যালিলিও সিস্টেমও জিপিএসের মতো একই পদ্ধতিতে কাজ করে।

GPS এর পূর্ণ রূপ হলো Global Positioning System. জিপিএস সিস্টেমের সব কার্যক্রম প্রধানত ৩টি অংশের ওপরে নির্ভর করে। সেগুলো হলো: স্যাটেলাইট, গ্রাউন্ড স্টেশন এবং রিসিভার।

পৃথিবীর চারপাশে প্রায় ৩০টিরও বেশি নেভিগেশন স্যাটেলাইট প্রতিনিয়ত ঘুরছে। এই ধরনের স্যাটেলাইটগুলি যার যার নির্ধারিত কক্ষপথে নির্দিষ্ট গতিতে ঘুরতে থাকে। ফলে পৃথিবী থেকে যেকোনো সময়ই যেকোনো নেভিগেশন স্যাটেলাইটের অবস্থান নির্ণয় সম্ভব।

অন্যদিকে গ্রাউন্ড স্টেশনে থাকা রাডারের মাধ্যমে স্যাটেলাইটের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়। ঠিক কোথায় কোন স্যাটেলাইটটি রয়েছে, সেটা গ্রাউন্ড স্টেশনের মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া যায়। নির্ভুলভাবে জিপিএস সিস্টেম পরিচালনা করার জন্য বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ১৬টি গ্রাউন্ড স্টেশন রয়েছে।

জিপিএস সিস্টেমে ব্যবহৃত তৃতীয় অংশটি হলো রিসিভার। বর্তমানে তৈরি বেশিরভাগ স্মার্টফোন, নোটবুক এবং ল্যাপটপের মতো অনেক ডিভাইসেই জিপিএস রিসিভার সংযুক্ত থাকে। আবার অনেক যানবাহনেও বসানো থাকে জিপিএস রিসিভার। এসব রিসিভার প্রতিনিয়তই স্যাটেলাইট থেকে বেতার তরঙ্গ আকারে পাঠানো সিগনাল রিসিভ করছে। যেসব স্যাটেলাইট থেকে সিগনাল পাঠানো হচ্ছে, সেগুলি রিসিভার থেকে কতটা দূরে, তা রিসিভারের মাধ্যমে নির্ণয় করা হয়।

রিসিভার যখন কমপক্ষে ৪টি বা তার চাইতে বেশি নেভিগেশন স্যাটেলাইট থেকে নিজের দূরত্ব নির্ণয় করে, তখনই ব্যবহারকারীর নির্দিষ্ট অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব হয়। প্রতিটি স্যাটেলাইটেই তার নির্দিষ্ট অবস্থান এবং সময় সম্পর্কে তথ্য সংরক্ষণ করা থাকে। রিসিভারে সেই তথ্য পাঠানো হলে জিপিএস ব্যবহারকারী তার নির্দিষ্ট অবস্থান জানতে পারেন। নির্ভুলভাবে কাজ করার জন্য প্রতিটি নেভিগেশন স্যাটেলাইটেই পারমাণবিক ঘড়ি থাকে। প্রতিটা স্যাটেলাইটে থাকা ঘড়ির সময় অন্যান্য স্যাটেলাইট এবং পৃথিবীর ঘড়ির সঙ্গে মেলানো রয়েছে। এরপরও ঘড়িতে সময়ের খুব সূক্ষ্ম তারতম্য ঘটে। এসব তারতম্য প্রতিদিনই সংশোধন করা হয়।

সূত্রঃ নাসা

সাধারণ জ্ঞান

১৯ মার্চ '২১ অনুষ্ঠিত হয় ৪১তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা। সাধারণত অন্যান্য চাকরির নিয়োগ পরীক্ষাও বিসিএসের প্রশ্ন এসে থাকে। বিপিএসসি কর্তৃপক্ষ কখনও প্রশ্নের ব্যাখ্যা প্রদান করে না। বিগত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ একজন ক্যাডারপ্রার্থী আমাদেরকে পুরো প্রশ্নের সমাধান পাঠিয়েছেন। চাকরিপ্রার্থীদের সুবিধার্থে এ সংখ্যায় সাধারণ জ্ঞান অংশ তুলে ধরা হলো:

বাংলাদেশে বিষয়াবলি:

১. অবিভক্ত বাংলার সর্বপ্রথম রাজা কাকে বলা হয়? উত্তর: শশাঙ্ক
২. 'মাৎস্যন্যায়' বাংলার কোন সময়কাল নির্দেশ করে?
উত্তর: ৭ম-৮ম শতক
৩. বাংলার কোন সুলতানের শাসনামলকে স্বর্ণযুগ বলা হয়?
উত্তর: আলাউদ্দিন হোসেন শাহ
৪. বাংলায় সেন বংশের (১০৭০-১২৩০ খ্রিষ্টাব্দ) শেষ শাসনকর্তা কে ছিলেন? উত্তর: লক্ষ্ণণ সেন
৫. বাংলার সর্বপ্রাচীন জনপদের নাম কী? উত্তর: পুণ্ড্র
৬. বঙ্গভঙ্গ রদ কে ঘোষণা করেন? উত্তর: রাজা পঞ্চম জর্জ
৭. ঢাকা শহরের গোড়াপত্তন হয়- উত্তর: মুঘল আমলে
৮. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় কে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন?
উত্তর: নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ
৯. ভাষা আন্দোলনের সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?
উত্তর: খাজা নাজিম উদ্দীন
১০. লাহোরে অনুষ্ঠিত ওওঈ শীর্ষ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু কবে যোগদান করেন?
উত্তর: ২৩-২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪
১১. বঙ্গবন্ধুকে কখন 'জুলিও কুরী' শান্তি পুরস্কার প্রদান করা হয়?
উত্তর: ২৩ মে ১৯৭২
১২. ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবিতে যে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল না-
উত্তর: বিচার ব্যবস্থা
১৩. কাগমারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়- উত্তর: সন্তোষে
১৪. মুক্তিযুদ্ধকালে কোলকাতার ৮. থিয়েটার রোডে 'বাংলাদেশ বাহিনী' কখন গঠন করা হয়? উত্তর: এপ্রিল ১১, ১৯৭১
১৫. কোন বীরশ্রেষ্ঠের দেহাবশেষ বাংলাদেশে এনে বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের কবরের পাশে সমাহিত করা হয়?
উত্তর: সিপাহী হামিদুর রহমান
১৬. কে বীরশ্রেষ্ঠ নন? উত্তর: মুন্সি আব্দুর রহিম
১৭. বাংলাদেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচন কখন অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর: ৭ মার্চ ১৯৭৩
১৮. পাকিস্তান কবে বাংলাদেশকে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়? উত্তর: ফেব্রুয়ারি ২২, ১৯৭৪
১৯. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের প্রথম নেতা কে?
উত্তর: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
২০. বাংলাদেশের সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মূল বিষয় কী ছিল?
উত্তর: তত্ত্বাবধায়ক সরকার
২১. সংবিধানের চেতনার বিপরীতে সামরিক শাসনকে বৈধতা দিতে কোন তফসিলের অপব্যবহার করা হয়? উত্তর: ৪র্থ তফসিল
২২. কোন অনুচ্ছেদ বলে বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলী পরিবর্তনযোগ্য নয়? উত্তর: অনুচ্ছেদ ৭(খ)
২৩. সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদের আলোকে বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি পরিচালিত হয়? উত্তর: অনুচ্ছেদ ২৫
২৪. বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণে কোনটি অবস্থিত? উত্তর: সেন্টমার্টিন
২৫. বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতের রাজ্য কয়টি? উত্তর: ৫টি
২৬. কোন উপজাতিটির আবাসস্থল 'বিরিশি' নেত্রকোনা? উত্তর: গারো
২৭. প্রান্তিক হ্রদ কোন জেলায় অবস্থিত? উত্তর: বান্দরবান
২৮. আলুটিলা প্রাকৃতিক গুহা কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: খাগড়াছড়ি জেলায়
২৯. স্টিভ চেন ও চাড হারলির সাথে যৌথভাবে কোন বাংলাদেশী ইউটিউব (You Tube) প্রতিষ্ঠা করেন? উত্তর: জাবেদ করিম
৩০. বাংলাদেশের বাণিজ্য ভারসাম্য কীভাবে রক্ষা হয়?
উত্তর: IMF Gi bailout package

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

১. জাতিসংঘের কোন সংস্থাটি করোনা ভাইরাসকে 'pandemic' ঘোষণা করেছে? উত্তর: WHO
২. যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক দলের মনোনয়নের জন্য ন্যূনতম কতজন ডেলিগেটের সমর্থন প্রয়োজন? উত্তর: ১৯৯১
৩. জার্মানীর প্রথম নারী চ্যান্সেলর কে? উত্তর: অ্যাঞ্জেলা মারকেল
৪. সামরিক ভাষায় 'WMD' অর্থ কী?
উত্তর: Weapons of Mass Destruction
৫. ২০২০ সালে প্রকাশিত 'আইনের শাসন' সূচকে শীর্ষস্থান অর্জনকারী দেশের নাম কী? উত্তর: ডেনমার্ক
৬. জাতিসংঘের কোন সংস্থা বার্ষিক বিশ্ব বিনিয়োগ প্রতিবেদন প্রকাশ করে?
উত্তর: UNCTAD
৭. আন্তর্জাতিক বিচার আদালত রোহিঙ্গা গণহত্যা বিষয়ক অন্তবর্তীকালীন রায়ে মিয়ানমারকে কয়টি নির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলেছে? উত্তর: ৪টি
৮. কোন দুটি দেশের মধ্যে সীমান্ত বিরোধ নিস্পত্তির জন্য ২০১৯ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয়?
উত্তর: ইথিওপিয়া এবং ইরিত্রিয়া
৯. ইনকা সভ্যতা কোন অঞ্চলে বিরাজমান ছিল?
উত্তর: দক্ষিণ আমেরিকা
১০. নিচের কোন দেশটিতে রাশিয়ার সামরিক ঘাঁটির সুবিধা বিদ্যমান?
উত্তর: উজবেকিস্তান
১১. ফিনল্যান্ড কোন দেশের উপনিবেশ ছিল? উত্তর: রাশিয়া
১২. আন্তর্জাতিক আদালতে মিয়ানমার কর্তৃক রোহিঙ্গা গণহত্যার অভিযোগে মামলা করে কোন দেশ? উত্তর: গাম্বিয়া
১৩. নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন কোন বছর প্রতিষ্ঠিত হয়? উত্তর: ১৯৪৯ সালে
১৪. এশিয়াকে আফ্রিকা মহাদেশ থেকে পৃথক করেছে কোন প্রণালী?
উত্তর: বাবেল মান্দেব প্রণালী
১৫. ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয় কত সালে? উত্তর: ১৯১২ সালে
১৬. কোন বিদেশি রাষ্ট্র বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিয়েছে?
উত্তর: সিয়েরালিয়ন
১৭. জাতিসংঘ নামকরণ করেন- উত্তর: রুজভেল্ট
১৮. কোন মুসলিম দেশ সামরিক জোট ন্যাটোর সদস্য? উত্তর: তুরস্ক
১৯. ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল কোন দেশভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা?
উত্তর: জার্মানি
২০. আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল কোন সালে গঠিত হয়?
উত্তর: ১৯৪৫ সালে

কবিতা

তারাবি

জসীম উদ্দীন

তারাবি নামায পড়িতে যাইব মোল্লাবাড়িতে আজ,
মেনাজদ্দীন, কলিমদ্দীন, আয় তোরা করি সাজ।
চালের বাতায় গোঁজা ছিল সেই পুরাতন জুতা জোড়া,
ধুলাবালু আর রোদ লেগে তাহা হইয়াছে পাঁচ মোড়া।
তাহারি মধ্যে অবাধ্য এই চরণ দুখানি ঠেলে,
চল দেখি ভাই খলিলদ্দীন, লন্ঠন-বাতি জ্বেলে।
ঢৈলারে ডাক, লস্কর কোথা, কিনুরে খবর দাও।
মোল্লাবাড়িতে একত্র হব মিলি আজ সারা গাঁও।

গইজদ্দীন গরু ছেড়ে দিয়ে খাওয়ায়েছে মোর ধান,
ইচ্ছা করিছে থাপ্পড় মারি, ধরি তার দুটো কান।
তবু তার পাশে বসিয়া নামায পড়িতে আজিকে হবে,
আল্লার ঘরে ছোটোখাটো কথা কেবা মনে রাখে কবে!
মৈজদ্দীন মামলায় মোরে করিয়াছে ছারেখার,
টুটি টিপে তারে মারিতাম পেলে পথে কভু দেখা তার।
আজকে জামাতে নির্ভয়ে সে যে বসিবে আমার পাশে,
তাহারো ভালর তরে মোনাজাত করিব যে উচ্ছাসে।
মাহে রমজান আসিয়াছে বাঁকা রোজার চাঁদের ন্যায়,
কাইজা ফেসাদ সব ভুলে যাব আজি তার মহিমায়।

মাহে রামাদান এলে

[আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) এর শানে মর্সিয়া]

মুজাহিদ বুলবুল

কার ক্ষমতা আছে বলো তোমায় যাবে ভুলে
পাথর হৃদয় টুকরো হবে মাহে রামাদান এলে।

করলে কায়িম দারুল কিরাত
শেখালে শুদ্ধ তিলাওয়াত
মধুমাখা সুর লহরী দিলে কণ্ঠে তুলে
পাথর হৃদয় টুকরো হবে মাহে রামাদান এলে।

রাসূল প্রেমের ওগো প্রতীক
তোমার আলোয় ভাসে চৌদিক
অন্ধকারের গহীন বুকে প্রদীপ দিলে জ্বেলে
পাথর হৃদয় টুকরো হবে মাহে রামাদান এলে।.

হারিয়ে তোমায় পাগল এই প্রাণ
গাই অসহায় তোমারই শান
জানো কি গো কী বেদনা আমার মর্মমূলে
পাথর হৃদয় টুকরো হবে মাহে রামাদান এলে।

আগমনী : রামাদানে

কালাম আজাদ

এক.

যমযম শব্দ যেনো
রামাদান ও কুরআন
নাযিলের মাস তাই মহিম্ম-সুমহান।
বরাতের রাত আজ দিচ্ছে এ ঘোষণা
মুমিনেরা জেগে ওঠো
আর ঘুম যেয়োনা।
কুরআনের মাস আসে সাওমের মাস যে
উন্মুখ উম্মাহ শুঁকে মুক্তির শ্বাস যে।

দুই.

রোযা এলো, রোযা এলো
রামাদান এলোরে
শয়তান জিন্দানে আটক যে হলোরে!
জাহান্নাম-দ্বারগুলি
বাঁধা হয়ে গেলোরে!
জান্নাতি সবদ্বার খুলা দেখো হলোরে।

যদি চাও মুক্তি ও শান্তির সুধারে
জপো নাম, জয় করো তৃষ্ণা ও ক্ষুধারে।।

তিন.

মুমিন জানো কী তুমি
তোমার ক্ষুধার্ত দেহ
তৃষ্ণার্ত মুখ
কাঁপিয়ে দেয় অবিশ্বাসী,
নাসারা ও ইয়াহুদীর বুক
মুমিন, তোমার সিয়ামে জ্বলে অবিনাশী সত্যের আলো
ভোগক্লান্ত পশ্চিমী সভ্যতা
বলে ওঠে, এ তো ভালো
বড় বেশি ভালো
মুমিন, রামাদানের পৃথিবীতে
আলো জ্বালো
জ্বালো আরও আলো।।

ইয়াহুদী পন্ডিতের ইসলাম গ্রহণ

তাইবা আক্তার চাঁদনী

আব্বাসীয় খলিফা মামুনুর রশীদের দরবারে মাঝে মাঝে শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হতো। এতে বিজ্ঞ পন্ডিতগণ অংশগ্রহণ করতেন। একদিন এমনি এক আলোচনা সভায় সুন্দর চেহারাধারী, উত্তম পোশাক পরিহিত জনৈক ইয়াহুদী পন্ডিত আগমন করলেন এবং অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ আলোচনা রাখলেন। খলীফা বক্তব্য শুনে খুবই আপ্লুত হলেন। সভা শেষে তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি ইয়াহুদী? লোকটি জানালো, তিনি একজন ইয়াহুদী। খলীফা বললেন, আপনি যদি মুসলমান হতে আগ্রহী হন তাহলে আপনার সাথে উত্তম ব্যবহার করা হবে। তিনি উত্তরে বললেন, পৈত্রিক ধর্ম বিসর্জন দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়, এ বলে তিনি প্রস্থান করলেন। এক বছর পর ওই ইয়াহুদী ব্যক্তি মুসলমান হয়ে আবার দরবারে আগমন করলেন এবং আলোচনা সভায় ইসলামী ফিকহ সম্পর্কে সারগর্ভ ও যুক্তিপূর্ণ একটি বক্তব্য উপস্থাপন করলেন। সভাশেষে খলীফা মামুন তাকে ডেকে বললেন, আপনি কি ঐ ব্যক্তি নন, যিনি গতবছর এসেছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ আমি ঐ ব্যক্তি। খলীফা বললেন, আপনি মুসলমান হওয়ার কী কারণ ঘটল? ইয়াহুদী বললেন, আপনার দরবার থেকে ফিরে যাওয়ার পর আমি বর্তমান কালের বিভিন্ন ধর্মগুলো যাচাই-বাছাই করে দেখার মনস্থ করি। আমি একজন সুন্দর হস্তলেখা বিশারদ। সহস্তে গ্রন্থাদি লিখে উঁচু দামে বিক্রি করি। তাই পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে তাওরাতের তিনটি ধাপ লিপিবদ্ধ করলাম এবং এগুলোর অনেক জায়গায় নিজের থেকে কিছু কমবেশী করে লিখলাম। আমি এগুলো তাদের উপাসনালয়ে নিয়ে গেলাম এবং তারা খুব আগ্রহ সহকারে তা ক্রয় করল। অতঃপর একইভাবে ইঞ্জিলের তিনটি কপি করলাম এবং তাদের গির্জায় নিয়ে গেলাম। তারা তা খুব আগ্রহ সহকারে কিনে নিল। এরপর আমি কুরআনের ক্ষেত্রেও একই কাজ করলাম। কমবেশি করে লিখলাম এবং বিক্রয়ের জন্য নিয়ে গেলাম। কিন্তু ক্রয়কারীকে দেখলাম, সে কপিটি নির্ভুল কিনা যাচাই করে দেখল। তারপর কম বেশি দেখে ক্রয় করল না। কপিগুলি ফেরত দিল। এ ঘটনা দেখে আমি শিক্ষা গ্রহণ করলাম যে, নিশ্চয়ই এ গ্রন্থ সংরক্ষিত। আল্লাহ তাআলা স্বয়ং এর সংরক্ষক। আর এই উপলব্ধিই আমার ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এক রুটিওয়ালার গল্প

ইবরাহীম বিন আতিক

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) তৎকালীন সময়ের শ্রেষ্ট একজন আলিম ছিলেন, হাম্বলী মাযহাবের ইমাম তিনি। কুরআন, হাদীস, আকাইদ, ফিকহ কোনো দিকেই তার জ্ঞানের কোন কমতি ছিল না। কুরআন হাদীসের বড় আলিম হিসেবে তার সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। লোকেরা তাকে এক নামে চিনত।

ইমাম আহমদ (র.) জ্ঞান সাধনার জন্য তৎকালীন প্রসিদ্ধ আলিমদের সান্নিধ্যে সফর করেছেন। আগেকার যুগে কুরআন হাদীস বুঝার জন্য আমাদের মতো এতো স্কুল, কলেজ, মাদরাসা বা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। বরং ছাত্ররা মাইলের পর মাইল হেঁটে উস্তাদের বাড়িতে উপস্থিত হতেন। উস্তাদের মর্জি মতো তার কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করতেন।

ইমাম আহমদ (র.) এখন যুগের শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ। সবাই তাকে এক নামে চেনে। তিনি একবার কোন এক সফরে বের হলেন। দীর্ঘ রাস্তার সফর। মুসাফিরী অবস্থায় যা যা প্রয়োজন সব সাথে নিয়ে বের হলেন। প্রখর রৌদ্রস্নাত মরুভূমির খা খা বুক অতিক্রম করে অভিজ্ঞ পথিকের মতো ধূলা-বালি মাড়িয়ে পথ চলছেন। পথ চলতে চলতে ইমাম আহমদ নিজ শহর থেকে কিছু দূরে আরেকটি শহরে এসে উপস্থিত হলেন।

দিনের সূর্য অস্ত গিয়ে সন্ধার তারাগুলো জ্বলে উঠলো। অনেক পথচলা হয়েছে, রাতের বেলা আর সফর করা সম্ভব নয়। তাছাড়া কনকনে শীতের মধ্যে পা যেন আর চলতেই চায় না। কিন্তু রাতটা কাটাবেন কোথায়? ঘর-বাড়ি ছেড়ে আসা জীর্ণ বসনের মুসাফির মানুষ। আশপাশে খোঁজ করে একটি মসজিদ পেলেন। তিনি মসজিদেই রাত কাটানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। ইশার নামায আদায়ের পর মসজিদে বসে আছেন। নিরবে-নিভৃতে মহান মালিক আল্লাহকে স্মরণ করছেন। এমন সময় মসজিদের খাদিম এসে তাকে বললেন, আপনি মসজিদ থেকে বের হয়ে যান, মসজিদ বন্ধ করে দিব। ইমাম আহমদ (র.) তাকে বুঝালেন তিনি মুসাফির, যাওয়ার মতো জায়গা নেই। কিন্তু খাদিম তার সিদ্ধান্তে অটল। বস্তুত এ শহরের লোকজন ইমাম আহমদকে চিনতে পারে নি।

মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলেন। রাতের এই অন্ধকারে কোথায় যাবেন, কোথায় রাত কাটাবেন? তখন দেখলেন বাজারে এক রুটির দোকানে একজন খুব্বাজ রুটি বানাচ্ছেন। ইমাম আহমদ (র.) তার কাছে গেলেন। গিয়ে বললেন, আমি একজন মুসাফির। অনেক দূর থেকে এসেছি। অনেক দূরে যাব। কিন্তু রাত কাটানোর মতো কোনো ব্যবস্থা আমার হয় নাই। আপনার যদি কোনো অসুবিধা না হয় তাহলে আপনার দোকানে বসে বসে রাতটা পার করতে চাই। রুটির দোকানদার বললেন, অবশ্যই আপনি এখানে বসে রাত কাটাতে পারেন। আমার কোনো অসুবিধা হবে না।

ইমাম আহমদ (র.) রুটিওয়ালার পাশে বসলেন। এখানে বসে বসেই আল্লাহকে স্মরণ করছেন। রাত কাটানোর একটি ব্যবস্থা হওয়ায় শুকরিয়া আদায় করলেন। রুটিওয়ালা রুটি বানাচ্ছেন।

ইমাম আহমদ (র.) তার রুটি বানানো দেখছেন। হঠাৎ তার খেয়ালের মধ্যে আসল, রুটিওয়ালা প্রতিটি রুটি বানানোর সাথে সাথে ইস্তিগফার পড়ছে। ইমাম আহমদ (র.) আশ্চর্য হলেন। তিনি আরো পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। দেখলেন, লোকটি তার প্রত্যেক নড়াচড়ার সাথে সাথে ইস্তিগফার পড়ে। প্রতিটি কাজের সাথে খুব গুরুত্বের সাথে ইস্তিগফার পড়ছে। কৌতুহলী হয়ে ইমাম আহমদ (র.) রুটিওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এত বেশি ইস্তিগফার করার কোন কারণ আছে কি?

রুটিওয়ালা বললেন, এই ইস্তিগফার হলো আমার সব থেকে বড় সম্পদ। আমার জীবনে আমি যা কিছু পেয়েছি সবই এই ইস্তিগফারের কারণে। ইস্তিগফার পড়ে পড়ে আমি আল্লাহর কাছে যত দুআ করেছি আল্লাহ তাআলা আমার সব দুআ কবুল করেছেন। তবে একটি দুআ আছে যা এখনো কবুল হয় নি। ইমাম আহমদ (র.) আরো বেশি কৌতুহলী হয়ে জানতে চাইলেন, কী সেই দুআ, যা এখনো কবুল হয় নি। রুটিওয়ালা বলতে লাগলেন, শুনেছি এই যুগে বড় একজন আলিম আছেন, যার নাম হলো আহমদ ইবনু হাম্বল। আমি আল্লাহর কাছে দুআ করেছি যেন ইন্তিকালের আগে তার সাথে আমার দেখা হয়।

এ কথা শুনে ইমাম আহমদ (র.) চোখের পানি ফেলে কাঁদতে লাগলেন। রুটিওয়ালাকে বললেন, ভাই! আল্লাহ তাআলা আপনার এই দুআও কবুল করেছেন। আমি হলাম সেই আহমদ ইবনু হাম্বল, যাকে দেখার জন্য আপনি আল্লাহর কাছে দুআ করেছেন।

সাদামাটা জীবনে

রেদ্বওয়ান মাহমুদ

পাড়ার মোড়ে জীর্ণ একটি ঘরে থাকেন রহিম চাচা। ফ্রান্স প্রবাসী নজরুল স্যারের সুবিশাল প্লটটি দেখাশোনা, বাগানে পানি দেওয়াসহ খুঁটিনাটি কাজকর্মে দিনভর ব্যস্ত সময় পার করেন তিনি। মাস কয়েক আগে সপরিবারে ফ্রান্সে পাড়ি জমিয়েছেন নজরুল স্যার। অবশ্য রিটায়ার্ড হওয়ার পরপরই তার যাত্রার কথা থাকলেও বছরখানেক দেরী হয়েছে। প্রবাসে গিয়েই একটি নতুন প্লট কিনেছেন তিনি। আর এর দেখাশোনা করার জন্য গ্রাম থেকে রহিম চাচাকে আনা হয়েছে। নতুন জায়গাটিতে এখনো বাসা বানানো হয়নি বলে কোনমতে থাকার জন্য পুরনো এক বান টিন দিয়ে তার আবাসন ঠিক করে দিয়েছেন নজরুল স্যারের এক আত্মীয়। ষাটোর্ধ রহিম চাচার মাসিক বেতন আট হাজার টাকা।

প্লটটির অদূরে তিনতলা বাসায় থাকে সিয়ামরা। বাবার চাকুরীর সুবাদে শহর থেকে খানিকটা দূরের এই বাসায় উঠার প্রায় চার বছর হলো। সিয়ামের পড়ার টেবিল থেকে রহিম চাচার আবাসস্থল স্পষ্ট দেখা যায়। মাঝে মাঝে বেশ আগ্রহভরে জানালার ফাঁকে তাকিয়ে থাকে সে। সিয়ামের চোখে পড়ে- মসজিদে আযান হলেই রহিম চাচা তড়িঘড়ি করে ছুটেন মসজিদ পানে। সে যত বড় কাজই হোক, নিমিষেই তিনি ব্যস্ততাকে একপাশে রেখে নামাযকে গুরুত্ব দেন। বিষয়টি বেশ ভালো লাগে সিয়ামের কাছে। চলতি পথে ছোট-বড় সবাইকে সালাম দেন তিনি। একদিন জুমুআর নামায শেষে সালাম বিনিময়ের পর রহিম চাচাকে আগ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করে

- কেমন আছেন চাচা? মৃদু হেসে তিনি বললেন

- আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি বাবা।

এরপর চললো কয়েক মিনিটের আলাপন। কথার ফাঁকে জানা গেলো রহিম চাচার গ্রামের বাড়ী শহর থেকে প্রায় ১২০ কিলোমিটার দূরে নিদনপুর গ্রামে। শেষ বয়সেও কেন এত দূরে এসে ঘাম ঝরাচ্ছেন? এমন প্রশ্নে কিছুটা আবেগের রেশ স্পষ্ট হয়ে উঠে তার মায়াবী চেহারায়। প্রথমদিকে একটু ইতস্ততবোধ করলেও রহিম চাচা অনায়াসে শোনাতে লাগলেন তার জীবনের গল্প।

দুই মেয়ে, এক ছেলে আর সহধর্মিণীকে নিয়ে গ্রামের একটি টিনশেডের ঘরে ছিলো তার গোছানো সংসার। হঠাৎ ঝড়ের ক্ষিপ্র বেগের মত ভাইরাস এসে কেড়ে নেয় স্ত্রীর প্রাণ। সুখে-দুঃখে পাশে থেকে নীরব ও অকুণ্ঠ সমর্থনদাতা মানুষটির চলে যাওয়ার পর থেকেই একা হয়ে যান তিনি। নিমিষেই সব অগোছালো হয়ে যায়। ব্যাংকের সিকিউরিটির চাকুরী শেষ হওয়ার পর সহায়-সম্পত্তি যা ছিলো সব মিলিয়ে দুই মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন রহিম চাচা। ভিটেমাটি ছাড়া তেমন কিছুই আর বাকী নেই। তাতে তিনি বিন্দুমাত্র আক্ষেপবোধ করেন না। ছোট্ট ছেলেটি রাজধানীর একটি বড় কলেজে লেখাপড়া করছে। ছেলের মাসিক খরচ আর মেয়েদের দেখাশোনার জন্য আর্থিক সংকুলানের ভার সামলানো তার পক্ষে দিন-দিন দুঃসাধ্য হয়ে উঠছিলো। ফলে ভালো বেতন পাওয়ায় গ্রাম ছেড়ে এখানে এসেছেন।

তার চলায়-বলায় কোন আক্ষেপের ছাপ নেই। মৃদু হেসে বলেন, 'সন্তানগুলোর মা চলে যাওয়ার পর থেকে আমি বেশ একা হয়ে গেছি। তবে কখনো কোন কষ্ট যেন তাদের ছুঁতে না পারে সেজন্য প্রাণপন চেষ্টা করে যাচ্ছি। তুমি তো জানোই বাবা- প্রত্যেক দুঃখের পরই সুখ ধরা দেয়। আল্লাহ আমাদের যেমন রেখেছেন তার সন্তুষ্টি প্রকাশ না করলে অকৃতজ্ঞতা হয়ে যাবে। এই যে আমার ছেলে লেখাপড়া করছে, একদিন সে অনেক বড় হবে। আমার যত ত্যাগ, যত তিতিক্ষা তার সব ম্লান করে দিবে আমার ছেলের সফলতা।' আবারও মৃদু হেসে বলেন- সেই দিনগুলোর জন্য ভীষণরকম অপেক্ষায় আছি।

-'আপনার জন্য অশেষ দুআ চাচা, যে কোন কিছু প্রয়োজন হলে আমাকে বলবেন' বলে বাসার পথে রওয়ানা দেয় সিয়াম।

এক সাদামাটা জীবনে তৃপ্তির ছাপ বয়ে বেড়ানো রহিম চাচার গল্প শুনে ভেতরটা খুশিতে ভরে উঠলো তার। আশার প্রদীপ জ্বেলে স্বপ্নে বিভোর রহিম চাচার জন্য অনাবিল শুভ কামনা রেখে বাসার কলিং বেলে চাপ দিলো...।

জ্ঞাতব্যঃ প্রিয় বন্ধুরা, পরওয়ানার আগামী সংখ্যা পবিত্র ঈদুল ফিতর সংখ্যা। তোমাদের ঈদ ভাবনা এবং ঈদের অনুভূতি নিয়ে লিখতে পারো আবাবীল ফৌজে। ছড়া, কবিতা ও ছোট গল্প লিখে পাঠিয়ে দাও ঈদ সংখ্যার জন্য।
-বিভাগীয় সম্পাদক

ছড়া/কবিতা

প্রয়োজনীয় শিক্ষা
পিয়ার মাহমুদ

রজব শাবান দু'মাস জুড়ে
মু'মিন মুসলমান
রামাদানেরই মাসকে জানায়
আহ্লান সাহ্লান।

কারণ হল রামাদানে হয়
গোনাহ পুঁড়ে ছাই
নেক আমলে ব্যস্ত হলে
নেকীর সীমা নাই।

রামাদান হতে শিক্ষা লয়ে
কাটায় বারো মাস
ভাগ্য গুণে এক মাসেই
হয় মা'বুদের দাস।

অনাহারে অর্ধাহারে
কাটায় যারা দিন
তাদের কেমন কষ্টটা হয়
রামাদানে হয় একিন।

কথাবার্তা কাজে কর্মে
সংযত রয় যারা
রহমত নাযাত মাগফিরাতে
ধন্য কেবল তারা।

খালিস দিলে যেজনা লয়
মু'মিন হবার দীক্ষা
রামাদানে দেয় সেজনারে
প্রয়োজনীয় শিক্ষা।

এলো মাহে রামাদান
ইয়াহইয়া আহমদ চৌধুরী

কূল মুমিনের হৃদয় জুড়ে
প্রেম বিরহের কি যে টান
সকল মাসের সেরা মাস
এলো মাহে রামাদান।

গোনাহ থেকে মাফি পেতে
প্রস্তুতি নাও প্রাণভরে
খোদার কাছে পাবে সবই
শান্তি পাবে অন্তরে।

ইফতারে আর তারাবীহতে
দুআ করব কায়মনে
সাহরী খেতে জাগবে সবাই
থাকবে রবের ধ্যান মনে।

এই তো মোদের মহান রবের
শ্রেষ্ঠতম উপহার
অন্তরেতে জাগাও মুমিন
দূর করে সব অন্ধকার।

কূল মুমিনের অন্তরেতে
খুশির জোয়ার বইছে আজ
কুরআন পাঠের চর্চাতে যাও
হয়ে তুমি দীল দারাজ।

জাগো মুমিন আল কুরআনের
নাযিল হওয়া এই মাসে।
গড়ে তোল জিন্দেগানী
পূণ্যতা আর বিশ্বাসে।

আহ্লান সাহ্লান
আবুল আহসান মো. ইয়াছিন

আহ্লান সাহ্লান
আমাদের মাঝে এলো
ফের মাহে রামাদান।

আহ্লান সাহ্লান
রহমত মাফি আর
নাজাতের রামাদান।

আহ্লান সাহ্লান
ইফতার সাহরীতে
বরকতি রামাদান।

আহ্লান সাহ্লান
নিআমত, ফযীলতে
ভরপুর রামাদান।

আহ্লান সাহ্লান
ধরণীর বুকে আজ
স্বাগতম রামাদান।

মাহে রামাদান
সেলিম আহমদ কাওছার

রহমতের নিয়ে আহ্বান
এলো মাহে রামাদান
মাগফিরাতের নিয়ে জয়গান
এলো মাহে রামাদান
নাযাতের নিয়ে এলান
আহ্লান সাহ্লান মাহে রামাদান।

রুখে দাও সব বেহায়াপনা আর
অশ্লীলতার দ্বার
সত্যপথে এগিয়ে চলো
জাগিয়ে তুলো শ্লোগান আল্লার
প্রভুর তরে চেয়ে লও মাফ
যত অপরাধ আছে তোমার
আহ্লান সাহ্লান মাহে রামাদান।

ভুলে যাও সব গাফিলতির গান
জেগে উঠো! মুমিন মুসলমান
রবের পথে ইবাদতে
হও সকলে আগুয়ান
আহ্লান সাহ্লান মাহে রামাদান।

সিয়াম সাধনায় হলে বলিয়ান
তাকওয়ার গুণে তবে
হবে মহিয়ান
খোদা তোমায় নিজহাতে এর
জানিও দেবে প্রতিদান।
আহ্লান সাহ্লান মাহে রামাদান।

বন্ধুরা,
আগামী মাসে আসছে ঈদুল ফিতর সংখ্যা। সাধারণ ছড়ার পাশাপাশি ঈদের ছড়াও পাঠাতে পারো। নির্বাচিত ছড়াগুলো ছাপা হবে।
-বিভাগীয় সম্পাদক

বলতো দেখি?

এ সংখ্যার প্রশ্ন

১. যাকাতের নিসাব পরিমাণ কত?
২. যাকাত বণ্টনের খাত কয়টি?
৩. ইমাম তিরমিযী (র.) কত হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন?
৪. আল্লামা সাবুনী লিখিত তাফসীর গ্রন্থের নাম কি?
৫. কত সালে দারুল কিরাত শুরু হয়?

গত সংখ্যার উত্তর

১. ফাতিমা বিনতে আসাদ
২. Voice of America
৩. লাইলাতিন নিসফি মিন শাবান
৪. ইমাম জাযূলী (র.)
৫. সমরকন্দ

যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে [প্রথম তিনজন পুরস্কৃত]

আব্দুল হাই মাসুম, মৌলভীবাজার টাউন কামিল মাদরাসা, মৌলভীবাজার # মো. শফিকুর রহমান, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # সাইদুল ইসলাম মামুন, সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদরাসা, বিশ্বনাথ, সিলেট # মুদাচ্ছির আল আমীন, সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদরাসা, বিশ্বনাথ, সিলেট # জান্নাতুল ফেরদৌস মরিয়ম, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # তায়্যিবা আক্তার চাঁদনী, ক্লাসিক স্কুল এন্ড কলেজ, উপশহর, সিলেট # মো. লোকমান আহমদ, বরমচাল হযরত খন্দকার (র.) দাখিল মাদরাসা, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # মো. মহরম আলী, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার # হুছাম উদ্দিন মাছুম, সাগরনাল, জুড়ী, মৌলভীবাজার # আনোয়ার হোসেন সাইফ, সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদরাসা, বিশ্বনাথ, সিলেট # সালমা আক্তার, মশরিয়া আলিম মাদরাসা, রাজনগর, মৌলভীবাজার # মো. ফাহিম উদ্দিন, তালিমপুর বাহারপুর ইয়াকুবিয়া দাখিল মাদরাসা, বড়লেখা, মৌলভীবাজার # জাহেদা আক্তার শবনম, রাখালগঞ্জ দারুল কুরআন ফাযিল মাদরাসা, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট # বদরুল ইসলাম, ডাইকের বাজার, নোয়াগাঁও, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট # মো. কামরুল ইসলাম, বারহাল হাটুবিল গাউছিয়া দাখিল মাদরাসা, জকিগঞ্জ, সিলেট # মো. জাবেল আহমদ, দক্ষিণ ভবানীপুর, জুড়ী, মৌলভীবাজার # নাজমিন আক্তার, হযরত শাহ খাকী (র.) আলিম মাদরাসা, জুড়ী, মৌলভীবাজার # মোহাম্মদ রেদওয়ান হোসেন, উত্তরভাগ, হেতিমগঞ্জ, গোলাপগঞ্জ, সিলেট # আব্দুল্লাহ আল হোসাইন, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # আজিম উদ্দিন মাছুম, দ্বীনি সিনিয়র মডেল আলিম মাদরাসা, সদর, সুনামগঞ্জ # মো. নাছির উদ্দিন, দ্বীনি সিনিয়র মডেল আলিম মাদরাসা, সদর, সুনামগঞ্জ # তারেক বিন আলাউদ্দিন, গহরপুর, ছাতক, সুনামগঞ্জ # তাহমিনা বেগম, মনজলাল, মোগলাবাজার, সিলেট # মাছুমা বেগম, মনজলাল, মোগলাবাজার, সিলেট # আলী আহমদ ফাহিম, মনজলাল, মোগলাবাজার, সিলেট # মো. আবিদুর রহমান দিলু, মল্লিকপুর, ছাতক, সুনামগঞ্জ # মো. হাবিবুর রহমান বাবলু, মল্লিকপুর, ছাতক, সুনামগঞ্জ # মোছা. মাছুমা বেগম, ইলামের গাঁও, করিমগঞ্জ, সদর, সিলেট।

আন্দালিব ভাই সমীপে...

প্রিয় আন্দালিব ভাই, আমি পরওয়ানার গ্রাহক হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। পরওয়ানার মাধ্যমে নতুন নতুন বিষয় জানতে পারছি। পরওয়ানা হচ্ছে ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের এক সমাবেশ। যেখান থেকে নতুন অনেক বিষয় শিখতে পারছি। বিশেষ করে, জীবন জিজ্ঞাসা বিভাগেও নিত্য নতুন সমস্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করে সুন্দর সমাধান পাওয়া যাচ্ছে। এজন্য পরওয়ানা পরিবারকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

বদরুল ইসলাম
ডাইকের বাজার, নোয়াগাঁও, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট

-আন্দালিব ভাই: তোমার অভিব্যক্তির জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। পরওয়ানার মাধ্যমে তোমার জ্ঞানরাজ্যের সমৃদ্ধি হচ্ছে জেনে খুশি হলাম। আশা করি পরওয়ানার সঙ্গেই থাকবে।

প্রিয় আন্দালিব ভাই, মার্চ মাসের পরওয়ানা পেয়ে আমি খুবই আনন্দিত। পরওয়ানা থেকে অনেক কিছু শেখার পাশাপাশি আবাবীল ফৌজ এ অংশগ্রহণ করতে পারছি। তার জন্য আল্লাহ তাআলার দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। পরওয়ানার বহুল প্রচার ও উন্নতি কামনা করছি।

মো. নাঈমুর রহমান
সরকারি আলিয়া মাদরাসা, সিলেট

-আন্দালিব ভাই: পরওয়ানার আবাবীল ফৌজের নিয়মিত অংশগ্রহণকারী হিসেবে তোমাকে ধন্যবাদ। তোমাদের অংশগ্রহণে আবাবীল ফৌজ সরব থাকবে সেই প্রত্যাশা করছি।

প্রিয় আন্দালিব ভাই, প্রতি মাসের প্রথম তারিখে যখন পরওয়ানা হাতে পাই তখন খুব ভালো লাগে। অল্প সময়ে পরওয়ানা পাঠকদের হাতে পৌঁছানোর জন্য পরওয়ানা পরিবারকে মুবারকবাদ জানাচ্ছি।

হাফিয আবুল খায়ের মোহাম্মদ (সালেহ)
শিক্ষার্থী, গোবিন্দনগর ফজলিয়া ফাযিল মাদরাসা, ছাতক, সুনামগঞ্জ

-আন্দালিব ভাই: পরওয়ানা পেয়ে তোমার ভালো লাগা শুনে আমরাও আনন্দিত হলাম। তোমাদের নিয়মিত অংশগ্রহণ থাকলে আবাবীল ফৌজ আরও নিত্য নতুন জিনিস নিয়ে হাজির হবে ইন শা আল্লাহ। ভালো থাকবে সে প্রত্যাশা করছি।

প্রিয় আন্দালিব ভাই, আমি জনপ্রিয় ম্যাগাজিন মাসিক পরওয়ানার একজন নিয়মিত পাঠক। এ ম্যাগাজিনের সব বিভাগই আমাকে মুগ্ধ করে। বিশেষ করে আবাবীল ফৌজের বলতো দেখি, শব্দকল্প আমাকে খুব আনন্দ দেয়। আমি পরওয়ানার উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করি।

মাহবুবা জামান
মীরপুর পাবলিক হাইস্কুল, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ

-আন্দালিব ভাই: পরওয়ানার নিয়মিত পাঠক হিসেবে তোমাকে স্বাগতম। পরওয়ানার সকল বিভাগ তোমার ভালো লাগে শুনে খুশি হলাম। আর আবাবীল ফৌজতো তোমাদেরই বিভাগ। এ বিভাগকে সুন্দর করতে তোমাদের বেশি বেশি অংশগ্রহণ চাই। লিখবে নিয়মিত। তোমার বন্ধুদেরও পরওয়ানার পাঠক বানাতে ভুলবে না।

প্রিয় আন্দালিব ভাই, পরওয়ানা মার্চ সংখ্যা হাতে পেলাম। লাল সবুজে মুড়ানো প্রচ্ছদটা মন কাড়ে। মহান স্বাধীনতার মাস বিবেচনায় একটি চমৎকার প্রচ্ছদ হয়েছে। এরকম মনোরম প্রচ্ছদে এ সংখ্যাটি সাজানোর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ পরওয়ানা পরিবারকে।

সাজিদ আওফী সাহিল
বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা

-আন্দালিব ভাই: পরওয়ানার প্রতি তোমার ভালোবাসাকে মুবারকবাদ। মার্চ সংখ্যার প্রচ্ছদ তোমার ভালো লেগেছে শুনে খুশি হলাম। নিয়মিত তোমার অভিব্যক্তি জানাতে ভুলবে না কিন্তু। চিঠির জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।

শব্দ শিখি

Syrup শব্দটি আরবী শব্দ شراب (শারাব) থেকে এসেছে। যার অর্থ পানীয়। আরবী شربة (শারাবাত) শব্দটি ফারসিতে শরবত এবং তুর্কিতে শেরবেত এ রূপান্তরিত হয়। ফরাসি ও ইটালিয়ান ভাষায়ও এটি গৃহীত হয়। বাংলা ভাষায়ও শরবত শব্দের ব্যবহার রয়েছে। খ্রিষ্টীয় ১৪শ শতকে শব্দটি ইংরেজিতে প্রবেশ করে।

সদস্য কুপন

প্রিয় আন্দালিব ভাই, আমি 'আবাবীল ফৌজ' এর সদস্য হতে চাই। আমার বয়স ১৬ বছরের বেশি নয়। আমি ফৌজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নিজেকে সচেষ্ট রাখবো।

নাম: ....
পিতা/অভিভাবক: ....
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: .... শ্রেণি: ....
গ্রাম: .... ডাক: ....
থানা: .... জেলা: ....

কুপনটি পূরণ করে ডাকযোগে নিচের ঠিকানায় অথবা ছবি তুলে ই-মেইলে পাঠিয়ে দাও।

আন্দালিব ভাই
পরিচালক, আবাবীল ফৌজ
মাসিক পরওয়ানা
বি.এন টাওয়ার, ২৮/১ বি, দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
সিলেট অফিস: পরওয়ানা ভবন ৭৪, শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ, সোবহানীঘাট সিলেট-৩১০০
Mobile: 01799 629090, E-mail: parwanaafbd@gmail.com

আন্দালিব ভাইয়ের চিঠি

সুহৃদ বন্ধুরা!

চলতি মাসেই পবিত্র রামাদান। হিজরী সনের মহিমান্বিত মাস। যা তিনটি বরকতময় পর্বে বিভক্ত। ১ম দশক রহমতের, ২য় দশক মাগফিরাতের ও শেষ দশক নাযাতের। এ মাসের ১৭ রামাদান ঐতিহাসিক বদর দিবস। ইসলামের প্রথম সম্মুখ সমর গাজওয়ায়ে বদরের স্মৃতি মুমিন চিত্তকে নাড়া দিয়ে যায়। ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রু আবূ জাহল এ যুদ্ধেই নিহত হয়েছে। তোমরা জেনে আশ্চর্য হবে যে, আবূ জাহলকে প্রথম আঘাত করেন দুইজন কিশোর সাহাবী হযরত মুআজ (রা.) ও মুআওয়িজ (রা.)। তাঁদের বয়স ছিল ১২ ও ১৩ অথবা ১৩ ও ১৪ বছর। তোমাদের ঈমান বদরী চেতনায় তেজদীপ্ত হোক।

প্রিয় বন্ধুরা! রামাদানের নাযাতপর্বের যেকোনো বিজোড় রাত হতে পারে লাইলাতুল কদর। সাধারণত ২৭তম রাতে লাইলাতুল কদর পালিত হয়। যা হাজার রজনীর চেয়ে বরকতময় রজনী। শবে কদরে কুরআন তিলাওয়াত, নফল নামায, দুরূদ ও ইস্তিগফার পাঠ করবে। মৃত আত্মীয়-স্বজনদের কবর যিয়ারত করে তাদের রূহের মাগফিরাত কামনা করবে। সর্বোপরি দেশ, জাতি ও মুসলিম উম্মাহর শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য দুআ করবে।

বৈশ্বিক মহামারি করোনার কারণে গত বছর দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্টের পাঠদান হয়নি। এ বছর কিন্তু সে সুযোগ হাতছাড়া করা যাবে না। বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষার জন্য দারুল কিরাতের বিকল্প নেই।

দীর্ঘদিন তোমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ। মাঝেমধ্যে খোলার প্রস্তুতির কথা শুনা গেলেও করোনা প্রকোপের হুংকারে আবারও থেমে যায় সিদ্ধান্ত। সিদ্ধান্ত যাই আসুক বাড়িতেই পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হবে। স্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রতি সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে।

এদিকে প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে কেটে গেল একটি বছর। ১৪ এপ্রিল ১লা বৈশাখ। সবাইকে ১৪২৮ নববর্ষের শুভেচ্ছা। বাংলা নববর্ষের সাথে পূণ্যাহ ও হালখাতার রীতি জড়িত রয়েছে। পাড়ার মাথায় মফিজ চাচার দোকানে বকেয়া থাকলে পরিশোধ করে নিও।

নতুন বছরের সঙ্গে আসছে কালবৈশাখী ঝড়। রাস্তায় চলাফেরায় বৈদ্যুতিক তার বা কোনো ধরনের ক্যাবল ছুঁয়ে দেখার চেষ্টা করবে না। বজ্রপাত থেকে বাঁচতে দুআ পড়ে নিও।

পবিত্র রামাদানের রহমত বরকতে তোমাদের জীবন হোক ভরপুর। এই প্রত্যাশায় ইতি টানছি, তোমাদেরই আন্দালিব ভাই।

শুভেচ্ছাসহ
তোমাদেরই আন্দালিব ভাই

শব্দকল্প

১	২	৩		■	৪
৫			■	■	
■		■	৬		
৭			■	■	
৮		■	৯	১০	
	■	১১			

সূত্র : পাশাপাশি

১। আরবী দশম মাস ৫। আকাশ ৬। কন্যা, মেয়ে ৭। শুদ্ধ উচ্চারণে কুরআন তিলাওয়াত ৮। নবী-রাসূলের প্রশস্তিসূচক গান ৯। বাগান, উদ্যান ১১। সঠিক পথ, কাঙ্খিত গন্তব্য

সূত্র : উপর-নীচ

১। ক্রোধ ২। ক্ষমা ৩। স্বত্ব ত্যাগ করে বিতরণ ৪। অতি বিনয়ী ৭। ধার, প্রান্ত ৯। কর্দমাক্ত বস্তু ১০। নতুন

গত সংখ্যার সমাধান

ই	স	লা	ম	■	কু
য়া	■	■	ক্কা	■	র
সী	রা	ত	■	দু	আ
ন	■	লো	হা	■	ন
■	কা	য়া	■	দ	■
■	প	র	ও	য়া	না

গত সংখ্যার শব্দকল্পের পরিকল্পনাকারী

মো. নাছির উদ্দিন তালহা

দ্বীনী সিনিয়র আলিম মডেল মাদরাসা, সদর, সুনামগঞ্জ

শব্দকল্পে যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে (প্রথম তিনজন পুরস্কৃত)

মুহাম্মদ কাওছার মাহমুদ, শাহজালাল জামেয়া ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা, পাঠানটুলা, সিলেট # ইসতিয়াক আহমদ জামি, লতিফিয়া ইসলামিক কিন্ডারগার্টেন, সোবহানীঘাট, সিলেট # মাহদিয়া হক, চাঁনপুর, জাউয়া বাজার, ছাতক, সুনামগঞ্জ # মো. মহরম আলী, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার # রোমান আহমদ, বরমচাল উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # জান্নাতুল ফেরদৌস মরিয়ম, সোবহানীঘাট, সিলেট # তায়্যিবা আক্তার চাঁদনী, ক্লাসিক স্কুল এন্ড কলেজ, উপশহর, সিলেট # হুছাম উদ্দিন মাছুম, সাগরনাল, জুড়ী, মৌলভীবাজার # শাহীন আহমদ, সিলেট সরকারি আলিয়া মাদরাসা, সিলেট # তানজিনা সিদ্দিকা মারওয়া, ভাদেশ্বর নাছির উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, গোলাপগঞ্জ, সিলেট # বদরুল ইসলাম, ডাইকের বাজার, নোয়াগাঁও, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট # মো. কামরুল ইসলাম, বারহাল হাটুবিল গাউছিয়া দাখিল মাদরাসা, জকিগঞ্জ, সিলেট # এম সাইদুল ইসলাম, চাটেরা, জুড়ী, মৌলভীবাজার # মো. জাবেল আহমদ, দক্ষিণ ভবানীপুর, জুড়ী, মৌলভীবাজার # আনোয়ার হোসেন সাইফ, সৎপুর কামিল মাদরাসা, বিশ্বনাথ, সিলেট # জাহেদা আক্তার শবনম, রাখালগঞ্জ দারুল কুরআন ফাযিল মাদরাসা, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট # মিফতাউল জান্নাত মাইবি, রাজনগর আইডিয়াল হাই স্কুল, রাজনগর, মৌলভীবাজার # মোছা. মাছুমা বেগম, ইলামের গাঁও, করিমগঞ্জ, সদর, সিলেট # মো. আব্দুল্লাহ আল গুফরান, মল্লিকপুর, ছাতক, সুনামগঞ্জ # মোছা. নাজমিন বেগম, মল্লিকপুর, ছাতক, সুনামগঞ্জ # মোছা. শামিমা বেগম সুমা, ইলামের গাঁও, করিমগঞ্জ, সদর, সিলেট # মো. সজিব মিয়া, হাজী আজিজুর রহমান উচ্চ বিদ্যালয়, জালালাবাদ, সিলেট # মো. ইমাদ খান, চান্দাইরপাড়া সুন্নিয়া হাফিজিয়া ফাযিল মাদরাসা, বালাগঞ্জ, সিলেট।

বর্ণকল্প

এ সংখ্যার বর্ণকল্প

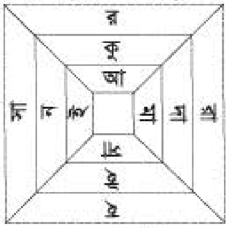

বর্ণগুলো এলোমেলা আছে। এগুলো সাজিয়ে কেন্দ্রের ফাঁকা ঘরে একটি মাত্র বর্ণ বসালে চারটি অর্থবোধক শব্দ তৈরি হবে। চেষ্টা করে দেখতো অর্থসহ শব্দ চারটি তৈরি করতে পারো কি না! সঠিক উত্তরদাতাদের নাম আগামী সংখ্যায় ছাপা হবে।

গত সংখ্যার বাক্যভেদের সমাধান

গীতিকার: কাজী নজরুল ইসলাম

ত্রিভুবনের প্রিয় মুহাম্মদ
এলোরে দুনিয়ায়।
আয়রে সাগর আকাশ বাতাস
দেখবি যদি আয়।

গত সংখ্যার বাক্যভেদের পরিকল্পনাকারী

মো. মাহমুদুল হাসান

কাদিপুর, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার

বাক্যভেদে যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে

শাহীন আহমদ, সিলেট সরকারি আলিয়া মাদরাসা, সিলেট # মো. লোকমান আহমদ, বরমচাল হযরত খন্দকার (র.) দাখিল মাদরাসা, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # মো. মহরম আলী, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার # হুছাম উদ্দিন মাছুম, সাগরনাল, জুড়ী, মৌলভীবাজার # রোমান আহমদ, বরমচাল উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # জান্নাতুল ফেরদৌস মরিয়ম, সোবহানীঘাট, সিলেট # মো. মোজাম্মিল হোসেন, এমসি কলেজ, সিলেট # তায়্যিবা আক্তার চাঁদনী, ক্লাসিক স্কুল এন্ড কলেজ, উপশহর, সিলেট # মুহাম্মদ কাওছার মাহমুদ, শাহজালাল জামেয়া ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা, পাঠানটুলা, সিলেট # শাহরিয়ার রহমান, গণিপুর, পৃথিমপাশা, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # মাহদিয়া হক, চানপুর, জাউয়া বাজার, ছাতক, সুনামগঞ্জ # মো. জাবেল আহমদ, দক্ষিণ ভবানীপুর, জুড়ী, মৌলভীবাজার # মো. নাছির উদ্দিন তালহা, দ্বীনি সিনিয়র আলিম মডেল মাদরাসা, সদর, সুনামগঞ্জ # সাইদুল ইসলাম মামুন, সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদরাসা, বিশ্বনাথ, সিলেট # আব্দুল্লাহ আল হোসাইন, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # বদরুল ইসলাম, ডাইকের বাজার, নোয়াগাঁও, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট # জাহেদা আক্তার শবনম, রাখালগঞ্জ দারুল কুরআন ফাযিল মাদরাসা, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট # আফিফা তাবাসসুম জুঁই, সাহেবের বাজার, বিমানবন্দর, সিলেট # এম সাইদুল ইসলাম, চাটেরা, জুড়ী, মৌলভীবাজার # মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান, এগ্রিকালচার ট্রেনিং ইন্সটিটিউট, খাদিমনগর, সদর, সিলেট # আব্দুল হাই মাসুম, মৌলভীবাজার টাউন কামিল মাদরাসা, মৌলভীবাজার # মো. কামরুল ইসলাম, বারহাল হাটুবিল গাউছিয়া দাখিল মাদরাসা, জকিগঞ্জ, সিলেট # মোছা. নুজহাত রহমান তানিশা, মোল্লাপাড়া, তাজপুর, ওসমানীনগর, সিলেট # তারেক বিন আলাউদ্দিন, গহরপুর, ছাতক, সুনামগঞ্জ # তাহমিনা বেগম, মনজলাল, মোগলাবাজার, সিলেট # মাছুমা বেগম, মনজলাল, মোগলাবাজার, সিলেট # আলী আহমদ ফাহিম, মনজলাল, মোগলাবাজার, সিলেট # মো. আনোয়ার হোসাইন, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # রেদওয়ানুল হক সোহাগ, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # মোছা. নাজমিন বেগম, মল্লিকপুর, ছাতক, সুনামগঞ্জ # মোছা. তাছলিমা বেগম, ইলামের গাঁও, করিমগঞ্জ, সদর, সিলেট # আজিম উদ্দিন মাছুম, দ্বীনি সিনিয়র মডেল আলিম মাদরাসা, সদর, সুনামগঞ্জ # মো. ফাহিম উদ্দিন, তালিমপুর বাহারপুর ইয়াকুবিয়া দাখিল মাদরাসা, বড়লেখা, মৌলভীবাজার # মো. মারুফ খান, আল জান্নাত ইসলামিক এডুকেশন ইন্সটিটিউট, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ # মোছা. ফাইজা জান্নাত রিমী, ইলামের গাঁও, করিমগঞ্জ, সদর, সিলেট # রাহিমা চৌধুরী উর্মি, বরমচাল উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # মো. সজিব মিয়া, হাজী আজিজুর রহমান উচ্চ বিদ্যালয়, জালালাবাদ, সিলেট।

আবাবিল ফৌজের সদস্য হলো যারা

৩০৩০. আনিকা তাসনিম নিশাত
পিতা: মো. জিয়াউর রহমান
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: কুলাউড়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
গ্রাম: কামারকান্দি
ডাক: কামারকান্দি
থানা: কুলাউড়া
জেলা: মৌলভীবাজার

৩০৩১. হালিমা তাবাসসুম
পিতা: আবুল ফয়েজ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: বুরাইয়া কামিল মাদরাসা
গ্রাম: বুরাইয়া
ডাক: বুরাইয়া বাজার
থানা: ছাতক
জেলা: সুনামগঞ্জ

৩০৩২. আবিদুর রহমান চৌধুরী
পিতা: মো. আব্দুল হাকিম চৌধুরী
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: ইছামতি কামিল মাদরাসা
গ্রাম: খলাদাপনিয়া
ডাক: ইছামতি
থানা: জকিগঞ্জ
জেলা: সিলেট

৩০৩৩. তাহমিদুর রহমান চৌধুরী
পিতা: মো. আব্দুল হাকিম চৌধুরী
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: ইছামতি কামিল মাদরাসা
গ্রাম: খলাদাপনিয়া
ডাক: ইছামতি
থানা: জকিগঞ্জ
জেলা: সিলেট

৩০৩৪. নাদিয়া আক্তার হেপী
পিতা: ফজল উদ্দিন
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: এস.এন.সি হাই স্কুল
গ্রাম: গহরপুর
ডাক: পীরপুর বাজার
থানা: ছাতক
জেলা: সুনামগঞ্জ

৩০৩৫. জুনাইদ আহমদ
পিতা: জিল্লুর রহমান
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: লাকেশ্বর দাখিল মাদরাসা
গ্রাম: বড়পলির গাঁও
ডাক: লাকেশ্বর বাজার
থানা: ছাতক
জেলা: সুনামগঞ্জ

৩০৩৬. তাজবির আহমদ মিহাদ
পিতা: মো. হেলাল আহমদ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: লতিফিয়া ইসলামিক আইডিয়াল একাডেমি
গ্রাম: চারিগ্রাম
ডাক: আটগ্রাম
থানা: জকিগঞ্জ
জেলা: সিলেট

৩০৩৭. মো. আল আমিন
পিতা: মো. আব্দুল গফুর
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: আলীনগর হাফিজিয়া মাদরাসা
গ্রাম: ইসলামনগর
ডাক: দোহালিয়া বাজার
থানা: দোয়ারাবাজার
জেলা: সুনামগঞ্জ

৩০৩৮. আমিনা সুলতানা নাইমা
পিতা: কারী ফজলুর রহমান
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: খাদিমপুর এন.ইউ হাই স্কুল
গ্রাম: মির্জা সহিদপুর
ডাক: দুলালী মাধবপুর
থানা: ওসমানীনগর
জেলা: সিলেট

৩০৩৯. হুমায়রা আক্তার মাহবুবা
পিতা: মুহাম্মদ নুর উদ্দিন
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: রসুলগঞ্জ আলিম মাদরাসা
গ্রাম: লোহারগাঁও
ডাক: রসুলগঞ্জ বাজার
থানা: জগন্নাথপুর
জেলা: সুনামগঞ্জ

৩০৪০. লোকমান আহমদ
পিতা: মৃত রেহান উদ্দিন
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: বরমচাল হযরত খন্দকার (র.) দাখিল মাদরাসা
গ্রাম: আলীনগর
ডাক: বরমচাল
থানা: কুলাউড়া
জেলা: মৌলভীবাজার

৩০৪১. হাফিয মো. আবুল খয়ের
পিতা: মো. ফজর আলী
গ্রাম: আলীনগর
ডাক: ইসলামগঞ্জ বাজার
থানা: জালালাবাদ
জেলা: সিলেট

৩০৪২. আব্দুল লতিফ সামি
পিতা: মো. আব্দুর রহিম
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: গোবিন্দগঞ্জ মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়
শাহজালাল আ/এ, গোবিন্দগঞ্জ, ছাতক, সুনামগঞ্জ।

৩০৪৩. মো. জাকারিয়া
পিতা: মো. আব্দুল আজিজ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: বাদেদেওরাইল ফুলতলী কামিল মাদরাসা
গ্রাম: গাজিপুর
ডাক: ঘাগটিয়া
থানা: কুলাউড়া
জেলা: মৌলভীবাজার

৩০৪৪. সুলতান আল বাছিত
পিতা: মাওলানা মো. আব্দুল বাছিত
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: লতিফিয়া ইসলামিক আইডিয়াল একাডেমি
গ্রাম: চারিগ্রাম
ডাক: আটগ্রাম
থানা: জকিগঞ্জ
জেলা: সিলেট

৩০৪৫. হাফিজা খাতুন
পিতা: মো. নোমান আহমদ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: ভরন সুলতানপুর মাদরাসা
গ্রাম: ভরন সুলতানপুর
ডাক: থানাবাজার
থানা: জকিগঞ্জ
জেলা: সিলেট

৩০৪৬. মো. জহিরুল ইসলাম
পিতা: মো. সাজ্জাদুল ইসলাম
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: দশঘর এন.ইউ উচ্চ বিদ্যালয়
গ্রাম: নোয়াগাঁও
ডাক: দশঘর
থানা: বিশ্বনাথ
জেলা: সিলেট

৩০৪৭. নজমুদ্দীন নাজিম
পিতা: নুর উদ্দিন
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: ঝামক হাফিজিয়া মাদরাসা
গ্রাম: জিয়াপুর
ডাক: ভাতগাঁও
থানা: ছাতক
জেলা: সুনামগঞ্জ

৩০৪৮. মো. আনোয়ার হোসাইন
পিতা: মো. ছমর উদ্দিন
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা
গ্রাম: বেরারাই
ডাক: বেগমপুর
থানা: ওসমানীনগর
জেলা: সিলেট

৩০৪৯. মো. মারুফ খান
পিতা: মো. সুনাইম খান
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: আল জান্নাত ইসলামিক এডুকেশন ইন্সটিটিউট
গ্রাম: ইসহাকপুর
ডাক: ভবের বাজার
থানা: জগন্নাথপুর
জেলা: সুনামগঞ্জ

৩০৫০. শাহান আহমদ
অভিভাবক: রায়হান আহমদ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: বাদেদেওরাইল ফুলতলী কামিল মাদরাসা
গ্রাম: জ্যাকান্দি
ডাক: দশকাহনিয়া
থানা: মৌলভীবাজার
জেলা: মৌলভীবাজার

হাসতে জানি

কে বেশি পেটুক

নাসিরুদ্দিন হোজ্জার বাড়িতে তাঁর কিছু বন্ধু এসেছেন। অতিথিদের তরমুজ দিয়ে আপ্যায়ন করলেন হোজ্জা। বন্ধুদের সঙ্গে খেতে বসলেন হোজ্জা নিজেও।

হোজ্জার পাশেই বসেছিলেন তাঁর এক দুষ্টু বন্ধু। তরমুজ খেয়ে খেয়ে বন্ধুটি হোজ্জার সামনে তরমুজের খোসা রাখছিলেন। খাওয়া শেষে দেখা গেল, হোজ্জার সামনে তরমুজের খোসার স্তূপ।

দুষ্টু বন্ধুটি অন্যদের বললেন, 'দেখেছেন কাণ্ড? হোজ্জা কেমন পেটুক? তার সামনে তরমুজের খোসার স্তূপ হয়ে গেছে'!

হোজ্জা হেসে বললেন, 'আর আমার বন্ধুটির সামনে দেখছি একটা খোসাও নেই! উনি খোসাশুদ্ধ খেয়েছেন! এখন আপনারাই বলুন, কে বেশি পেটুক!'

অতিথিপরায়ণ ব্যক্তি

একদিন এক চায়ের স্টলে হোজ্জা সবাইকে বললেন, 'আমি একজন অতিথিপরায়ণ ব্যক্তি।'

'বেশ, তাহলে আজ দুপুরে আমাদের সবাইকে খাওয়ান', সবচেয়ে চতুরজন কথাটা বলল।

হোজ্জা তাদের নিয়ে নিজ বাসার দিকে রওনা দিলেন।

বাড়ির কাছে এসে হোজ্জা বললেন, 'আমি আগে আগে বাসায় গিয়ে স্ত্রীকে বলি আর তোমরা আসতে থাকো।'

খবরটা শোনার পর স্ত্রী রেগে আগুন, 'ঘরে কোনো খাবার নেই, ওদের ফিরে যেতে বলো।'

'তা পারব না, আমি যে অতিথিপরায়ণ, তার একটা সুনাম আছে।'

'বেশ, তাহলে তুমি ওপরের তলায় গিয়ে বসো; আমি ওদের বলছি তুমি বেরিয়ে গেছ, বাড়িতে নেই।'

এক ঘণ্টা পর অতিথিরা এসে দরজায় ধাক্কা দিল আর বলতে লাগল, 'আমাদের ভেতরে ঢুকতে দাও হোজ্জা।'

হোজ্জার স্ত্রী দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন।

'হোজ্জা তো বাড়ি নেই।'

'সেকি আমরা তো তাকে বাড়িতে ঢুকতে দেখেছি আর দরজার দিকে লক্ষ রেখেছি তার ঢোকার পর থেকে। বের তো হয়নি।'

স্ত্রী চুপ করে গেলেন।

ওপরতলার জানালা দিয়ে হোজ্জা পুরোটাই দেখছিলেন। নিজেকে ধরে রাখতে না পেরে জানালা দিয়ে ঝুঁকে বললেন, 'আমি কি পেছনের দরজা দিয়ে বাইরে যেতে পারি না?'

সংগ্রহে
এস এম মনোয়ার হোসেন
সভাপতি, ইউনিটি সোশ্যাল অর্গ্যানাইজেশন, বালাগঞ্জ, সিলেট

[আবাবীল ফৌজের বন্ধুরা! তোমরা যে কেউ পরিকল্পনা করে 'শব্দকল্প', 'বর্ণকল্প', অথবা শিক্ষামূলক 'ছোটগল্প' ও 'ছড়া/কবিতা' লিখে পাঠাতে পারো। অবশ্যই লেখা পাঠানোর ক্ষেত্রে নিচের নিয়মগুলো মেনে চলবে। আর মনে রাখবে, প্রত্যেক লেখার কপি রেখে পাঠাতে হবে, কারণ অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না।]

নিয়মাবলি

- আবাবীল ফৌজের সদস্য হতে হলে নির্ধারিত সদস্য কুপনটি পূরণ করে ডাকযোগে অথবা ছবি তুলে ই-মেইলে পাঠাতে হবে।
- ইসলামী ভাবধারার যেকোনো উন্নত মানের শিশুতোষ রচনা এ বিভাগে ছাপা হয়। সর্বোপরি শিশু-কিশোরদের প্রতিভা বিকাশ, তাদেরকে ইসলামী মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করে সাংস্কৃতিক বিপ্লব সাধনের জন্যই 'আবাবীল ফৌজ'।
- লেখা সংক্ষিপ্ত হতে হবে। লেখার সাথে লেখকের পূর্ণ ঠিকানা থাকা চাই।
- বলতো দেখি, শব্দকল্প ও বর্ণকল্পের জবাব ও সমাধান চলতি মাসের ১৬ তারিখের মধ্যেই পত্রিকা অফিসে পৌছাতে হবে।
- 'বলতো দেখি'র সঠিক জবাবদাতাদের মধ্য থেকে নম্বরের ভিত্তিতে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান নির্ধারণ করে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে।
- আবাবীল ফৌজের যেকোনো সদস্যের তৈরি করে পাঠানো শব্দকল্প, বর্ণকল্প মনোনীত ও প্রকাশিত হলে তাকে আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে।
- বর্ণকল্পে অংশগ্রহণকারী সঠিক জবাবদাতাদের নাম- ঠিকানা পরবর্তী সংখ্যায় যত্ন সহকারে ছাপানো হবে।
- **A4 কাগজে স্পষ্ট করে হাতে লিখে অথবা কম্পোজ করে আবাবীল ফৌজের ঠিকানায় পাঠাতে হবে।**
- **ই-মেইলে লেখা পাঠানোর ক্ষেত্রে অবশ্যই আবাবীল ফৌজ ও লেখার শিরোনাম উল্লেখ করতে হবে।**
- **ই-মেইলের ক্ষেত্রে প্রতিটি লেখা স্বতন্ত্র ফাইল করে মেইলের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।**
- **প্রতিটি লেখার সাথে নিজের নাম, পূর্ণ ঠিকানা, যোগাযোগ নম্বর, শ্রেণি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম লিখে পাঠাতে হবে।**

চিঠিপত্র

রোযার মাসে বাজার স্থির রাখুন

বরকতের মাস পবিত্র রামাদান। এ মাসে মুসলিম জীবনযাত্রায় আসে নতুনত্ব। আত্মশুদ্ধির অংশ হিসেবে অফিস আদালত থেকে শুরু করে সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সেবাদানে আসে আন্তরিকতা। ব্যবসা বাণিজ্যেও অধিক মুনাফা অর্জনের মানসিকতা কমে যায়। মধ্যপ্রাচ্যসহ মুসলিম দেশগুলোতে শুরু হয় মূল্যছাড়ের প্রতিযোগিতা। আরব আমিরাতসহ কয়েকটি দেশে সরকারিভাবে শতকরা ৯০ ভাগ পর্যন্ত মূল্যছাড়ের ঘোষণা আসে। কিন্তু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশে তার বিপরীত চিত্র দেখা যায়। রামাদানের শুরুতে পুরো মাসের নিত্যপণ্য ক্রয়ের প্রবণতা দেখা যায়। ফলে বাজারে বাড়তি চাপ পড়ে। সুযোগ নেন অসাধু ব্যবসায়ীরা। শুরু হয় মূল্যবৃদ্ধি, নকল ও ভেজাল পণ্যের ছড়াছড়ি। বিশেষ করে তেল, চাল, ডাল, ছোলা ও গরুর গোশতের দাম বেড়ে যায়। সাধারণত একবার দাম বাড়লে আর পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে না।

এজন্য ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতর, স্থানীয় প্রশাসন, পৌরসভা ও সিটি করপোরেশনের নিয়মিত বাজার মনিটরিং প্রয়োজন। ক্রেতা সাধারণকেও প্রয়োজনাতিরিক্ত দ্রব্য কেনার মানসিকতা থেকে সরে আসতে হবে।

আত্মশুদ্ধি ও সিয়াম সাধনার মাস যেন আমাদের জন্য না হয় দুর্ভোগের। মজুতদারি, মূল্যবৃদ্ধি ও ভেজাল পণ্য নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপ কামনা করছি।

মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম
শিক্ষার্থী: বাংলা বিভাগ, এমসি কলেজ, সিলেট

বয়স্কদের জন্য বিশুদ্ধ কিরাত প্রশিক্ষণ জরুরি

পবিত্র রামাদানে দেশজুড়ে চলে কোরআন তিলাওয়াতের প্রশিক্ষণ। দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্ট সহ কিছু কোরআন শিক্ষাবোর্ড এসব প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। সাধারণত এসব শিক্ষাকেন্দ্রে শিশু কিশোররা বিশুদ্ধ তিলাওয়াত শিখেন। বয়স্কদের মধ্যে যাদের তিলাওয়াত সহীহ নয় তারা চক্ষুলজ্জা বা কর্মব্যস্ততায় মশকে অংশগ্রহণ করতে পারেন না। আবার সকল দারুল কিরাত কেন্দ্রে 'বয়স্কশ্রেণি' চালু করা সম্ভবপর হয় না। সুতরাং রাতের বেলা তারাবীহের নামাযের মসজিদের ইমাম সাহেব ও কারী সাহেবান সূরা মশকের ব্যবস্থা করতে পারেন। যাতে করে বয়স্ক লোকেরা নামাযে পঠিত সূরাগুলোর বিশুদ্ধ তিলাওয়াত শেখার সুযোগ পান।

এ ব্যাপারে সম্মানিত ইমাম ও কারী সাহেবদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মাওলানা রুহুল আমিন ফকীর
মকসুদপুর, গোপালগঞ্জ

পাঠকের প্রতি,
আপনার চারপাশের প্রয়োজনীয়তা ও সমস্যা নিয়ে অনধিক ২০০ শব্দে চিঠি লিখে chitipatra.parwana@gmail.com-এ পাঠিয়ে দিন। —বিভাগীয় সম্পাদক

দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্ট
প্রধান কেন্দ্রঃ ফুলতলী ছাহেব বাড়ি
জকিগঞ্জ, সিলেট

ছাদিছ জামাতে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

১৪৪২ হিজরী • ২০২১ ঈসায়ী

১. ২৮ মার্চ, ২০২১ সকাল ১০টা থেকে দারুল কিরাতের ওয়েবসাইট www.darulqiratfultali.com এর Online Admission লিংক এর মাধ্যমে নিয়মিত ও অনিয়মিত ছাত্র এবং ছাত্রীদের অনলাইন ভর্তি কার্যক্রম শুরু হবে। অনলাইনে ভর্তির আবেদনের ক্ষেত্রে ভর্তি নির্দেশিকা অনুসরণ করতে হবে।

(ক) নিয়মিত ছাত্র, যারা ইতিপূর্বে আর কখনো ছাদিছ জামাতে ভর্তি হননি, তাদের মধ্যে যারা প্রথম বিভাগে খামিছ পাশ করেছেন তারা ২৮ মার্চ, ২০২১ থেকে ৫ এপ্রিল, ২০২১ পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। নির্ধারিত সময়ের আগে আসন পূর্ণ হয়ে গেলে সময় থাকলেও আর ভর্তি নেওয়া হবে না। আসন খালি থাকলে খামিছ জামাতে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণরা ৬ এপ্রিল, ২০২১ থেকে ১০ এপ্রিল, ২০২১ পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

(খ) অনিয়মিত ছাত্র এবং নিয়মিত-অনিয়মিত সকল ছাত্রী ২৮ মার্চ, ২০২১ থেকে ৭ এপ্রিল, ২০২১ পর্যন্ত অনলাইন আবেদন করতে পারবেন।

২. **করোনা মহামারী বিবেচনায় সীমিত সংখ্যক ছাত্র ভর্তি করা হবে। তবে পরিস্থিতি অনুযায়ী ভর্তি কোটা কম-বেশি করা হতে পারে।**

৩. **শারীরিকভাবে অসুস্থ কেউ ভর্তির জন্য আবেদন করবেন না। ভর্তির পরও কারো শারীরিক সমস্যা দৃষ্টিগোচর হলে ভর্তি বাতিল করা হবে।**

৪. ছাদিছ জামাতে কেবল নিয়মিত ছাত্রদের ভর্তির ক্ষেত্রে ন্যূনতম বয়সসীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ হিসেবে নিয়মিত ছাত্রদের মধ্যে যারা জন্মসনদ অনুযায়ী ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৭ ইং তারিখের পর জন্মগ্রহণ করেছেন তারা ভর্তি হতে পারবেন না। ছাত্রীদের ক্ষেত্রে কোনো বয়সসীমা নেই। বয়স প্রমাণের জন্য প্রত্যেক নিয়মিত ছাত্রকে জন্ম নিবন্ধন সনদ/জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি ভর্তি চূড়ান্ত করার সময় জমা দিতে হবে। অনলাইনে প্রদত্ত জন্ম তারিখ ভুল প্রমাণিত হলে ভর্তি বাতিল হবে।

৫. নিয়মিত ছাত্রদের ভর্তি ফি জনপ্রতি ৭০০/- (সাতশত টাকা মাত্র)। নিয়মিত প্রত্যেক ছাত্রকে ১ রামাদ্বান সকাল ১০টায় প্রধানকেন্দ্র অফিসে ভর্তি ফি জমা দিয়ে রসিদ সংগ্রহ করতে হবে। এ সময় অনলাইন থেকে প্রাপ্ত নতুন পরিচয়পত্রের ১টি ফটোকপি, ১ কপি পাসপোর্ট সাইজ রঙ্গিন ছবি, রাবে ও খামিছ সার্টিফিকেটের ১টি করে ফটোকপি এবং জন্ম নিবন্ধন সনদ/জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি জমা দিয়ে ভর্তি চূড়ান্ত করতে হবে।

৬. অনিয়মিত ছাত্রদের ভর্তি ফি জনপ্রতি ৬০০/- (ছয়শত টাকা মাত্র)। অনিয়মিত ছাত্রদের নিম্নোক্ত তারিখে প্রধানকেন্দ্র অফিসে ভর্তি ফি জমা দিয়ে রসিদ সংগ্রহ করতে হবে। এ সময় অনলাইন থেকে প্রাপ্ত নতুন পরিচয়পত্রের ১টি ফটোকপি, ১ কপি পাসপোর্ট সাইজ রঙ্গিন ছবি, রাবে ও খামিছ সার্টিফিকেটের ১টি করে ফটোকপি, ছাদিছ জামাতের পূর্বের মূল পরিচয়পত্র এবং জন্ম নিবন্ধন সনদ/জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি জমা দিয়ে ভর্তি চূড়ান্ত করতে হবে।

অনিয়মিত ছাত্রদের ভর্তি ফি ও কাগজপত্র জমাদানের তারিখ নিম্নরূপঃ

রোল নং	ভর্তি ফি ও কাগজপত্র জমাদানের তারিখ	সময়
০০১-৩০০	৩ রামাদান, ১৪৪২ হিজরী	সকাল ১০.০০ টা
৩০১-৬০০	৪ রামাদান, ১৪৪২ হিজরী	সকাল ১০.০০ টা
৬০০- শেষ পর্যন্ত	৫ রামাদান, ১৪৪২ হিজরী	সকাল ১০.০০ টা

৭. ছাত্রীদের ভর্তি ফি জনপ্রতি ৫০০/- (পাঁচশত টাকা মাত্র)। ছাত্রীদের ভর্তি ফি ৮ এপ্রিল, ২০২১ থেকে ১২ এপ্রিল, ২০২১ পর্যন্ত প্রধানকেন্দ্র ফুলতলী ছাহেব বাড়ি অফিসে অথবা সুবহানীঘাট হাজী নওয়াব আলী মার্কেটের ২য় তলায় (আনজুমানে আল ইসলাহ'র সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়ে) অভিভাবক/প্রতিনিধির মাধ্যমে সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টার মধ্যে জমা দিতে হবে। এ সময় অনলাইন থেকে প্রাপ্ত নতুন পরিচয়পত্রের ১টি ফটোকপি, এক কপি পাসপোর্ট সাইজ রঙ্গিন ছবি, রাবে ও খামিছ সার্টিফিকেটের ১টি করে ফটোকপি এবং জন্মনিবন্ধন সনদ/জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি জমা দিয়ে ভর্তি চূড়ান্ত করতে হবে। ভর্তির কাগজপত্র জমার ক্ষেত্রে ছাত্রীদের আসার প্রয়োজন নেই।

৮. নির্ধারিত তারিখের পূর্বে বা পরে ভর্তি বা কাগজপত্র জমা দেওয়ার কোনো সুযোগ থাকবে না।

৯. এ বছর মানোন্নয়নে কোনো ছাত্র ভর্তি করা হবে না। দুই বা তিন বছর অন্তর অন্তর মানোন্নয়নে ছাত্র ভর্তি নেওয়া হবে।

১০. ভর্তিকৃত ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে কেউ নাম ঠিকানা পরিবর্তন করতে চাইলে ৭ থেকে ১০ রামাদ্বানের মধ্যে প্রমাণপত্র (প্রাতিষ্ঠানিক সার্টিফিকেট, জন্মনিবন্ধন সনদ ও স্থানীয় কারী সোসাইটির প্রত্যয়নপত্র) সহ আবেদন করতে হবে। পরবর্তীতে কোনো সময় আর নাম ঠিকানা পরিবর্তন করা যাবে না।

১১. অনিয়মিত ছাত্রদের ক্লাস ও বোর্ডিং এ অবস্থানের কোনো সুযোগ থাকবে না।

১২. ছাত্রীদেরও ক্লাসের কোনো সুযোগ নেই। ছাত্রীগণ কেবল পরিচয়পত্রে প্রদত্ত নির্ধারিত তারিখে কিরাত ও তাজবীদ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন।

১৩. নিয়মিত ছাত্রদের মধ্যে যারা বোর্ডিং-এ অবস্থান করবেন তাদের আবাসিক রুম ও সীট নম্বর ২৯ শা'বান প্রধান কেন্দ্রের নোটিশ বোর্ডে টানিয়ে দেওয়া হবে।

১৪. ছাত্রগণ ২৯ শা'বান ফুলতলীতে আসবেন। কোনোভাবেই এর পূর্বে কেউ আসবেন না। ২৯ শা'বানের পূর্বে ছাত্রদের থাকা-খাওয়ার কোনো ব্যবস্থা করা হয় না।

১৫. ১ রামাদ্বান সকাল ৯টা থেকে ক্লাস শুরু হবে। সবাইকে এর পূর্বে অবশ্যই উপস্থিত হতে হবে।

১৬. কোনো ছাত্র চাইলে লজিং-এ অবস্থান করতে পারবে। তবে বাজার বা কোনো দোকানে রুম ভাড়া করে থাকা যাবে না।

১৭. আবাসিক ছাত্রদের পরবর্তী প্রয়োজনের জন্য দুই কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি সাথে রাখতে হবে।

১৮. বোর্ডিং এ অবস্থানে ইচ্ছুক ছাত্রদের নিত্যপ্রয়োজনীয় আসবাবপত্র যেমন- বিছানা, জায়নামায, ছাতা, প্লেইট, গ্লাস, বাটি সঙ্গে আনতে হবে। নিত্য প্রয়োজনীয় নয় এমন এবং দামী কোনো জিনিস সাথে না আনাই বাঞ্ছনীয়।

১৯. **সর্বক্ষেত্রে সরকারের ঘোষিত স্বাস্থ্যবিধি পূর্ণাঙ্গভাবে মেনে চলতে হবে। সবসময় মাস্ক পরিধান করতে হবে। বিশেষত ক্লাসের সময় মাস্ক ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক।**

২০. **সরকারের নির্দেশনা বা পরিস্থিতি বিবেচনায় রামাদ্বানে ভর্তি ও ক্লাস স্থগিত করা হতে পারে।**

বিশেষ প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ যে কোনো নিয়ম পরিবর্তনের অধিকার সংরক্ষণ করেন।

মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী
নাজিম

দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্ট
প্রধান কেন্দ্রঃ ফুলতলী ছাহেব বাড়ি
জকিগঞ্জ, সিলেট

১৪৪২ হিজরী/২০২১ ঈসায়ী
সনে ছাদিছ জামাতে

অনলাইন ভর্তি নির্দেশিকা

১. অনলাইন রেজিস্ট্রেশন এর জন্য দারুল কিরাতের ওয়েবসাইট www.darulqiratfultali.com এর Online Adimission লিংক এ প্রবেশ করুন।

২. ২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সনে খামিছ পাশ নিয়মিত ছাত্র হলে Sadis Admission (Regular), অনিয়মিত ছাত্র হলে Sadis Admission (Irregular) এবং নিয়মিত ও অনিয়মিত ছাত্রী হলে Sadis Admission (Female) ক্লিক করুন। ২০১৭ এর পূর্বে যেসকল ছাত্র খামিছ পাশ করেছেন তাদের এ বছর ভর্তির কোন সুযোগ থাকবে না।

৩. নিয়মিত ছাত্রগণ অনলাইন আবেদনে Registration ID এর ক্ষেত্রে নিজেদের খামিছ জামাতের সার্টিফিকেট/খামিছ পরীক্ষার প্রবেশপত্রে দেওয়া রোল নং লিখে Submit বাটনে ক্লিক করুন। প্রয়োজনে শাখা কেন্দ্রের ফলাফল সীট থেকে রোল নং নিশ্চিত হয়ে নিন।

৪. (ক) অনিয়মিত ছাত্রগণ ২০১৯ সালে ছাদিছ অকৃতকার্য হলে ছাদিছ জামাতের রোল নম্বরই তাদের Registration ID হবে।

(খ) ২০১৮ সনে ছাদিছ অকৃতকার্য হলে Registration ID এর ক্ষেত্রে ছাদিছ জামাতের সন ও রোল নম্বর স্পেস ছাড়া লিখবেন। যাদের রোল ১ থেকে ৯ তারা রোলের বামে ৩টি শূন্য (০০০) যোগ করবেন এবং যাদের রোল ১০ থেকে ৯৯ তারা রোলের বামে ২টি শূন্য (০০) যোগ করবেন। যেমন, আপনার ছাদিছ জামাতের সন ২০১৮ ও রোল ১ হলে আপনার Registration Id হবে ২০১৮০০০১।

(গ) ২০১৮ সনে অনিয়মিত হিসেবে যারা ছাদিছ অকৃতকার্য হয়েছেন ২০১৮ সনের রেজি. নম্বরই তাদের Registration Id।

(ঘ) ২০১৮ সনের পূর্বে ছাদিছ অকৃতকার্য হলে Registration Id এর ক্ষেত্রে প্রথমে নিজের ছাদিছ জামাতে অকৃতকার্য হওয়ার সন, ফরিক ও রোল নং ধারাবাহিকভাবে স্পেস ছাড়া লিখুন। যাদের ফরিক ও রোল ১ থেকে ৯ পর্যন্ত হবে তারা ফরিক ও রোল এর বামে একটি শূন্য (০) যোগ করবেন। যেমন আপনার সন ২০১৭, ফরিক ১, রোল ৯ হলে আপনার Registration Id হবে ২০১৭০১০৯।

(ঙ) যারা অনিয়মিত ছাত্র হিসেবে ২০১৮ সনের পূর্বে ছাদিছ জামাতে অকৃতকার্য হয়েছেন তারা Registration Id এর ক্ষেত্রে ফরিক অনিয়মিত এর স্থলে ৬০ লিখবেন। যেমন, আপনার সন ২০১৭, ফরিক অনিয়মিত, রোল নং ০১ হয় তবে আপনার Registration Id হবে ২০১৭৬০০১।

৫. (ক) ছাত্রীগণ Registration Id এর ক্ষেত্রে খামিছ জামাতের সার্টিফিকেট/খামিছ পরীক্ষার প্রবেশপত্রে দেওয়া রোল নং লিখে Submit বাটনে ক্লিক করুন।

(খ) যারা ২০১৫ এর আগে খামিছ পাশ করেছেন তাদেরকে খামিছ জামাতের রোল নম্বর এর পূর্বে সংশ্লিষ্ট সনের শেষ ২টি সংখ্যা যোগ করতে হবে। যেমন খামিছ পাশের সন ২০১১ ও রোল নম্বর ১২১৩ হলে Registration ID হবে 111213

৬. Registration Id লিখে Submit বাটনে ক্লিক করার সাথে সাথে আপনার নাম, পিতার নাম, ঠিকানা স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণ হয়ে যাবে।

৭. এরপর Home phone এর কলামে আপনার পিতা/অভিভাকের ফোন/মোবাইল নং লিখুন।

৮. Personal phone এর কলামে আপনার নিজের মোবাইল নং লিখুন।

৯. E-mail Address এর কলামে নিজের সক্রিয় ই-মেইল থাকলে লিখুন।

১০. Date of Birth এর ক্ষেত্রে জন্মনিবন্ধন সনদে উল্লেখিত জন্মতারিখ লিখুন। জন্মতারিখ ভুল হলে ভর্তি বাতিল হবে। উল্লেখ্য, আপনি নিয়মিত ছাত্র হলে আপনার জন্মতারিখ ৩১.১২.২০০৭ এর পরে হলে আপনি আবেদন করতে পারবেন না। ছাত্রীদের ক্ষেত্রে কোনো বয়সসীমা নেই।

১১. Profession কলামে ছাত্র/ছাত্রী হলে Student, শিক্ষক হলে Teacher এবং অন্য কোনো পেশার হলে Other সিলেক্ট করুন।

১২. Class/ Designation এর ক্ষেত্রে আপনার শ্রেণি/পেশার নাম লিখুন।

১৩. Khamis Division এর ক্ষেত্রে আপনার খামিছ পাশের বিভাগ সিলেক্ট করুন।

১৪. Student Type এর ক্ষেত্রে নিয়মিত হলে Regular, অনিয়মিত হলে Irregular এবং ছাত্রী হলে Female সিলেক্ট করুন।

১৫. Khamis passed Year এর কলামে খামিছ পাশের সন লিখুন।

১৬. অনিয়মিত ছাত্রগণ Informations about previous Sadis Jamat এর কলামে ছাদিছ পরীক্ষার সন, ফরিক, রোল ও ফলাফল যথাযথভাবে লিখুন।

১৭. Residential status এর ক্ষেত্রে যদি রামাদান মাসে আপনি ছাহেব বাড়িতে থাকেন তবে Residential সিলেক্ট করুন। এর ভিত্তিতে আপনাকে রুম ও সিট নং বরাদ্দ দেওয়া হবে। আর যদি নিজ বাড়ি, লজিং অথবা ছাহেব বাড়ির বাইরে কোথাও থাকেন তাহলে Non Residential সিলেক্ট করুন। এ ক্ষেত্রে আপনাকে কোনো রুম বা সিট বরাদ্দ দেওয়া হবে না।

১৮. Upload PP size photo এর কলামে নিজের পাসপোর্ট সাইজ রঙিন ছবি আপলোড করুন। ছাত্রদের ক্ষেত্রে ছবি অবশ্যই টুপিসহ এবং ছাত্রীদের ক্ষেত্রে নেকাব ছাড়া পূর্ণরূপে ওড়নাসহ হতে হবে। ছবি অবশ্যই সোজা ও স্বাভাবিক হতে হবে। কোনো এঙ্গেল ছবি বা সেলফি আপলোড করলে পরবর্তীতে ভর্তি বাতিল হবে।

১৯. আবেদন ফরমের নিচে Terms and Conditions এর বক্সটি সিলেক্ট করুন। সর্বশেষে Submit বাটনে ক্লিক করুন। কোনো ভুল হলে Submit না করে Reset বাটনে ক্লিক করে পুনরায় ফরম পূরণ করুন।

২০. ফরম Submit হলে অনলাইন ফরমের প্রথমে গিয়ে আবার আপনার Registration Id লিখে Get Admit Card এ ক্লিক করলে আপনার পরিচয়পত্র দেখা যাবে। সেখান থেকে পরিচয়পত্র সংরক্ষণ ও কালার প্রিন্ট (Ctrl + p) করে রাখুন।

২১. ভর্তি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখে নির্ধারিত স্থানে ভর্তি ফি, অনলাইন থেকে প্রাপ্ত নতুন পরিচয়পত্রের ১টি ফটোকপি ও অন্যান্য কাগজপত্র জমা দিয়ে ভর্তি চূড়ান্ত করুন। ভর্তি চূড়ান্ত না হলে আপনি ক্লাস/পরীক্ষায় অংশগ্রহণের কোনো সুযোগ পাবেন না।

জ্ঞাতব্য

১. ছাত্র/ছাত্রীদের পূরণীয় কলামসমূহ অবশ্যই সতর্কতার সাথে পূরণ করতে হবে। খামিছ পাশের সন, বিভাগ, Student Type, জন্মতারিখ ইত্যাদি ভুল হলে ভর্তি বাতিল হবে।

২. ক্যাটাগরিভিত্তিক নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী আবেদন করবেন। নির্ধারিত তারিখ ছাড়া আবেদনের চেষ্টা করবেন না।

বিশেষ প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ যে কোনো নিয়ম পরিবর্তনের অধিকার সংরক্ষণ করেন।

হেল্প লাইন: ০১৭৪৯-৩৯৮৯১১ (বিকাল ৩টা-৫টা)

মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী
নাজিম